ভাগবতী

"হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হয়ে থাকুক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গলে স্থির করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার নিত্য অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনের সম্বল হয়ে থাকুক।"

ভাগবতী তনু রবীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
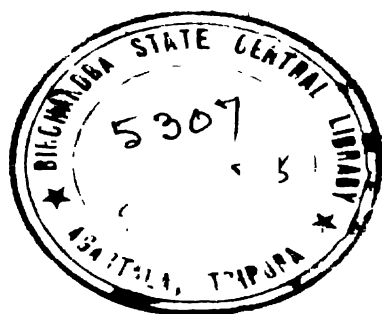
মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—সাড়ে বারো টাকা—

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এন, রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি, এম. বাক্‌চি এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ,
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাকচি কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ :

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

ভক্ত বিবেকানন্দ

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

গরীয়সী গৌরী

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

উদ্যত খড়গ (সুভাষচন্দ্রের জীবনী ১ম, ২য় খণ্ড)

গৌরাঙ্গপরিজন

ভাগবতী তনু

॥ এক ॥

"হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক।'

এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের।

খড়দা আর সোদপুরের মাঝখানে পেনেটি। সেখানে ছাতুবাবুর বাগান-বাড়িতে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। বালক রবীন্দ্রনাথ।

এসেছে ডেঙ্গুজ্বরের ভয়ে। ডেঙ্গুজ্বরের মড়ক লেগেছে কলকাতায়।

এই প্রথম বাইরে আসা। ইট-কাঠ-পাথরের খাঁচার বাইরে মুক্তাঙ্গন বিশ্বকে সম্ভাষণ করা।

গঙ্গাতীরেই বাগানবাড়ি। বারান্দার সামনে পেয়ারা বন পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বারান্দায় বসে থাকে রবীন্দ্রনাথ। নৌকো দেখে। দাঁড় টেনে পাল তুলে ভেসে চলেছে নৌকো, কোন নাম না-জানা বিস্ময়ের বন্দরে। মানচিত্রের সীমানা না মেনে, ভূগোলের গণ্ডি পেরিয়ে চিরন্তন রহস্যরাজ্যে।

এই রহস্যটিই আদিম ও অন্তহীন। আর আমার দুই চোখে বালকের সদ্যোজাগ্রত বিস্ময়।

দেখি আর অবাক হই। অবাক হয়ে দেখি কিন্তু প্রকাশের ভাষা নেই। 'কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে।' ভাষার বোধ আছে অভিধানে কিন্তু অনুভবের অভিধান কোথায়?

মনে মনে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ে। যে বাড়ি থাকলে রাজার বাড়ি হত না সেই রাজার বাড়ির খোঁজে। নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে যেসব নৌকো,

তারই একটার সোয়ারি হয়ে। কল্পনার অমরাবতীকে সে ছুঁয়ে আসবে। সৌধ-চূড়ের একটি সোনার প্রদীপ ডাকে বুঝি তাকে হাতছানি দিয়ে।

'কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।'

সে তো মনে, কিন্তু বাস্তবে ?

কী আছে বাস্তবে, দেখাই যাক না। অচেনাকে আমার ভয় কী। আমার মাও তো অচেনা ছিল কিন্তু নিল তো কোল পেতে !'

'ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।

সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।'

কিসের টানে কে বলবে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেরিয়ে পড়েই দেখল পায়ে শেকল আঁটা।

আগে আগে যাচ্ছেন দুজন অভিভাবক। পিছনে কে আসছে তারা টের পেয়েছেন।

'এ কী তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

ম্লানমুখে থমকে দাঁড়াল রবীন্দ্রনাথ। ধরা পড়ার মানে কী, যেন বুঝতে পেরেছে নিমিষে।

'ছি ছি, এ তোমার কী পোশাক ! যাও যাও এখুনি ফিরে যাও।

পোশাকে কোথায় ত্রুটি বুঝতে দেরি হল না। রবীন্দ্রনাথের গায়ে জামা থাকলেও চাদর নেই, আর পা জুতোপরা থাকলেও মোজা-ছাড়া।

ফিরে এল বাড়িতে। বসল এসে বারান্দায়। অম্লান চোখে দেখতে লাগল গঙ্গাকে।

ত্রুটি সংশোধন করবার উপায় নেই ! যার মোজাও নেই চাদরও নেই তার কলঙ্কমোচন হয় কী করে ?

কিন্তু গঙ্গাই সমস্ত নিষ্কলঙ্ক নির্বন্ধন করে দিল। মনকে ছুটি দিল জলস্রোতে। স্রোতে ভাসতে মনের সাজসজ্জা লাগে না। কারু সাধ্য নেই মনের পায়ে শিকলি এঁটে খাঁচায় পুরে বন্দী করে। দূর দেশে ভেসে যাই, পরীর বাড়ির বন্ধ দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারি।

যেখানে বেগ সেখানেই মুক্তি। যেখানে স্রোত সেখানেই স্বচ্ছতা। একটি মুক্তিবিস্তারিণী আনন্দময়ী নদী সেই কবে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে।

শুধু কর্ম আর কলধ্বনি—নদী এক নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম।

জল পড়ে, পাতা নড়ে—বর্ণ পরিচয়ের ঐ কটি কথা প্রচণ্ড সাড়া তুলেছে বালকের মনে। পড়া-নড়ার একটা অমোঘ ছন্দ দেখছে চারিদিকে। একটা কিছু পড়ছে অমনি আরেকটা কিছু নড়ছে। শিশির পড়ছে অমনি চোখ মেলছে ফুল। চারদিকে শুধু স্পর্শ আর স্পন্দন। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ। ঝরছে আনন্দ জাগছে ভালোবাসা।

প্রত্যেকটি দিন যেন একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নতুন চিঠির মত রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়ছে। কী যে তার ভাষা বালক তা স্পষ্ট বুঝতে পারে না কিন্তু প্রাণে চাঞ্চল্য জাগে। দূরের বাণীর পরশ-মাণিকের ছোঁয়া লেগে একটি দীপ জ্বলে ওঠে অন্তরে। যে অজানার আহ্বানটি আসে রোজ চিঠিতে ভরে, সেই দীপশিখায় তাকে সম্ভাষণ জানায়।

তোমার চিঠির সমুচিত উত্তর দেব। এত চিঠি লিখছ তুমি চারদিকে, আমি চুপ করে বসে থাকতে পারব না। তোমার সৌন্দর্যের উত্তরে আমার আনন্দকে পাঠাব।

কলির মধ্যে ফুল যেমন ফুটি-ফুটি করে, তেমনি সমস্ত কথার মধ্যে কবিতা যেন বলি-বলি করে উঠেছে।

পাকা আমটির মত দেখতে, বুড়ো শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে সকলের ভাব। বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। বাঁ পাশে একটি গুড়গুড়ি, কোলের উপর একটি সেতার আর কণ্ঠে বিরামহারা গীতস্রোত। বয়স মিলিয়ে চলতে পারেন সকলের সঙ্গে। প্রত্যেকের তিনি আপনজন, প্রত্যেকে তাঁকে পেয়ে খুশি। তিনি তো আপন খুশিতেই ভরপুর।

কী কবিতা লিখেছো আজ? দেখি দেখি। উৎসাহে উছলে উঠলেন শ্রীকণ্ঠবাবু।

কবিতা শোনাবার এমন শ্রোতা আর নেই। বুড়োকে রবীন্দ্রনাথের তাই দারুণ পছন্দ। স্থির মনোযোগে শুনবেন তো বটেই, শোনবার পর আনন্দে ফেটে পড়বেন। সেই আনন্দ আলোর মতই স্বচ্ছন্দ। কবিতায় গোঁজামিল থাক আনন্দে গোঁজামিল নেই।

দাও দাও, শিগ্‌গির দাও, তোমার বাবাকে শুনিয়ে দিয়ে আসি—যেন আনন্দের গুহা থেকে বেরিয়ে পড়েছে উদ্বেলকল্লোল প্রস্রবণ।

এতটা উৎসাহিত হবার কী আছে ভেবে পেল না রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের-কাছে ছুটে এলেন শ্রীকণ্ঠবাবু। দেখুন দেখুন রবি কী সুন্দর

কবিতা লিখেছে। এমন চমৎকার কবিতা শোনেন নি আপনি কোনোদিন।

দেবেন্দ্রনাথ চোখ তুলে তাকালেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর চোখেমুখে উজ্জ্বল সারল্য।

কী কবিতা? জিজ্ঞেস করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

দুটি ঈশ্বরস্তব।

পড়ো।

গদগদস্বরে গম্ভীর পরিবেশ রচনা করে পড়লেন শ্রীকণ্ঠবাবু। ভবব্যাধিতে কী নিদারুণ জর্জরিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তারই আতঙ্ককর বর্ণনা।

হো হো করে হেসে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ। সংসারপীড়ায় ক্লেশ পাচ্ছে তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে এতে যেন তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। দুঃসহ দাবদাহের মধ্যে সে যে শান্তির আশ্রয় খুজে পেয়েছে ঈশ্বর-ছায়ায় এতেও যেন নেই তাঁর উৎসাহ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দমতে দিলেন না শ্রীকণ্ঠবাবু। অন্তরের কথাটিই অন্তরতমের কথা। শুরুতেই ঠিক দেখেছ তোমার সুরের গুরুকে।

শ্রীকণ্ঠবাবুর কণ্ঠেও সেই গান: 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না রে তায়—'

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বারো বছরের বড়, তার জ্যোতিদাদার লেখা—

'অন্তরে অন্তরতম তিনি যে
ভুলো না রে তায়,
থাকিলে তাঁর সঙ্গে পাপ-তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে
সেই সখা বিনা সুখ-শান্তি
দিবে কে তোমায়?'

গান গাইতে গাইতে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ান শ্রীকণ্ঠবাবু। দেবেন্দ্রনাথের মুখের সামনে হাত নেড়ে নৃত্য করে ওঠেন। তিনি তো আছেনই তুমিও আছ। অন্তরের অন্তরতম তুমি যে।

অন্তিমশয়নে শুয়েছেন শ্রীকণ্ঠবাবু। শেষবারের মত এসেছিলেন চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে যেতে। তাঁর অন্তরতর অন্তরতমের সঙ্গে।

মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এ কালিমা নয় এ করুণা। এ বিলুপ্তি নয়

প্রশান্তি। নীরবতা নয়, এ অন্তরঙ্গ গুঞ্জরন। বিরল ভাষণ।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গান গাইছেন শ্রীকণ্ঠবাবু : কী মধুর তব করুণা প্রভো, কী মধুর তব করুণা!

সম্মুখে শান্তির পারাবার প্রসারিত। সে পারাবারের চিরযাত্রার পাথেয়ই হচ্ছে ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের মার্জনা।

রবীন্দ্রনাথের ঠিক উপরের ভাই সোমেন্দ্র। দু বছরের বড়। আর সোমেন্দ্রর ঠিক সমবয়সী সত্যপ্রসাদ—ভাগ্নে। দিদি সৌদামিনীর ছেলে। সত্যপ্রসাদের ছোট বোন, সৌদামিনীর বড মেয়ে ইরাবতী, রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী, তার বাল্যখেলার সঙ্গিনী। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজার বাড়ির খবর এনে দিয়েছিল।

'আমার রাজা বাড়ি কোথায় শোন্ মা কানে-কানে।
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আসে যেইখানে ॥'

আরেক ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ খুডতুতো দিদি কাদম্বিনীর ছেলে, সেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম শেখাল কবিতা-লেখা, চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ-কৌশল। দৃঢ় বন্ধনের মধ্যে থেকেও কবিতা কী রকম অসীমে বিস্তীর্ণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের এ যেন এক নতুন আবিষ্কার।

এগারো বছর পেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, পৈতে দেবেন তিনজনকে। সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আর সত্যপ্রসাদকে। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে ডাকিয়ে আনালেন বিহিত মন্ত্রমালা সঙ্কলন করতে। দেবেন্দ্র-নাথের বন্ধু বেচারাম চাটুজ্জেরও ডাক পড়ল। তিনি মন্ত্রের -দ্ধ উচ্চারণ শেখাবেন। বারে-বারে আবৃত্তি করো। কণ্ঠস্থ অন্তঃস্থ করে ফেল। হৃদয়ঙ্গম করো এই উপনয়নের তাৎপর্য।

উপনয়ন মানে উপস্থিতি। আমি এসেছি। আমি জেগেছি। আমি হয়েছি।

নিয়মের জগৎ থেকে বেরিয়ে প্রেমের জগতে জন্ম নিতে চলেছি। অধ্যাত্ম জগতেই খুঁজতে চলেছি, ব্যক্তিত্বের বিস্তার ব্যক্তিত্বের মুক্তি।

মুণ্ডিতমস্তক বালক-ব্রহ্মচারী রবীন্দ্রনাথ তে-লার অন্ধকারে বন্ধ হয়ে রইল তিন দিন। সঙ্গে আর দুই বটু, সত্যপ্রসাদ আর সোমেন। বউদিদি কাদম্বরী হবিষ্যান্ন রেঁধে দিচ্ছেন, সে এক নতুন রকমের স্বাদ। আর নতুন-শেখা গায়ত্রী, সে এক অপূর্ব স্বরধ্বনি।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। প্রত্যহ প্রাতে অভুক্ত থেকে দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে উপাসনা করেন দেবেন্দ্রনাথ, সে উপাসনার উদ্ভাসনটি রবীন্দ্রনাথের স্বচক্ষে দেখা। যে মন্ত্র-বলে ঐ উদ্দীপ্ত উদ্ভাসন সেটি আজ তার করায়ত্ত।

মন্ত্রের গূঢ়ার্থটি বুঝিয়ে দিয়েছেন বেচারামবাবু। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নিজের এই আশ্চর্য সত্তাকে প্রস্ফুটিত করো, পরিব্যাপ্ত করো, এমনি একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ অর্থ হবে হয়তো। তা আয়ত্ত করবার বুদ্ধি-বয়স তখনো হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তবু মনে-মনে একটা আপ্রাণ প্রয়াস ছিল নিজেকে বড় করে দিই, বিস্তীর্ণ করে দিই। প্রবাহিত হই, প্রসারিত হই।

'প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে,
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে, পূরবে পশ্চিমে।'

অর্থের চেয়েও ধ্বনিটি বুঝি বেশি আকর্ষণ করে। শরীরের অলক্ষ্য তারে অসংখ্য তারে ঝঙ্কার ওঠে। হৃদয়ের শঙ্খে শব্দিত হয়ে ওঠে প্রসুপ্ত সমুদ্র।

বোঝার জগতের জানালা দিয়ে উঁকি মারে না-বোঝার জগৎ। অন্তরের পৃথিবীতে একটি অনুভবের অন্তরীক্ষ। অনন্ত-ঈক্ষণ।

শানবাঁধানো মেঝের এককোণে বসে গায়ত্রী জপ করে রবীন্দ্রনাথ।

কেন কে জানে জপ করতে করতে অনর্গল জল পড়তে লাগল চোখ বেয়ে। এ কি বালক রবীন্দ্রনাথ কাঁদছে, না, তার মনের মধ্যে যে এক চিরবালক বাস করছেন, তার কান্না?

আমাকে প্রকাশ করো এই বুঝি তাঁর চিরকালের কান্না।

আনন্দসূর্য বিভাসিত হয়েছে আকাশে, তুমিও বিকশিত হও। তুমিও তোমার বন্ধু সূর্যের মত জ্যোতির কনকপদ্ম উন্মোচিত করো। সূর্যের হোমাগ্নিতে তোমারও সত্যের ছবি আছে, তাকে প্রণাম জানাও। তোমার নিঃশব্দকে মন্ত্র-মুখর করে তোলো। নিশ্চেতনকে প্রাণচ্ছন্দে স্পন্দমান।

কিন্তু ভাবনা হল নেড়া মাথায় ইস্কুলে যাবে কী করে। ছেলেরা মাথাটাকে যে তবলা বানিয়ে ছাড়বে। তা না বানাক, বাণ তো ছুঁড়বে, অন্তত সূক্ষ্ম তাক করে বিদ্রূপের বাণ।

প্রথম স্কুল গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি। স্কুলে ভর্তি হবার বায়না ধরে কেঁদেছিল রবীন্দ্রনাথ। ভেবেছিল কী না জানি মজার জায়গা ঐ স্কুল। হয়তো খুঁজে না পাওয়া রাজার বাড়িটা ওরই কোনো ঘরের কোণে।

কান্না দেখে গুরুমশাই চড় মেরে বসল, বললে, 'এখন তো ইস্কুলে যাবার জন্যে কাঁদছিস, পরে না-যাবার জন্যে এর চেয়ে আরো বেশি কাঁদবি।'

সে ইস্কুলে বেশিদিন থাকতে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে, ঢুকিয়ে দেওয়া হল নর্মাল স্কুলে। নানা কারণেই নর্মাল তখন অস্বাভাবিক, বালকদের উপর চলছে বিচিত্র অত্যাচার। সে রাজ্যে এই নতুন উপহার—ন্যাড়া মাথা!

দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণ রবীন্দ্রনাথ, বাবা তেতলার ঘরে ডাক দিলেন। হিমালয়ের ডাক।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে হিমালয় যাবে?'

হিমালয়! সমস্ত স্তব্ধতার তুষার গলিয়ে দিয়ে বেগনির্গত হল যেন স্বরের স্বরধুনী। যাব, যাব, চিৎকার করে বলতে পারলে যেন সমীচীন উত্তর হত। কিন্তু সলজ্জ প্রফুল্ল হাসিটুকু থেকেই বুঝতে পেরেছেন দেবেন্দ্রনাথ।

নূতন পোশাক তৈরি হল রবীন্দ্রনাথের জন্য। শুধু পরনের পোশাক নয়, মাথার জন্যে জরির কাজকরা গোল একটি মখমলের টুপি।

নেড়া মাথায় টুপি পরব কী করে? মনে মনে প্রবল মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে চাইল রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই দেবেন্দ্রনাথ শান্তস্বরে বললেন, 'মাথায় পরো।'

আর কথা নেই। বাবা বলেছেন। তৎক্ষণাৎ নেড়া মাথায় মখমলের টুপি পরল রবীন্দ্রনাথ।

হিমালয়ে বেরুবার আগে কটা দিন বোলপুরে থাকবার কথা। ছাতিম আর বুনো জাম-খেজুরের বোলপুর। আর চারদিকে উধাওধাওয়া মাঠ। শুধু শ্যামলা শান্তি আর সুনীলা মুক্তি দিয়ে ভরা।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বেড়ান দেবেন্দ্রনাথ। সেই উপলক্ষে বাংলার নানা জায়গায় ঘোরেন। একবার এমনি বোলপুর থেকে চলেছেন রায়পুরে, সুরুলের পথ দিয়ে। যাচ্ছেন পালকি চড়ে। চারদিকে শুধু সীমাহীন প্রান্তর, মাঝে-মাঝে ছত্রাকৃতি সপ্তপর্ণী বা ছাতিম গাছ আর, আহা, কী সুন্দর এই শ্যামল জলের দীঘিটি। কী নাম এই দীর্ঘকার? ভুবনসাগর, চলতি কথায় ভুবন-ডাঙার বাঁধ। যেখানে ভুবনকে এনে বাঁধা যায় একত্র করে। দেবেন্দ্রনাথ উল্লসিত হলেন। অনবরুদ্ধ মাঠের সেই উল্লাস। জায়গাটা রায়পুরের জমিদার-দের—একলপ্তে কুড়ি বিঘে জমি কিনে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। তৈরি করলেন ছোট একটি একতলা গৃহ। নির্জনের কাছে নিঃশব্দ উপাসনার জন্যে।

কাছে গিয়ে বসাই হচ্ছে উপাসনা। হে নিঃশব্দ, তোমার কাছে বসলাম এসে বিরলে। হে গভীরগম্ভীর, তুমি শোনো আমার অন্তরের মৌন।

সমুদ্রের পারে যেমন আলোকস্তম্ভ, তেমনি সংসারের পারে এই দীপজ্যোতি।

হে বিরাট, তুমি যেমন নিঃসঙ্গ তেমনি আমাকে নিরাসক্ত করো। যেমন তুমি সর্ব কর্ম নির্বাহ করেও কর্মে লিপ্ত নও তেমনি আমি আমার সমস্ত কর্মে জড়িত থেকেও সকল কর্মের উর্ধ্বে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ তখন দু বছরের শিশু যখন এই জমি নিয়ে বাড়ি বানান দেবেন্দ্রনাথ। আরো ন' বছর পরে এই তার প্রথম আসা। প্রথম ট্রেনে চড়া। তরুশ্রেণীর ও মেঘশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড় দেওয়া মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা।

কিন্তু মাথার গোল টুপিটাই বড় গোল বাধিয়েছে। বাবার দিকে আড়-চোখে চেয়ে মাঝে মাঝে সেটা নামিয়ে রাখতে চায় রবীন্দ্রনাথ, তখুনি বাবার চোখের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। নিরস্ত হতে হয় অমনি। নেড়া মাথাটাকে আর হাওয়া খাওয়ানো যায় না।

তার শ্যামাঞ্চল ছড়িয়ে মুক্ত প্রকৃতি কুড়িয়ে নিল রবীন্দ্রনাথকে। মনের মধ্যে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। আকাশ অফুরন্ত আলো আর হাওয়ার সঙ্গে অপরিমাণ প্রাণ নিয়ে দাঁড়াল এসে সামনে।

অগাধ শান্তির মত সন্ধ্যা নামে। বাগানের সামনে বারান্দায় এসে বসেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে ডাকেন গান গাইতে। বালক বেহাগে গান ধরে :

'তুমি বিনা কে প্রভু
সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে।
রয়েছি বন্দী সম মোহের আগারে।'

বড়দাদা দ্বিজেন ঠাকুরের লেখা। জ্যোতিদাদার লেখা আরো একটা গান বড় ভালো লাগে বাবার। 'শঙ্করশিব সংকটহারী, নিস্তারো প্রভো জয় দেবদেব।' এইটে পৈতের সময় সুধাকণ্ঠ বালক-বালিকাদের সঙ্গে গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে বিষ্ণুরাম চাটুজ্জের সেই গান :

'জয় জগজীবন জগত-পাতা হে,
জয় দীনশরণ শুভদাতা হে।'

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম গুরু শ্রীকণ্ঠবাবু, শ্রীকণ্ঠ সিং, দ্বিতীয় বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, তৃতীয় যদু ভট্ট।

রবীন্দ্রনাথ গাইছে আর তন্ময় হয়ে শুনছেন দেবেন্দ্রনাথ। দুটি হাত কোলের উপর জোড় করা। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে এনে নিঃশব্দ আনন্দে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছেন—ভঙ্গিটির তাই যেন অর্থ। একটি নীরব নমস্কারে সমস্ত জীবন যেন পর্যাপ্ত হয়ে নিবেদনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে,
সমস্ত মন পড়ে থাকুক তোমার ভবনদ্বারে।'

এ কার কাছে নিবেদন? এ নমস্কার কাকে?

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড করে রয়েছেন তাঁকে। অন্তরে বাহিরে যিনি নিরন্তর, তাঁকে। যিনি পিতা, ত্রাতা, নিয়ন্তা, তাঁকে।

পিতার সেই মহৎ রূপটি নিজে নত হয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেন দেবেন্দ্রনাথ। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, নয় কিছু দেব বলে। ভয়ে নয়, নয় বা পীড়নে। এ প্রণাম আনন্দে, গরিমায়, উপলব্ধিতে। তুমি আমার পিতা, আমার আপন, এ আনন্দ। আমি তোমার সন্তান, তোমার আপন, এ গৌরব।

তোমার শাসনের মধ্যে কল্যাণ, বিধানের মধ্যে ক্ষমা, বঞ্চনার মধ্যে নিষ্কৃতি।

অপরাজেয় আশার মত প্রভাত আসে। সকালবেলা ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন দেবেন্দ্রনাথ। ভিক্ষুক দেখলে বলেন, ভিক্ষে দাও। দীন-দরিদ্রের দিকে চোখ ফেরাও। এ সত্যিকার কে খোঁজ নাও। তার হাত ধরো। তাকে বোঝাও তুমি তার অপর জন নও, তুমি তার আপন জন।

অনেক জায়গা ঘুরে পৌচেছেন অমৃতসরে। সরোবরের মাঝখানে শিখদের গুরুদ্বার। সেখানে পিতা-পুত্রে যান প্রায়ই সকালবেলা। চলেছে অখণ্ড পাঠ আর কীর্তন। সেই শব্দসুধাসমুদ্রে স্নান করেন দুজনে।

একদিন তো ওদের ভজনে কণ্ঠ মেলালেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তো অবাক, তার চেয়ে বেশি অবাক শিখেরা। বিদেশীর গলায় এ কী সুর, এ কী ভাষা।

ব্যাকুলতাই সুর, ভাষাই পূজাঞ্জলি।

চোখ কান খোলা রেখে সব দেখে আর শোনে রবীন্দ্রনাথ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরেও যে ইন্দ্রজাল তাকে দেখে। তাকে শোনে।

অমৃতসর থেকে ডালহৌসি পাহাড় আর কতদূর? এবার চলো সেখানে,

হিমালয়ের কোলে। গায়ত্রী থেকে হিমালয়। হিমালয়ই ভারতবর্ষের গায়ত্রী।

প্রভাতের মন্ত্র নিয়ে দাঁড়াও এবার উদয়শিখরে। ঘোষণা করো। তাকে আমি দেখেছি। তাকে আমি জেনেছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে জাগ্রত সে শাশ্বত সূর্য।

দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দাও এই নব প্রভাতের জয়ধ্বনি।

বন্ধনের মুক্তি, বিরোধের মুক্তি, অন্ধকারপীড়িত অগণন মানবাত্মার শৃঙ্খল-মোচন। সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার এ কয়দিনের মানব-জন্ম চিরদিনের জন্যে সার্থক হোক।

॥ দুই ॥

হিমালয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। ডালহৌসি পাহাড়ে বকরোটা গিরিশৃঙ্গে।

আকাশের দিকে তাকাও। পর্বতশিখরের উর্ধ্বে অপারউদার আকাশ। 'সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা।' তারপর রাত্রে দেখ অম্লান অক্ষরে জ্বলছে কেমন নক্ষত্রকণিকার মণিকা।

ঐ সব গ্রহ-তারার পরিচয় নাও। চলে এস জ্যোতিষ্ক সাম্রাজ্যে।

ছোট ছেলেকে নিজের হাতে শেখান দেবেন্দ্রনাথ। যে আকাশে রাজত্ব করছে রবি হয়ে, তার খোঁজ নাও। সূর্য তো গ্রহরাজ। আর 'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!' অপার ভুবন উদার গগন শ্যামল কাননতল।

আকাশের খোঁজ নেওয়া মানেই বিকাশের খোঁজ নেওয়া। আকাশকে দেখলেই মনে-মনে সঙ্কল্প করবে আমিও প্রকাশিত হব। আলোকিত হব। অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকব না। আমারও ঘুম ভাঙবে।

আমাকে প্রকাশ করো। এই তো মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনা। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট, আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন, আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি মৃত্যু দ্বারা আবৃত, আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে একমাত্র আমার হয়ে প্রকাশিত হও। তুমি প্রকাশিত হলেই আমি প্রকাশিত। 'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

বোধোদয় পড়াবার সময় নীলকমল পণ্ডিত বলেছিল উপরে যে ঐ নীল ঢাকনাটা দেখছ ওখানে তুমি কিছুতেই গিয়ে ঠেকতে পারবে না। না, সিঁড়ির পর সিঁড়ি লাগিয়েও না।

'আরো সিঁড়ি? আরো সিঁড়ি?' জিজ্ঞেস করল রবীন্দ্রনাথ।

'হ্যাঁ, আরো আরো, আরো সিঁড়ি—কিছুতেই তুমি নাগাল পাবে না। তুমি যতই পৌঁছুবে সে ততই পিছিয়ে যাবে। তুমি যতই হাত বাড়াবে সে ততই পথ বাড়াবে।'

তবে সে আছে কেন?

আমি আছি, শুধু এই কথাটা বলবার জন্য। আমি আছি—এই একটা কথা বলবার জন্যে যদি কেউ থাকে তো ঐ আকাশ।

একেবারে একটা প্রান্তের ঘরে শোয় রবীন্দ্রনাথ, প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি। কাঁচের জানালা দিয়ে শেষ রাত্রে পাহাড় দেখে। ভোর হয় নি, তারাগুলো শুধু যাই-যাই করছে, এমনি ধূসর আবছার মধ্যে। পাহাড়ের চূড়ায় স্বপ্নপুরীর ঐশ্বর্যের মত বরফ জমে। অন্ধকারেই ঝলমল করে।

সেই দুঃসহ শীতে উঠেছেন দেবেন্দ্রনাথ। গায়ে একখানি লালরঙের শাল। হাতে মোমবাতি নিয়ে চলেছেন বারান্দায়। বাইরের বারান্দায়, কাঁচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চলেছেন নিঃশব্দে, কারু যেন না ঘুম ভাঙে। কোথায় চলেছেন তিনি? বাতি দিয়ে কী করবেন?

বাতিটি নিবিয়ে দেবেন। বারান্দায় পৌঁছে বসবেন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। বসবেন উপাসনায়। ঈশ্বরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবার নামই উপাসনা।

চোখ চেয়ে চেয়ে সব দেখছে রবীন্দ্রনাথ। একদিকে উন্নত গম্ভীর হিমালয়, আরেক দিকে প্রশান্ত গম্ভীর পিতৃদেব। ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হবে, শুধু আকাশে নয়, জীবনের অগাধ অনুভবে। সূর্যোদয়ের জন্যে এই প্রতীক্ষা এই প্রস্তুতির নামই উপাসনা।

সমস্ত ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়। অমনি একটি নিঃশব্দ ও নিগূঢ় নিবেদনের জন্যে মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

ভোর হলে ছেলেকে পাশে ডেকে নেন দেবেন্দ্রনাথ। ছেলের সঙ্গে আরেকবার উপাসনা করেন। উপনিষদের মন্ত্র পড়িয়ে শোনান।

যা কিছু দেখছ চোখের সামনে, যা কিছু বা দেখছ না, যা নড়ছে চলছে

হচ্ছে সরে যাচ্ছে সবই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। তিনি অণুর অণু, মহানের মহান। তাঁর দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান, তাঁর প্রভাবেই সকলে প্রভান্বিত। তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, উৎপত্তি-বিনাশ নেই, অপচয়-উপচয় নেই।

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা আছে, হে, পূষণ হে জগৎ-পরিপোষক সূর্য, আমি সত্যধর্মা, আমার উপলব্ধির জন্যে, তা অপসারিত করো। হে পূষণ, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে সূর্য, তোমার কিরণজাল সংবৃত করো, যাতে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখতে পারি। দেখতে পারি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ আর আমি এক ছাড়া দুই নই।

নক্ষত্রবেদির তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক॥

মুগ্ধের মত শোনে রবীন্দ্রনাথ। অর্থ সব বোঝে না কিন্তু ধ্বনিটি আনন্দময় লাগে। আনন্দময় লাগে সেই মন্ত্রমুখর নিস্তব্ধতা।

চারিদিকে এত যে ধ্বনি, পাতার মর্মর, নদীর কলস্বন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বিহঙ্গের কাকলি—কী এদের অর্থ? শুধু একটি আনন্দের বিজ্ঞাপন। জলে স্থলে আকাশে একজন আনন্দময় বিরাজ করছেন তারই স্বীকৃতি।

তাঁকে দেখ। তাঁকে অনুভব করো। কেউ কি কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণচেষ্টা করত যদি আকাশে বাতাসে তিনি আনন্দময় হয়ে না থাকতেন! 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।' এই একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পরম এক রাজরাজেন্দ্র বিরাজ করছেন, তাঁর সংবাদ নাও। ভগবদগীতা থেকে শ্লোক বেছে দাগ দিয়ে রেখেছেন দেবেন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতেন, নকল করে আনো। উপক্রমণিকা পড়ান, সঙ্গে একটু আধটু ইংরিজি। আর শেখান কাকে বলে আধ্যাত্মিক তন্ময়তা। পর্বতের উপর প্রত্যুষের আবছায়ায় দেখ তাঁর পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, দেখ কেমন তিনি সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে সেন্ট যেবিয়ার্সে ভর্তি হল রবীন্দ্রনাথ। যদি এবার খোদ সাহেবি ইস্কুলে কিছু ফল হয়। মন যায় পড়াশোনায়।

সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। বড়দিদি আক্ষেপ করছেন, বড় হলে রবি একটা মানুষের মতো হবে এই সবাই আশা করেছিলাম। কিন্তু কী দুর্দৈব, সেই আশাই কিনা নষ্ট হল সমূলে।

তবু ইট-কাঠ-দেয়ালের ইস্কুল আকর্ষণ করতে পারল না। তার চেয়ে দেখি এই আরেক বিদ্যালয়। অশেষ জীবন ও অমিত সৌন্দর্যের বিদ্যালয়। সেই ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে শুধু একজন শিক্ষক। বিনা বেতনের শিক্ষক। শুধু শিক্ষক নন, সখা। সমবয়সী। সব সময়ে সমবয়সী।

'তুমি চির মঙ্গল সখা হে।' 'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।'

সেণ্ট যেবিয়াসে´একটি মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ পেল রবীন্দ্রনাথ। সময়িকভাবে বদলি খাটতে এসেছেন এক অধ্যাপক, নাম ডি পেনেরাণ্ডা, স্পেন দেশে বাড়ি। স্পেন দেশে বাড়ি বলে ইংরিজি উচ্চারণে একটু বাধো-বাধো। সেই কারণে ছেলেরা বিশেষ শান্ত থাকে না ক্লাশে। যেটুকু সম্ভ্রম তাঁর শিক্ষক হিসাবে প্রাপ্য তার চেয়ে যেন কম পান। মুখখানি বিমর্ষ হয়ে থাকে। তার জন্যে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবা দূরের কথা, কারুর কাছে নালিশ পর্যন্ত করেন না। নম্র হয়ে সহ্য করেন প্রতি দিনের অপ্রসাদ। যেন আশা করেন কেউ একদিন বুঝবে তাঁর গ্লানিহীন ম্লানিমাকে।

মুখশ্রী সুন্দর নয়, কিন্তু বেদনার নির্মলতা কেমন একটি লাবণ্য ঢেলে দিয়েছে। সেইটিই কিশোর রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। মনে হয়, বাবাকে যেমন উপাসনা করতে দেখেছে—হিমালয়ে সেই ভাবটি যেন নিবিড় করে আঁকা তার চোখ দুটিতে। অন্তরে যেন সেই বিশ্বাস আর সমর্পণের শুদ্ধতা। অন্তরের চিন্তাটি যদি মহৎ হয় আননের শ্রীটিও পবিত্র হয়ে উঠবে।

কী একটা লিখতে দিয়েছেন ছেলেদের। নিজে ঘুরে ঘুরে দেখছেন কে কী রকম লিখছে। একদম কলম চলছে না রবীন্দ্রনাথের। মাথা উঁচু করে কলম হাতে কী সব ভাবছে সে এলোমেলো। কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পেনেরাণ্ডা। লিখছে না বলে কোথায় ধমক দেবেন, তা নয়, পিঠের উপর হাত রেখেছেন সস্নেহে। নুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করছেন মধুর স্বরে, তোমার কী শরীর ভালো নেই?

ছোট্ট একটি কথা, সামান্য একটু সুর, কিন্তু যেন সুধাসমুদ্রের ঢেউ। মন বড হলেই যেন হাত ও হাতের স্পর্শ অত বড় হয়। নত ভঙ্গির প্রীতিস্পর্শটিই ঈশ্বরস্পর্শ।

তোমারি মুখ ওই নুয়েছে
মুখে আমার চোখ থুয়েছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ ॥

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স, প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল রবীন্দ্রনাথের। হঠাৎ শেষরাত্রে বাড়ির পুরোনো দাসী আর্তনাদ করে উঠল। ঘুম ছেড়ে উঠে বসল রবীন্দ্রনাথ, তবে কি মা আর নেই? অনেকদিন ধরে ভুগছেন, আছেন অন্তঃপুরের তেতলায়। বোটে করে গঙ্গায় ছিলেন কিছুকাল, বিশেষ উপকার হয়নি তবে আজ কি সব শেষ হয়ে গেল? তবে আর কান্নাকাটি নেই কেন? দাসীর মুখ কে চাপা দিল?

মিটমিটে বাতির আলোয় স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না রবীন্দ্রনাথ। সকাল হলে বুঝল। শুনল মা মারা গেছেন।

কাকে বলে মৃত্যু, সে যেন কী ঘোরদন্ত মহাকায়, কী অসহদর্শন ভয়ঙ্কর, বিষণ্ণ হল রবীন্দ্রনাথ। কী করে তাকাবে তার মার দিকে? দাঁড়াতে পারবে তো কাছে গিয়ে?

আহা, ঐ দেখ, বাইরের উঠোনে মাকে আনা হয়েছে, শুয়ে আছেন খাটের উপর। ভোরের আলোটি ঈশ্বরের ভালোবাসার মত গায়ে এসে পড়ছে। এই মৃত্যু? এ তো শান্তি, এ তো সুখসুপ্তি। এ তো দয়ার মত স্নিগ্ধ, ক্ষমার মত মনোহর।

তোমার দয়া তোমার ক্ষমা
হোক চির পাথেয় চিরযাত্রার।

কোনো কিছু একটা নিশ্চিহ্ন হয়ে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল এ তো তার ছবি নয়। একটা কক্ষ ছেড়ে চলেছে আরেক কক্ষে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে সেই চিরযাত্রার ছবি।

এই সেদিনও মাকে বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়ে শুনিয়েছে। কৃত্তিবাসের চলতি বাংলা রামায়ণ নয়, অনুষ্টুপ ছন্দের সংস্কৃত রামায়ণ। হিমালয়ের আশ্রয়ে এনে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে দিয়েছেন সেই মহাকবির উদার স্পর্শ। গায়ত্রী-গীতা-উপনিষদের পর এই বাল্মীকি রামায়ণ। মা কত খুশি হয়েছেন। সন্তান-গর্বের সুখ এক বস্ত্রাঞ্চলে ধরেনি। লোক ডেকে এনে বিতরণ করেছেন অকাতরে দেখ দেখ কোথা থেকে আমার রবি তার নতুন দীক্ষা নিয়ে এসেছে, কোন উদয়তীর্থের উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া থেকে।

সেই মা কি আর কথা কইবেন না? এই যে চুপ করে আছেন এ কি আরেক রকম কথা কওয়া নয়? এই যাকে শেষ বলছি এই কি অশেষ নয়? অন্তই কি নয় অনন্তের দুয়ার?

'মৃত্যু বড়ো সুন্দর, বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন, সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে। তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে। মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ স্থিতিকে বিচলিত করে।'

অশ্রুধৌত মুখে রবীন্দ্রনাথ ফিরল শ্মশান থেকে। গলির মোড়ে এসে তেতলায় বাবার ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। বেলা অনেক হয়েছে, তবু বাবা ওঠেননি আসন থেকে। উপাসনায় বিনিশ্চল হয়ে আছেন।

শোকের সরোবরে ফুটে উঠেছে একটি সান্ত্বনার শতদল। বেদনা বিশ্রাম পেয়েছে নিবেদনে। সমস্ত আক্ষেপ-নিক্ষেপ নিবৃত্তি পেয়েছে স্বীকৃতিতে, শরণাগতিতে।

সমস্ত যাওয়াই ঈশ্বরের মধ্যে যাওয়া। সমস্ত আসাই ঈশ্বরের থেকে আসা। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। প্রথম প্রাণ কার থেকে ছাড়া পেল? পরমাণুকে কে প্রথম শক্তি দিল? কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কার দ্বারা প্রথম প্রৈতি, প্রথম বেগ লাভ করেছে? যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

মা আগে সীমাবদ্ধ ছিলেন, এখন পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। তাঁর আঙুলের আগায় যে সুন্দর স্পর্শটি ছিল তাই এখন চলে এসেছে ফুলের পাপড়িতে, তাঁর চোখে যে কোমল আশীর্বাদ ছিল তাই এখন ফুটে রয়েছে তারার বিন্দুতে, শিশিরবিন্দুতে, তাঁর অঙ্গভরা যে ভালোবাসা তাই এখন ছড়িয়ে পড়েছে দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে।

'ত্যাগ বড়ো সুন্দর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয় বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেশন করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।'

কবিতা লিখে ফেলল রবীন্দ্রনাথ। সেই যে হিমালয় দেখে এসেছিল তার কবিতা:

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি
গান ব্যাসঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায় !

খুব একটা উঁচু সুরে তার বেঁধে নিল। কবিনেত্র উন্মোচন করেই দেখল প্রথম হিমাদ্রিশিখরকে আর মহাকবি ব্যাসকে। যেন প্রথম দৃষ্টিপাতেই সমীচীন দিগদর্শন হল। ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্ত জাগরণের জন্যেই সেই কবিতা—প্রথম কবিতা। ঠিক-ঠিক দেখল সেই ভারতবর্ষের চেহারা। তার পরিবেশ, তার পটভূমি। ব্যাস আর হিমালয়।

প্রথম কবিতার বই 'বনফুল'। যে বনের ছবি আঁকল রবীন্দ্রনাথ সেটিও হিমালয়ের পদমূলে।

প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রিশিখরদেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান
ঝরঝরে নির্ঝর ছুটে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান ॥

তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে। একবার তাকাল অনেক উঁচুতে, অভ্রস্পর্শী চূড়ার দিকে, আরেকবার তাকাল অনেক দূরে, অভ্রস্পর্শী দিগন্তরেখায়। উঁচু আর দূর, দূর আর উঁচু, বৃহৎ আর মহৎ, মহৎ আর বৃহৎ—তুমি ভারতবর্ষের কবি, তুমি অমিতবর্ষ বসুন্ধরার কবি।

উচ্চ হতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন।

দেবতার সিংহাসনটি দেখ। কোথায় সেই স্বর্ণ-সিংহাসন ? আর কোথায় ! তোমারই মনের মধ্যে। সেখানে সোনা কোথায় ? কোথায় মণিমাণিক্য ? ভালোবাসাই সোন', অশ্রুকণার মণিমাণিক্য।

সেদিন একলা বসে আপন মনে গান গাইছিলাম। জলে-স্থলে শুনছিল কে কান পেতে বুঝিনি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, হে মহারাজ তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসেছ। নেমে এসেছ আমারই দীনহীন ঘরের দুয়ারে। নির্জন দেখেই আসতে সাহস পেলে। আর কোন সুর তোমার কানে যায় না, শুধু কান্নার

সুরটুকুই তোমার কানে যায়। কী বিরাট তোমার সভা, কত তাতে জ্ঞানী-গুণী, তবু এই গুণহীনের গান তোমার কানে গেল। তুমি তোমার দুটি বাহুর বরণমাল্য নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালে। কত গান শুনছ তুমি দিনরাত, কিন্তু তোমাকে ভালোবেসে তোমার জন্যে কেউ কাঁদছে এমন গান তুমি আর কোথাও শোননি। শুনলে আর অমনি ফেলে এলে সিংহাসন। মহারাজ ছিলে, ভিখিরি হয়ে গেল। দ্বারে দ্বারে শুধু ভালোবাসার অশ্রুবিন্দুটি কুড়োবার জন্যে।

ষোল বছর বয়সে 'কবি কাহিনী' লিখল রবীন্দ্রনাথ। লিখতে লিখতে বিশাল এক রাজত্বের মধ্যে চলে এল। অন্তহীন দিগন্তহীন মহাদেশ। তার নাম কী? তার নাম মানব-হৃদয়।

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন
গম্ভীর সে নিশীথিনী সুন্দর সে ঊষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নে ম্লান মুখচ্ছবি
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি সমুচ্চ সে গিরিবর
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল
পারে না পূরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন ॥

মানুষের মনের মত বড় আর কী আছে? কত বড় পৃথিবী, তার চেয়ে কত বড় সমুদ্র, তার চেয়ে আরো কত বড় আকাশ। ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড়। সেই ঈশ্বর মানুষের মনের মধ্যে।

কিন্তু মৃত্যুর পরে আর কি কিছুই নেই? কিছুই থাকবে না?

বড় হয়ে মাকে একদিন স্বপ্ন দেখলেন রবীন্দ্রনাথ। দেখলেন তিনি যেন সেই ছোট বালক আর মা যেমন বাড়িতে থাকেন তেমনি আছেন। আছেন তো আছেন, সব সময়েই তো তা নিয়ে সচেতন থাকা চলে না ব্যস্ততার সংসারে। তাই যেমন আগে মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে চলে যেত তেমনি উদাসীনভাবে চলে গেল রবীন্দ্রনাথ। বারান্দায় গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ও কী, ঘরের মধ্যে ঐ মা বসে আছেন না? তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। মা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরলেন, কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি এসেছ?

যদি মায়ের ঐ স্পর্শটি পেতে চাও, ঐ স্বরটি শুনতে চাও, ছুটে যাও মায়ের

কাছে। তাঁর পায়ের ধুলো মেখে তোমার ললাট নির্মল করো।

সংসারে মা বিরাজ করছেন সর্বময়ী কর্ত্রীর মত। যদি তার কাছে তুমি না-ও যাও তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না, তাঁর সেবা-স্নেহ অকৃপণ থাকবে। তুমি অবাধ্য হও অযোগ্য হও, কিছু এসে যাবে না—তাঁর ভাণ্ডার অখণ্ড। তেমনি ঐ মায়ের মত ঈশ্বর। তাঁকে না মানো না জানো, ভুলেও একবার তাঁর দিকে না তাকাও, তোমাকে তাই বলে তিনি ঠকাবেন না, ফেলে দেবেন না। অন্নজল তোমাকে ঠিকই পরিবেশন করবেন, ধনে জনে ঠিকই পরিপূর্ণ রাখবেন তোমাকে। কিন্তু শুধু তাই দিয়েই কি তোমার মন ভরবে? তোমার মন কেঁদে কেঁদে উঠবে, সেই স্বরটি কোথায়, সেই স্পর্শটি কোথায়? মা রয়েছেন বসে, তুমি তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছ, পেলে না তাঁর হাতের ছোঁয়া, শুনলে না তাঁর গলার স্বর, তোমার মত অসম্পূর্ণ আর কে আছে?

তাই বঞ্চিত কোরো না নিজেকে। মায়ের ঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যেও না। ছুটে এসে মায়ের পায়ের কাছটিতে পৌঁছোও। মাকে ধরো। নাও তাঁর স্পর্শের অমিয়। শোনো তাঁর কণ্ঠের মাধুরী।

কবিকাহিনীতে প্রকৃতিকেই কিশোর কবি আদি-জননী বলে বন্দনা করল।

কালের মহান পক্ষ করিয়া বিস্তার
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননী
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন॥

আবার প্রকৃতি লীলাসঙ্গিনী। 'প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।' প্রভাত সমীরণ যেমন কুসুমের কানে মর্মের বার্তা চুপি চুপি বলে তেমনি কবির কানে মনের যত কথা সব বলে প্রকৃতি। কিন্তু এই প্রকৃতিকে ধরা যায় কী করে?

নানা নিয়ম ও নিষেধের কারাগারে বন্দী রবীন্দ্রনাথ। শুধু বাইরে থেকেই প্রকৃতি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে, গরাদের বাধা ভেঙে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবার সাধ্য নেই। 'সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়ে নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করবার নানা চেষ্টা করত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।' কিন্তু শুধু দূর থেকে অপ্রাকৃত [illegible] চিত্ত তৃপ্ত হয় কই?

এখনো [illegible] মাঝে রয়েছে দারু[illegible]
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না [illegible]
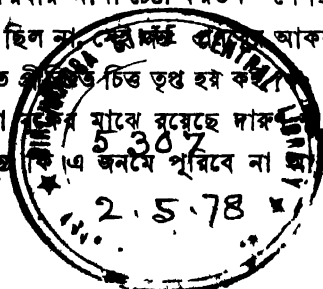
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

নায়ক কবি শ্রান্ত হয়ে বৃক্ষতলে শুয়েছে, 'হেন কালে ধীরি ধীরি, শিয়রের কাছে আসি দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা।' সে বালিকার নাম কী? সে বালিকার নাম নলিনী। নলিনী রবীন্দ্রনাথের এক প্রিয় নাম। 'খোল গো নলিনী খোল গো আঁখি। এখনো ঘুম ভাঙিল নাকি?' না কি আছে আরো কোনো প্রিয়তর নাম, প্রিয়তরা প্রতিমা? যা পাওয়া যায় তা নয়, যাকে চাওয়া যায় অথচ পাওয়া যায় না সে? 'মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।' 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না।'

ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়ালে তবে রহিল গো কেন?
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে
দেখেও মিটেনা কেন আঁখির পিপাসা?
এত তারে ভালোবাসি তবু কেন মনে হয়
ভালোবাসা হইল না আশ মিটাইয়া।
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।

কে সে প্রিয়তমা যে প্রতিমা হয়ে শেষে প্রকৃতি হয়ে যায়? প্রেম হয়ে মরে গিয়ে শেষে প্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকে?

তার নাম কী?

'কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে, জানিনা কী নামে স্মরণ করিব ওকে।'

॥ তিন ॥

আমেদাবাদে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বেড়াতে এল রবীন্দ্রনাথ।

মেজদাদা আমেদাবাদের জেলা-জজ, থাকেন শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। প্রকাণ্ড অফুরন্ত বাড়ি, নিচে ক্ষীণকায়া সবরমতী নদী বালির নিরালা বিছানায় শুয়ে আছে। চারদিকে বিরহতন্ময় অবকাশ। কার একটি

নিমেষ-নিহত চাহনির মত উদাসীন।

সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে, সারাদিন শূন্য পুরীতে নতুন নির্জনতা নিয়ে দিন কাটায় রবীন্দ্রনাথ। মেজবৌঠাকরুন তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলেতে। সারা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গ দেবার মত কেউ নেই। দুপুরে ঘরে-বারান্দায় একা-একা ঘুরে বেড়ায় আর ভরা গলার কপোতকূজন শোনে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সেই কপোতকূজন।

হঠাৎ এক নতুন বিষাদ নতুন বিরহের মুখোমুখি হয় রবীন্দ্রনাথ। বুঝতে পারে চিত্তের যে অভিপ্রেতা সেই অপ্রাপ্যা হয়ে সমস্ত স্বর্গ-মর্ত আচ্ছন্ন করে আছে।

কে সে ?- সে এক নবকৈশোরের মেয়ে। সে চিরকাল দূরে-দূরে সুন্দর হয়ে বিরাজ করে। তাকে শত কাছে টেনে আনলেও তার দূরত্ব ঘোচে না। পাইয়েও যে মনে করিয়ে দেয় কতখানিই সে না-পাওয়া।

'সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।'

সেই এক অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন নীরবে কার বন্দনা করে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো,
শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ব-বনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানিনে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে,
কি কহ, সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে ॥

কত বই কত ছবি কত সব রহস্যপুরীর ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ও সবের দিকে না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত নিয়ে বসে। গুরুগম্ভীর বই, সাধ্য নেই তার মানে বোঝে, তবু পড়তে কেমন ভালো শোনায়। কানে ভালো লাগে বলে প্রাণেও ভালো লাগে। বোঝে, সবই বোঝবার জন্যে নয়, কিছু কিছু আবার বাজবার জন্যে। সংস্কৃত কথার ধ্বনি আর ছন্দ রবীন্দ্রনাথকে তন্ময় করে রাখে।

যেন মৃদঙ্গে গম্ভীর ঘা পড়ছে আর তালে তালে মনেও উঠেছে সেই বাজনার ঢেউ। ভাবছে যার ধ্বনি এত সুন্দর ছন্দ এত মধুর তার অর্থ যেন কত গভীর!

আবার ভাবছে সমস্ত শব্দ-অর্থের অতীতেও যেন আরো কিছু থেকে যায়। তাকে কিছুতেই বোঝা যায় না, বোঝানোও যায় না। সেই তো চিরন্তন না-পাওয়া।

ওগো মোর না পাওয়া গো কখন আসিয়া সঙ্গোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলি-পরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি,
আমি বলি বুঝাতে পারি নে॥'

সেই নবকৈশোরের মেয়ে, উজ্জ্বল শ্যামল রঙ, গলায় পলার হার, পায়ে আলতা, সংসারে এল রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠাকরুন হয়ে। মনোরথপ্রিয়তমা হয়ে। বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা, দুরধিগম্য ও দুরবগাহের প্রতিমা হয়ে। সমস্ত প্রত্যক্ষেও যে দুর্লঙ্ঘ্য, নিত্যকাল যে শুধু আসেই অথচ পৌঁছায় না, তারই নির্ভুল খবর নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের থেকে সে বয়সে প্রায় দু বছরের বড়, সে পরোঢ়া, সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া, নিষিদ্ধা, এ সব প্রশ্ন অবান্তর। দূরের বন্ধু কাকে সুরের দূতী করে জীবনে পাঠাবে তা কে বলতে পারে।

'তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, আমি তারি দূত,
যে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে॥'

তেতলার ছোট ঘরে রাত্রে শোয় রবীন্দ্রনাথ। শোবার আগে ঘরের

সামনেকার প্রকাণ্ড ছাদে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। উপরে জ্যোৎস্না-ঢালা পারহারা আকাশ আর সামনে বালির প্রান্তর, তার গা ঘেঁসে সুদূরের সঙ্কেতময়ী সবরমতি—হঠাৎ এক রাত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে গান চলে এল ভাসতে ভাসতে।

যেন এক মুক্ত গগনের পাখি। মুক্ত পবনের সুগন্ধ।

ছুটি, ছুটি, গুহাগৃহ থেকে নির্ঝরিণী ছুটি পেয়েছে। মৃত্তিকার গৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছে তরুণ তৃণাঙ্কুর।

কথা এল। নিজেই সুর দিল গুন গুন করে। গেয়ে উঠল তারপর।

'নীরব রজনী দেখে মগ্ন জোছনায়
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো।
ঘুমঘোর ভরা গান বিভাবরী গায়
রজনীর কণ্ঠ সাথে কণ্ঠ মিলাও গো।'

রহস্যময়ী রাত্রি কথা কইছে তার আকাশমৃত্তিকাব্যাপী অনাহত স্তব্ধতায়। সে কথাটি শোনো কান পেতে। তারপর হৃদয়ের স্তব্ধতায় সুরটি সেই কথার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যখন রাত্রির অন্তরের কথাটির সঙ্গে তোমার অন্তরের সুরটি যুক্ত হবে—একটি সম্মিলিত স্তব্ধতা—তখন, তখনই পরিপূর্ণ শান্তি, তখনই 'সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি।' তখনই 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে।'

তুমিই আমার গভীর-গোপন, আমার পরম আপন। তুমি এই নিশীথ রাত্রে যে শান্তিময় বাণীটি মেলে দিয়েছ তাই আমি আমার জীবনে গেঁথে নেব। যে দীপ জ্বেলেছ এই নক্ষত্র-দ্যুতিতে, তাই আমারও অন্তরের অন্ধকার আকাশে জ্বলবে অনির্বাণ। সহস্রচক্ষু তুমি, ঐ নক্ষত্রদ্যুতিই তোমার নয়নজ্যোতি। অম্বরে যেমন অন্তরেও তেমনি।

বিশ্বস্রষ্টার জগদ্ব্যাপী রচনায় কত সমারোহ কত বৈচিত্র্য কত সৌন্দর্য কত কলাকৌশল। জটিলতার যন্ত্রে নিপুণতার ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ দেখে, ভাবে আর অভিভূত হয়।

ফুলের প্রত্যেক পাপড়িটিকে কত যত্নে সুগোল সুডোল করেছে, তাকে বৃন্তের উপর কেমন সুন্দর বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়েছে দেখ। পর্বতের মাথায় চির তুষারমুকুট পরিয়ে তাকে নীলাকাশের মধ্যে কেমন মহিমায় বসিয়ে দিয়েছে। কী মহৎ ছন্দোবোধ! পশ্চিমসমুদ্রতীরের সূর্যাস্তপটের উপর কত

রঙের কত তুলি পড়েছে। কী সূক্ষ্ম কারুকাজ। ভূতল হতে নভস্তল পর্যন্ত কত সাজসজ্জা কত রঙচঙ কত ভাব-ভঙ্গি, তবেই না আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষের মন ভুলেছে। ঈশ্বর তাঁর রচনায় যেখানে প্রেম সৌন্দর্য মহত্ব প্রকাশ করেছেন সেখানে তাঁকেও নানা গুণপনা করতে হয়েছে। করতে হয়েছে বহু ধ্বনি ও ছন্দ, বর্ণ ও গন্ধ, নানা অলঙ্করণের সযত্ন বিন্যাস। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটিয়েছেন তাতে কত পাপড়ির অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত করতে তাঁকে যে একটি নির্দিষ্ট ও সংযত ছন্দ রচনা করতে হয়েছে বিজ্ঞান তার শুধু পদ আর অক্ষর গণনা করেই কূল পাচ্ছে না।

ষোল বছরে পা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, সহসা হৃদয় নতুন সুরে কেঁদে উঠল। কে যেন বসন্তের বাতাসটুকুর মত চলে গেল প্রাণের প্রান্ত ছুঁয়ে। ব্যাকুলতার একটি অস্ফুট বংশীধ্বনি যেন ধূসর রেখায় আঁকা হল দিগন্তে।

আর, বাঁশি থামলেও বুঝি বাণী থামে না।

ওগো বন্ধু, আমার হৃদয়ে এস। মিঠি-মিঠি হাসো, মৃদু-মৃদু কথা কও, আমার মুখের উপর রাখো তোমার চোখদুটি। বন্ধু, তুমি কে ?'

কো তুহুঁ বোলবি মোয়। 'ভানু সিংহের পদাবলীতে' জাগল প্রথম জিজ্ঞাসা, নতুন জিজ্ঞাসা।

তোমার বংশীরবের অমিয় বিষ মনে হচ্ছে। হৃদয় দীর্ণ হচ্ছে অথচ দীর্ণতাই মধুবিস্তারী। আকুল কাকলিতে ভুবন ভরে গেল কিন্তু এ আমার আর্তনাদ ছাড়া আর কী! কাঁদাও অথচ মাতাও, তুমি কে ?

অশ্রুভরা চোখ মুছছে সকলে অথচ ক্ষণে-ক্ষণে জিগগেস করছে, হে সুমধুর, তুমি কে! কোথায়!

'কে উঠে ডাকি, মম বক্ষোনীড়ে থাকি।'

গোপবধূজনের যৌবন বিকশিত হল—উপবন মুকুলিত, যমুনা পুলকিত, নীল নীরে খেলা করছে ধীর সমীর—বন্ধু, তুমি কে ? আমার চোখের সামনে রয়েছ স্থির হয়ে, চোখ বুজলে জাগছ আবার হৃদয়ের অন্ধকারে, তবু হে অশেষ, হে অনিমেষ, তোমাকে জানি না, চিনি না, বলে দাও তুমি কে।

এই প্রথম জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ।

কে গো অন্তরতর সে!
কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে

শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।'

প্রথম বয়সের অস্ফুট চেতনার মধ্যেই আভাসে যেন একটা উত্তর এল। তুমি আমার শ্যাম, তুমি আমার মৃত্যু, তুমি আমার শেষ পরিপূর্ণতা।

মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

হে অবধারিত, হে অনিবার্য, তুমি এস, আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করো। তোমার প্রগাঢ় স্পর্শের সৌরভে আমার দুচোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, কাঁদতে-কাঁদতে তোমার কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়ব। কী আশ্চর্য, তুমি আমাকে ভোলো না, তুমি আমাকে ছাড়ো না, অনুক্ষণ তুমি আমাকে বসে আছ বুকে করে। বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেও তুমি কত দূর। দূর থেকে তুমি বাঁশি বাজিয়ে আমাকে ডাকছ, রাধা, রাধা, রাধা। আর আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে প্রতিধ্বনি করছি, বাধা, বাধা বাধা।

এবার সকল বাধা আমি দূর করব, উল্লঙ্ঘন করব। হোক আকাশ ঘনঘটায় ঘোরতর, দশ দিগন্ত তিমিরময়, পড়ুক বাজ, ঝলুক বিদ্যুৎ, তবু বিজন পথ ধরে যাব আমি একাকিনী। যাব তোমার অভিসারে। তুমি যার প্রিয় তার আবার ভয় কী। ভয়ই তোমার অভয়মূর্তি। বাধাই তোমার বাহুবন্ধন। 'ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি।'

আমি না গেলেও তুমি আমাকে ছাড়বে কেন? সব কেড়ে নিয়েও যে ছাড়বে না। তোমার যে আঘাত সেই তো তোমার ভালবাসা। তাই তো নিবিড় বেদনাতেও গায়ে আনন্দের ঢেউ লাগে। পথে-পথে পায়ে-পায়ে ব্যথা, তবু তোমার অভিসারে যাব সেই দুর্গমের দুঃখচূড়ে।

'তোমার অভিসারে যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।

বুকের মধ্যে যার বাসা তারই জন্যে এই অভিসার। 'যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অভিসারে।'

শুধু কি আমি চলেছি, তুমি চলোনি? আমি ব্যাকুল হলে তুমি ব্যাকুল না হয়ে পারো? চন্দ্র পরিপূর্ণ না হলে কি সমুদ্র উত্তরঙ্গ হয়? এই ঝড়ের রাতে কি তোমারও অভিসার নয়? গহন কোন বনের ধারে সুদূর কোন নদী তুমিও

পার হচ্ছ অন্ধকারে। তাই তো নিদ্রাহারা চোখে বসে আছি প্রতীক্ষা করে। বাতায়নে বসিনি, বসেছি মুক্ত দুয়ারের শূন্যতায়।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম শ্যামদর্শন। নবকৈশোরের মেয়ের প্রতি অকৈতব ব্রজপ্রেম। সে প্রেমে অখণ্ড আনন্দময়তা। সেখানে পরিপূর্ণতা ছাড়া কথা নেই। সেখানে মিলন আর বিরহ, ব্যথা আর শান্তি, আসক্তি আর বৈরাগ্য, সবই পরিপূর্ণতার স্বপ্ন।

'ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ তুমি
কও আমারে কথা।'

সেখানে মৃত্যুও বররূপে বরণীয়। তোমার জন্যে দিনরাত্রি জেগে আছি, তোমার জন্যে বয়ে বেড়াচ্ছি দুঃখ-সুখের মঞ্জুষা। তুমি এস, কথা কও। আমার যা কিছু পাওয়া আর হওয়া, যা কিছু আশা আর ভালোবাসা, সব তোমার দিকে প্রধাবিত। একটি নিবিড় দৃষ্টিপাতে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে, সে মুখচন্দ্রিকার জন্যে বসে আছি। তুমি এস, কথা কও।

'বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর
কেই বা আপন কেই বা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা
মরণ আমার মরণ তুমি
কও আমারে কথা॥'

আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করো। মরণের কাছে শ্যামসুন্দরের কাছে এই যে পিপাসিনী বিরহিণী রাধার আকৃতি এ আবার ভাষা পেয়েছে :

'ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এস বরবেশে

আমার পরাণ-বধূ ক্লান্তহস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,—
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।'

শুধু শ্যামশোভন নয়, ভয়াল-করালকেও রবীন্দ্রনাথ দেখেছে সেই সূচনাতেই। শুধু শ্যাম নয়, শিব। শুধু মধুর নয়, রুদ্র। মঙ্গল করেন বলে শিব। রোদন করান বলে রুদ্র।

'প্রলয় পিনাক তুলি
করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি অন্ত
থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।
অনন্ত আকাশ গ্রাসী
অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিল মহাধ্যান॥

ভীষণ-সুন্দর সেই রুদ্র-রুচিরের সঙ্গে কবে সেই প্রথম বয়সেই সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের। একদিকে সেই উদ্যতবজ্র, মহদ্ভয়, আবার অন্যদিকে নয়নানন্দী রসাম্বুনিধি। কোথায় পাহাড় বিদীর্ণ করে গলিত আগুন বেরুচ্ছে, উড়ে পুড়ে যাচ্ছে জনপদ, তুষারের ঝড় উঠেছে কোথাও, জল আর হাওয়ার মিলিত উৎসাহে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকা, কত সে প্রলয়ঙ্কর নৃত্য—আবার চেয়ে দেখ ধানের শিষের উপর শিশিরবিন্দুটি ঝলমল করছে, শরতের সকালে একটি পাখি গান করছে গাছে বসে। শ্লেটে প্রথম খড়ির বিন্দুর মত সন্ধ্যার অফুটন্ত তারা। যে নির্দয় সেই আবার হৃদ্য। যে শক্ত সেই আবার পেশল-পেলব। যা নিয়ম তাই ছন্দ। যা শাসন তাই শৃঙ্খলা।

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী কালীমূর্তিও দেখেছে রবীন্দ্রনাথ। সেই উগ্রপ্রভা আদ্যাশক্তিকে। বাল্মীকি-প্রতিভায় স্তব করছে বাল্মীকি।

‘রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণতি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোর উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দশ দিশি, ঘুরাও তড়িৎ অসি
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী,
মহাকাল-সীমন্তিনী
লহো জবা পুষ্পাঞ্জলি
মহাদেবী পরাৎপরা।’

যিনি করালী কালী তিনিই আবার কোমলা কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা। দংষ্ট্রা-করালবদনা, হয় তন্মুহূর্তেই আবার লক্ষ্মী লজ্জা বিদ্যা শ্রদ্ধা তুষ্টি পুষ্টি। নয়নে স্নেহের হাসি কিন্তু ললাটনেত্র অগ্নিবর্ণ। মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘের মধ্যে অশনি মুখ লুকিয়ে আছে। রৌদ্র বসনের অঞ্চলখানি রিক্ত প্রান্তরে বিসর্পিত। এক হাতে উত্তোলিত খড়্গ আরেক হাতে উদ্বেলিত অভয়। দেখে দেখে চক্ষু আর ফেরে না।

বিশ্বে-সংসারে প্রাণনে-জীবনে দুটি নারী কাজ করছে। একজন স্বপন-চারিণী আরেকজন সংসারচারিণী। ঘুরিয়ে বলি, একজন রাজেশ্বরী আরেকজন রাসেশ্বরী। লক্ষ্মী আর রাধিকা। আপ্তি আর ব্যাপ্তি। শ্রেয়সী আর প্রেয়সী। একজন পদ্মের মধু আরেকজন পাত্রের মদিরা। মর্তনাম মৃণালিনী আর কাদম্বরী। আবার ঘুরিয়ে বলি, একজন সংগীত আরেকজন সংগতি।

‘একজনা উর্বশী, সুন্দরী
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।
একজন দেবী হয়ে মানবী, আরেকজন মানবী হয়ে দেবী।।

'তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি—
হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখি কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয়-নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী॥'

সেই ক্ষুধিত পাষাণের বিশাল পুরীতে একা জেগে থাকে রবীন্দ্রনাথ। একা-একা ঘুরে বেড়ায়। 'সৃজনের আগে দেবতা যেমন একা।'

কিন্তু একা কে? একেলা কাকে বলে?

'জান কি একেলা কারে বলে?
জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।'

॥ চার ॥

'জীবনযাত্রার মাঝে-মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।'

সেই আপন-মানুষের দূতীটির আরেক নাম আন্না বা আনা তড়খড়। ডাক-নাম নলিনী।

'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
পাঠাল তোমার ঘরে

মিলন বীণা হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে।”

আমেদাবাদ থেকে বোম্বাইয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বাড়ি। পাণ্ডুরঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু। ইংরেজিয়ানায় ঝিলিক-মারা। তারই মেয়ে আন্না, বিলেতফেরতা, বিদেশী পালিশে ঝকঝকে করে মাজা। রবীন্দ্রনাথকে সেখানে পাঠানো দরকার যদি ওদের সংস্পর্শে এসে কিছুটা তার চেকনাই ফোটে। বিলেত যাবার কথা হচ্ছে তার।

মেয়েটিকে গান গেয়ে শোনায় রবীন্দ্রনাথ।

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখ জাগানিয়া॥

‘আহা, কী গান! তোমার গান শুনে আমি বোধহয় আমার মৃত্যুর দিনেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠি।’ আন্না বলে আনন্দিত মুখে: ‘আমার তুমি একটা ডাক-নাম রাখো না, আর সেটাকে গেঁথে দাও না তোমার কবিতায়।’

রবীন্দ্রনাথ নাম রাখল, নলিনী। কাব্যের গাঁথুনিতে বেঁধে দিল নামটা। ভোরবেলাকার ভৈরবীর সুরে শুনিয়ে দিল গান গেয়ে।

শুন নলিনী,
খোল গো আঁখি,
এখনো ঘুম ভাঙিল নাকি?

শুধু নলিনীর নাম নয়, নিজের নামটুকুও যুক্ত করে দিল;

দেখ তোমারি দুয়ার পরে
সখী, এসেছে তোমার রবি
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙেছে ঘুমের ঘোর
জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি।

নলিনী, নলিনী। একটি অনুরাগের মন্ত্র জাগল অনুভবের মন্দিরে। ক্ষণেকের জন্যে হলেও বুঝি ক্ষণিক নয়। ‘সত্যে যা পাই ক্ষণেকের তরে ক্ষণিক নহে।’ নলিনী আর নলিনী। লাজমাখা নলিনী, সুকোমলা নলিনী, নলিনী লো

নলিনী ! সেই ধ্বনি নতুন দিগন্ত রচনা করল, বড় করে দিল হৃদয়বোধের বেষ্টনী। একটি প্রিয় নামের মধ্যে কাঁপতে লাগল নতুন চোখ-মেলা আকাশের নীল।

চাঁদনি রাত। রবীন্দ্রনাথ তার ঘরে একা বসে আছে। ভাবছে কবে বাড়ি ফিরে যাবে। এই রুক্ষ দেশ ছেড়ে তার সবুজ বাংলায়, তার কলকাতায়, তার গঙ্গাতীরে। হঠাৎ আন্না তার ঘরে এসে ঢুকল। শুধোল : 'আহা, কী এত ভাবছ আকাশ পাতাল ?'

ভাবতে সময় দিল কই ? রবীন্দ্রনাথের নেয়ারের খাটের উপর এসে বসে পড়ল আন্না। বললে, 'আচ্ছা তুমি টাগ-অফ ওয়ার করতে পারো ?'

সে আবার কী বস্তু, রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'আচ্ছা, আমার হাত ধরে টানো তো, দেখি টাগ-অফ ওয়ারে কে জেতে।' বলে প্রস্তুত হতে না দিয়েই আন্না রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে টানতে লাগল।

সে ক্ষেত্রে হার না মেনে উপায় কী। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের না হল পুলকরোমাঞ্চ, না খুলল বা রসসৃষ্টি। সেই মারাঠি মেয়ের চোখে কে জানে একটি বাঙালি যুবকের পৌরুষ ম্লান হয়ে রইল।

কিন্তু না, মেয়েটিই শ্রীমতী ম্লানিমা। সে তো জিততে চায়নি, সে তো চেয়েছিল পরাভূত হতে, অভিভূত হতে। এ যে জিতিয়ে দিয়ে হারিয়ে দেওয়া।

একদিন আচমকা এসে বললে, 'কোনো মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পর যদি তার দস্তানা কেউ চুরি করে, জানো তার কী হয় ?

সে না জানি কী ভয়াবহ শাস্তি, রবীন্দ্রনাথ অনুমান করতে পারল না।

অপরূপ হেসে ব্যাপারটা লঘু করে দিল আন্না। বললে, 'যে চুরি করতে পারে সেই বাহাদুরের একটা অধিকার জন্মায় ?'

'অধিকার !'

'হ্যাঁ, সেই মেয়েটিকে চুমু খাওয়ার অধিকার।'

বলে আন্না রবীন্দ্রনাথের ইজিচেয়ারে নেতিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল নিদ্রাবেশ। খানিকবাদে ঘুম ভাঙতেই সে চাইল তার পাশে-রাখা দস্তানার দিকে। দুটিই যেমন-কে-তেমন মজুত আছে। তার একটিও কেউ চুরি করে নি।

এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লিখল :

'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখী, আমারে জাগায়ো না

আমার সাধের পাখি
যারে নয়নে নয়নে রাখি
তারি স্বপনে রয়েছি ভোর
আমার স্বপন ভাঙায়ো না ॥

'সে মেয়েটিকে আমি ভুলিনি, বা তার সে আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনোদিন।' রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে বলছেন দিলীপকুমার রায়কে : 'আমার জীবনে তার পরে নানা অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা গৌরব করে বলতে পারি, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি,—তা সে ভালোবাসা যে রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের ভালোবাসাই আমাদের মনের বনের কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়, সে ফুল হয়তো পরে ঝরে পড়ে, কিন্তু তার গন্ধ মিলিয়ে যায় না।'

প্রত্যেক প্রেমই ঈশ্বরের উপহার। প্রত্যেক প্রেমই প্রথম প্রেম।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

আমেদাবাদে থাকতেই তো রবীন্দ্রনাথ লিখল, 'বিয়াত্রিচে ও দান্তে,' 'পিত্রার্কা ও লরা' আর 'গেটে ও তার প্রণয়িনীগণ।' দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম একনিষ্ঠ আর গেটের প্রেম বহু বল্লভাক্রান্ত। কিন্তু প্রেম—সে যেমনই হোক—সর্বদা ও সর্বত্র এক চিরন্তনের প্রদীপে নিত্যনূতনের ক্ষণদ্যুতি।

গেটে সম্বন্ধে এই মর্মে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই সতেরো বছর বয়সে : 'পনেরো বছর বয়স থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালোবেসে এসেছে গেটে। তার প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তার আশা পূর্ণ হলেই সে আর সেখানে থাকতে চায় না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হলে যেমন আরেক দ্বারে যায় তেমনি আশা পূর্ণ হলেও যায়। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য দুইই সমান। গেটের প্রেম পার্থিব ও বাস্তব, তাই গেটে তার প্রেমের আখ্যান নিয়ে নাটক লেখে, দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম আদর্শ ও অতীন্দ্রিয়, তাই তাদের উপজীব্য কবিতা। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ আর আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাস-ভূমি।'

কিন্তু কবিতা বা নাটক দুইই বীণাবাদিনীর শ্বেত-কমলের পাপড়ি। সব ভালোবাসাতেই সেই এক অধরা মাধুরীর স্পর্শ। সেই স্পর্শ কি বাহুবন্ধনে ধরা

পড়ে না কি ছন্দের স্পন্দনে বন্দী হতে জানে? সে শুধু ডাক দিয়ে যায়, সে শুধু সারা দিনমান উন্মনা করে রাখে। রাতে ঘুমুতে দেয় না। ঘুম এলেও ঘুমের ঘন গহন হতে উঠে আসে স্বপ্নের মত।

সাধ্য কী তাকে ভুলিয়ে রাখ, সরিয়ে রাখ? সারাক্ষণই তার বাঁশি বেজে চলেছে।

ভালোবাসি, ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে
জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।
সেই সুর বাজে মনে অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী
ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি॥

সেই মারাঠি ষোডশীকে রবীন্দ্রনাথ ভোলেনি, ক্ষণকালের দীপে সেই চিরকালের শিখা। তাকে ভোলা যায় না, কাউকেই ভোলা যায় না—সে সব চঞ্চলের মালার মণি নক্ষত্রকণিকা হয়ে অক্ষয় হয়ে আছে আকাশে। সব যে ঈশ্বরের স্বাক্ষর।

খোলো খোলো হে আকাশ
স্তব্ধ তব নীল যবনিকা
খুঁজিব তারার মাঝে
চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি
যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো
যেথা হতে নামে পৃথ্বী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন যুথিকা।
যেথা হতে পরে ঝড
বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা॥'

সতেরো বছর পাঁচ মাস, রবীন্দ্রনাথ চলল ইউরোপ। মেজদাদার সঙ্গে। সেই প্রথম নিবিড় সমুদ্র-সঙ্গ। তার বারো বছর পর আরো একবার।

তীরে বসে সমুদ্রকে দেখা এক আর সমুদ্রের পরিবৃতির মধ্যে এসে সমুদ্রকে দেখা আরেক। কল্পনার সমুদ্র যেন বেশি বড়ো, দুষ্পারতরো। যদি এই

দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি—পারে বসে আগে-আগে রবীন্দ্রনাথের মনে হত—যেন আরেক অকূল সমুদ্র উন্মোচিত হবে। দিগন্তের পারেও যে আরেক দিগন্ত আছে এ কথা কে বলবে। এখন জাহাজে চড়ে সমুদ্রের মাঝখানে এসে মনে হল সমুদ্র নিতান্ত মুষ্টিমেয়, একটিমাত্র দিগন্ত দিয়ে ধরা। এক আঁচড়ে টেনে দেওয়া একটুখানি একটা ছবি।

যে সমুদ্র সেদিন হাতছানি দিয়ে ডাকল প্রথম রবীন্দ্রনাথকে সে সমুদ্রের বাসা মনশ্চিত্রে, মানচিত্রে নয়।

সমুদ্রের সমস্ত উত্তালতার অন্তরালে যে একটি অতলস্পর্শ সুগম্ভীর মৌন আছে সেটি সেদিন নাড়া দিল রবীন্দ্রনাথকে। অনন্তকাল অবিশ্রাম যে চাঞ্চল্য চলেছে, যে তরঙ্গ-উদ্বেলতা, সমুদ্র যেন তারই প্রশান্ত পরিণাম, প্রগাঢ় বিরতি। নির্বাণই যে পরম সুখ, সমুদ্র যেন তারই উচ্চারণ। উপরে আকাশের নীল নীরব নির্নিমেষ নেত্রপাত আর নিচে সমুদ্রের অতলস্পর্শ স্নেহদৃষ্টি। ব্যাপ্তির সঙ্গে গভীরতার রাখীবন্ধন।

তারপরে সন্ধ্যা এল জ্যোৎস্নাময়ী। মনে হল রাত্রি যেন রাত্রি নয়, অলৌকিক বৃন্তে একটি রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে। শান্ত, শুভ্র, সুহসিত। এ সব কার রচনা! এত শোভা এত সুখ—হৃদয়ে এত মহত্ত্বের অনুভব—এত অকথিত ব্যথা। কোথায় এর আরম্ভ, কোথায় বা সমাপ্তি। একটি অব্যক্ত জিজ্ঞাসা যেন জেগে আছে দূর থেকে সুদূরে, পার থেকে অপারে, লোকে-লোকান্তরে।

'আকাশ পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত, তাই সূর্যালোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত, তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করে তৃণদল সমীরণে কম্পিত হচ্ছে; তিনি আনন্দিত, তাই গ্রহ-নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহ-তারকার সহিত, লোক-লোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁর আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।'

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

আরোহী খৃস্টানেরা উপাসনা করছে নিচের ডকে। মামুলি রোববারের সকাল। মুখস্থ করা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে সকলে, সন্দেহ নেই, কল-টেপা অভ্যেস, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করল অগোচরে, অকূল অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কতকগুলো মানুষ কোন এক মহা-অজানার অভিমুখে তাদের প্রণতি পাঠাচ্ছে, তাদের প্রতীতি, তাদের শরণাগতি, স্থিরনম্র সর্বস্বীকারের সমর্পণের ভঙ্গি। তুমি কত বড় আর আমরা কত অকিঞ্চিৎ। তবু আমরা কত কাছাকাছি। তুমি শোনো এই হৃদয়সমুদ্রের শঙখনাদ। তুমি অজানা এ কে না জানে, তবু এই-টুকু জানি, তুমি আমার আপনজন।

'তুমি আমার আপন
তুমি আছ আমার কাছে
এই কথাটি বলতে দাও হে
বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের
সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে
বলতে দাও।'

মাটির প্রতি মানুষের মমতার বিস্তার দেখছে চারদিকে। পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীর ঘেঁসে-ঘেঁসে। আর সেই মমতার বিনিময়ে প্রকৃতি মানুষকে দিচ্ছে তার অন্তরের মাধুরী, ফল শস্য শ্যামলতা। ভালোবাসার উত্তরে দ্বিগুণতরো ভালোবাসা। কী ফল ফলাতে পারে মানুষের প্রেম, মানুষের ক্ষমতা, তারই জয়ধ্বনি পুষ্পে পুষ্পে লেখা হয়ে আছে। কে সে অদৃশ্য শক্তি যে অল্পের বিনিময়ে দিতে পারে অপরিমেয়, তুচ্ছের প্রতিদানে আনতে পারে অনুপমকে, অসামান্যকে।

যদি মাটি খুঁড়ে এত পাওয়া যায়, দেখা যাক না এই মানব-জমি আবাদ করে। যদি অরণ্যের আগাছা উপড়ে ফেলে মিলতে পারে এত প্রাচুর্য, একবার এই অন্তর গহনকে নিষ্কণ্টক করে দেখি না। দেখি না নিরাময় করে, নিরাপদ করে।

বিরলে বসে কখনো কি আম্মা তড়খড়ের কথা মনে পড়ে? একটি অকারণ বেদনার ছায়া কি কোনো ক্ষুদ্র ক্ষণকালও মায়াময় করে তোলে?

তাকে কি ভোলা যায়? কালের অঙ্গুলি হতে ভ্রষ্ট সেই অব্যক্ত মাধুরী

মনের বাতাস স্তরে স্তরে রসে ভরে রেখেছে।

অনভিজ্ঞ নব কৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্প মুকুটিত।

সেই সঙ্গে, সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, ঊর্ধ্বশিরে, দেখা যায় না কি তার জীবনের শুকতারা, সুখতারাকে? সেই তো তার সমস্ত পথেব প্রদীপ, তার অনির্বাণ ঈশ্বরদীধিতি।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আব কভু হব নাকো পথহারা॥

প্যারিসে একটা ছোটখাট একসিবিসন দেখতে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ। বিখ্যাত চিত্রকবের আঁকা একটি বসনহীনা মানবীর ছবি তার চোখে পড়ল। বিকার-লেশশূন্য বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

অমরসুন্দর মানবাত্মাব মন্দিরই তো শরীর, ঈশ্বরের অসীম সুন্দব সৃষ্টি—সেই ক্ষণে স্পষ্ট অনুভব করল রবীন্দ্রনাথ। মর্তের চরম সৌন্দর্যের পবিত্রতম পুষ্পোচ্ছ্বাস। এ কি শুধু দেহ, এ আত্মার দীপাধার। আত্মা যদি সুব হয় দেহ হচ্ছে বাঁশরি। যিনি কানন কান্তার শৈল সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি কবেছেন সূর্য চন্দ্র, লক্ষলহর নক্ষত্রের রত্নহার, ফুল পাখি লতা প[illegible] এ তো তাঁরই রচনা। সুন্দর শরীরের চেয়ে বড সৌন্দয আর কী আছে! দেহের এই যে লাবণ্য আর কোমলতা, এই যে নির্মাণনৈপুণ্য—এ যেন সেই বিশ্বকর্মার সযত্ন আঙুলের সত্যস্পর্শ। যেন এ দেহ ছুঁলেই, এ দেহ যাঁর জীবন্ত প্রতীক, সেই ঈশ্বরকেই ছোঁয়া হবে। ঈশ্বরেরই ভালোবাসা যদি কোথাও উদ্ভাসিত হয় তবে এই দেহে। আদ্য-অন্ত এই শরীরে, বাইরে কোথাও নেই।

কী আশ্চর্য, উলঙ্গ নারীচিত্র দেখে ঈশ্বরকে স্মরণ করল। শুধু স্মরণ নয় যেন সাক্ষাৎকার হল ঈশ্বরের সঙ্গে। দেহের স্ফটিক-বাতায়ন থেকে সেই সাক্ষাৎকার। 'লাজহীনা পবিত্রতা, শুভ্র বিবসনে,' তুমিই জ্যোতিপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন একটি স্তবপুঞ্জ।

সকলি ফেলিয়া দূরে
ভোগের অতীত মূল সুরে

নগ্নতা করেছে শুচি
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভরুচি।
পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ॥

এই যে আমার দেহ এই তো সেই মহাস্রষ্টার উদ্দেশে অভিনন্দন। এই সোনার ঘটেই তো তার অভিষেক। সমুচ্ছ্বসিত এই দেহের বৃন্তেই তো পূজার পুষ্পবিকাশ। সানন্দ সূর্যোদয়।

তার অন্ত নাই গো নাই যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ—
ও তার অন্ত নাই গো নাই
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল—
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥

আমাদের আর কী আছে? অন্তত এই দেহ আছে। এই দেহ শুধু মেদ মাংস মজ্জা-নিকেতনই নয়, এ দেহ অস্তিত্বের আনন্দবাহী এক অনন্ত চেতনার জ্যোতিঃশিখা—যার 'অঙ্গে অঙ্গে চৈতন্যের প্রকাশের পালা'—সেই দেহকেই ঈশ্বরের মহামন্দিরে একটি প্রদীপ করে রেখে যাব আর তার আলো ছড়িয়ে দেব দিকে-দিগন্তরে।

দীপশিখা থাকে একঠাঁই,
দীপালোক যায় বহু দূরে।'

বিলেত গিয়ে কী লাভ হল রবীন্দ্রনাথের? মেজদাদার যা অভিলাষ ছিল, ব্যারিস্টার হওয়া বা বিকল্পে কোনো ডিগ্রি নিয়ে আসা—তার কিছুই হল না। শুধু লোকেন পালিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল—'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে, আনে সে প্রাণের অপূর্বতা'—আর পেল দুটি ইংরেজ তরুণীর ভালোবাসা।

যেখানে যা ভালোবাসা সব সেই অনির্বচনীয়ের স্পর্শ। অপরিমেয়ের প্রসাদ। একমাত্র ভালোবাসাই বোঝায় যে বেগবান প্রাণ অবসন্ন হতে জানে না, জীবনকে পরম পবিত্র গৌরব বলে বহন করতে শেখায়। ভালোবাসাই তো ঈশ্বরের মর্মোচ্ছ্বসিত অমৃতধারা। সে কখনোই দেউলে নয় যার সব ধন গিয়েও ভালোবাসা আছে। হে রুদ্র, তুমিই ভালোবাসার কাছে সুদক্ষিণ।

মেয়ে দুটি সহোদর বোন, মেজ আর সেজ, মনে হয় এই সেজটিই মিস কে, যে রবীন্দ্রনাথকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছে। যার সঙ্গে বই পড়তে-পড়তে এক-একদিন রাত প্রায় বারোটা হয়ে যায়। যে বাংলা শেখবার জন্যে আগ্রহশীল। কিন্তু সবই দু'দিনের খেলা, সব ক্ষণিকের আয়োজন। 'ক্ষণিকের খেলা সহে, চির দিবসের পাশ বহিতে পারে না।'

এই মেয়েটিকে নিয়েই সন্ধ্যা সঙ্গীতের 'দুদিন' লেখা।

রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া, নির্ঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্রধনু নিরমিয়া খেলিলাম কত
ডুবে গেনু জোছনায় আঁধার পাথার গায়
বসালেম তারা শত শত।
ফুরালো দু দিন—
সহসা আরেক দিকে বহিল পবন
দুদিনের খেলাধুলা ফুরালো আমার
আবার আরেক দিকে চলিনু আবার।

ক্ষণিকাকে নিয়ে অসীমের এই খেলা চলেছে নিত্যকাল। 'হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে, আনন্দ কল্লোলাকুল নিখিলের সনে।' এ খেলায় হার-জিত সমান, কেন না এ যে বিধাতার খেলা।

'বারে-বারে খেলা শেষ হয়, কিন্তু হে আমার জীবন খেলার সাথি, তোমার তো শেষ হয় না। ধূলার ঘর ধূলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যে তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ, সেই তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে, খেলার শেষেও তেমনি আছ। আমার কোনো খেলাই হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে। দেখতে পাচ্ছি ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নতুন আয়োজন করছ, সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করছি।'

হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নতুনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো।

নূতন আর কী। অপূর্বের পোশাকপরা সেই এক চির-পুরাতন। পুরাতনের শুক্তির মধ্যেই নূতনের মুক্তো। পুরাতন বসুন্ধরার স্নেহাঞ্চলেই নূতনের শস্যসম্ভার।

'নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন।' শত শত তারা নিত্য নতুন কিন্তু ধ্রুবতারাটিই পুরাতন। সেইটিই চিরজনমের পরিচিত। 'চির জনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে।' যা চিরন্তন তাই নিরন্ত নবীন।

'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে। মিলাব তাই জীবন গানে।' তোমারই মূল সুরের সঙ্গে জীবনের প্রতিটি ছন্দ মিলিয়ে নেব। তুমি কে? তুমিই আমার প্রাণের গভীর গোপন মহা-আপন। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'

'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র উৎসর্গ পত্রে একটি গান গেঁথে দিল রবীন্দ্রনাথ। 'ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে, আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।' উৎসর্গ একটি অনামধেয়া শ্রীমতীকে।

আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এই তো সেই 'ভগ্ন-হৃদয়ের' ধ্রুবতারা। তোমাকেই আমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা করেছি আর আমি সংসার-সমুদ্রে পথহারা হব না। সে গানটিই রূপান্তরিত হল ব্রহ্মসঙ্গীতে, দুটি ছত্রের সামান্য রকমফেরে। উপরের ছত্র দুটি বদলে দাঁড়াল :

'তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে।
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূলকিনারা।'

আগের দু ছত্রও সত্য শেষের দুছত্রও। শুধু দেবীকে ভাবদেহিনী করা হল। যা ছিল ভালোবাসা তাই হল ভগবান। আগে তোমাকে সর্বদা দেখি, এখন তোমাকে একমুহূর্ত না দেখলে পাগল হয়ে যাই। সর্বত্রই তুমি, তোমার মুখ। যে মুখে ভালোবাসার আলো সেই মুখেই অমিতসুন্দর ঈশ্বরের আভা।

হে সুন্দরী, অবাধ-প্রসারিণী, তুমিই অনন্তের বাণী, তুমিই মৃত্যুহীন আনন্দের লিপিকা।

॥ পাঁচ ॥

প্রায় দেড় বছর বিলেতে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরল। তার বাংলা দেশে, তার কলকাতায়, তার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

আমেদাবাদ আর বম্বে মিলিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে তার প্রায় দু' বছরের অনুপস্থিতি।

'সেই ছাদ সেই চাঁদ সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব—এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।'

কী মধুরমদির এই নাগপাশ। এই নাগপাশ ছিল বলেই তো এর থেকে মুক্তির প্রয়াসও মধুরতর।

'আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।'

তিন চেতনা। মানবিক, জাগতিক আধ্যাত্মিক। চেতনা থেকে চেতনান্তরে উদ্ভাসন। মানবিক থেকে জাগতিকে, আর তারই পরিণামে আধ্যাত্মিকে সম্প্রসার। আর, কে না জানে, ক্ষুৎপিপাসার মত ঈশ্বরপিপাসাও স্বাভাবিক।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে মানুষের যে একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে তার ক্ষুধাও অন্তরতর, খাদ্যও অন্তরতর, তৃপ্তিও অন্তরতর।

এই সত্তাতেই তো মানুষ অমিতজীবী।

শুধু শারীর অস্তিত্ব নয়, আন্তর অস্তিত্ব। বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত। সেই গভীর সত্তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তার সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।'

'হে গুহাহিত', প্রার্থনা করছেন, 'আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু, প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের

গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোট করে না দেখি। তোমাদের এই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্যসঙ্গীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।'

প্রথমে মানুষ। 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' 'হৃদয় আমার ক্রন্দন করে মানব-হৃদয়ে মিশিতে।'

'চলো দিবালোকে চলো লোকালয়ে
চলো জনকোলাহলে
মিশাব হৃদয় মানব-হৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।"

মানুষের প্রধান লক্ষণ মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি। আর অনুভূ হয়েই মানুষ বড হয়ে ওঠে, প্রভু হয়ে নয়।

তারপরে জগৎ। 'মহাকাশভরা এ অসীম জগৎ-জনতা।'

'দুর্লভ এ-ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।"

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে—সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মত, যুবা পড়ছে কাব্যের মত এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত।'

তারপর রূপনারানের কূলে সহসা জেগে ওঠা:

'রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—'

জগৎ যদি স্বপ্ন হয় মায়া হয় তাহলেও ক্ষতি নেই, তাহলেও সে আত্মীয়, অন্তরের ধন। মায়াও তো ঈশ্বরেরই ছায়া ঈশ্বরেরই রচনা। যদি ঈশ্বর সত্য, তবে তার ছায়াও সত্য।

বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন করো।

অবশেষে আধ্যাত্মিকে উত্তরণ।

আধ্যাত্মিকতাই মানুষকে পরম পশ্যন্তী দৃষ্টি দেয়, দেয় চিরন্তন আনন্দ-দর্শন। জীবনে এই আনন্দই তো অমোঘতম বীর্য। নিশ্ছিদ্র ভয়হীনতা।

'আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য, আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।'

আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি।

যে আনন্দময় অমৃত রূপে সকলের মধ্যে প্রকাশমান সেই আনন্দে, সেই অমৃতে প্রবেশ করার ক্ষমতার নামই আধ্যাত্মিকতা।

সে আনন্দ সে অমৃত আমি ছাড়ি কেন? আমি কি অকিঞ্চিৎ?

ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তার চুরি করে আনি রঙ-রস
আনি তাঁর জাদুর পরশ।

কে সে? কী নাম তাঁর? রবীন্দ্রনাথ তাকে সম্ভাষণ করছেন,

ওহে মহা অন্ধকার ওহে মহাজ্যোতি
অপ্রকাশ চির স্বপ্রকাশ।

তাকে দেখেও দেখি না, জেনেও খোঁজ নিই না, ধাক্কা খেলেও থমকে দাঁড়াই না, পাশ কাটিয়ে চলে যাই। আমাদের কেন এই উপেক্ষা? তার একটিমাত্র কারণ, আমাদের প্রাণে প্রেম জাগেনি। যদি একবার ভালোবাসায় জেগে উঠতে পারতাম তাহলে প্রেমের আলোকে বিশ্বভুবন সন্দীপিত হয়ে উঠত।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে।

'ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয়, কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমনভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী?' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এর কারণ তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি। সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী না থাকলেই বা কী! তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এই জন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাইনে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোষাতে পারে না। সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগৎপতি হে—'

সেই ছাদ সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস।

আজকাল আর ছাদে কে ওঠে! 'তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ ঘটেছে একথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দৌড় দিয়েছে।' কিন্তু ছাদের উপরেই তো কল্পনার রাজ্য। আরেকটু উপরেই তো অজানার রহস্যপুরী। আর এই অজানার সঙ্গে মিলনের জন্যেই তো জীবনধারণ।

> স্তিমিত নক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে
> এই তব শেষ অভিসারে
> ধরণীর পারে
> মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
> অন্তহীন রাতে।

আর চাঁদ! 'চাঁদের চোখে জাগে নেশা, তার আলো গানে-গন্ধে মেশা।' চাঁদ বুঝি দিক ভোলাবার পাগল। 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে। দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।' আর দখিন হাওয়ার একটুখানি ছোঁয়াতেই ব্যাকুল বেণুতে কাঁপন ধরে। আর কখনো কখনো তো দখিন হাওয়াই আগুন-জ্বালা।

তারপর নিজের মনের বিজন স্বপ্ন। 'আমার যৌবন স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।' 'দুগ্ধফেন শয়ন করি আলা স্বপ্ন দেখে ঘুমায় রাজবালা।'

ভালোবাসা এসেছিল
এখন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে।
বিদায় সে নিল যবে
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন
নিশীথে বিলীন
দূর পথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা ॥

চারদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন টেনে রাখছে। বন্ধন আর কী, যেখানে যার স্থান নয় সেখানেই তার বন্ধন, কিন্তু সংসারে সব কিছু বাঁধা পড়লেও আনন্দ কখনো বাঁধা পড়ে না। আর আনন্দই তো আনন্দময়ের উপাসনা।

সময় বুঝি আর কাটে না। সুদীর্ঘ অবসরে এখন শুধু কর্মহীন কল্পনা। কাজ তো অকাজের বোঝা, আর কল্পনা ছাড়া সৃষ্টি কই। 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' কিন্তু দুরাশা নিষ্ফল কেন? নিষ্ফল, কেন না দুরাশাই নির্লজ্জ। 'আকার-প্রকার-হীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা।'

সব আশা মিটাইতে পারিস না হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?

তারই জন্যে কি এই নিগূঢ় বেদনা? কিসের এ বেদনা, কাকে পাবার জন্যে, তা কে বলবে? কে সে যে এমনি করে অহনিশ কাঁদিয়ে বেড়ায়? তার নাম কী?

এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে
ভুবন ভরে আছে যেন পাইনে জীবনে ভরে।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মানময়ী' নামে এক গীতনাট্য লিখেছেন। এখন সেটার অভিনয় করা হবে। 'তুই, রবি তুই মদনের পার্ট করবি।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্র সাজবেন আর কাদম্বরী উর্বশী।

নাটকের শেষে একটি গান জুড়তে হবে। সে গান রচনার ভার পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথ গান লিখল:

আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান—

'ভগ্ন হৃদয়' বিলেতে থাকতেই আরম্ভ করেছিল লিখতে। দেশে ফিরে এসে

সেটা শেষ হল। আর যখন বই হয়ে বেরুল তখন দেখা গেল জনৈকা শ্রীমতী হে-কে বই উৎসর্গ করা হয়েছে।

হে কে? হে হেমাঙ্গিনীর আদ্যাক্ষর। হেমাঙ্গিনী কে? 'অলীকবাবু'র হেমাঙ্গিনী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'অলীকবাবু' অভিনীত হল ঠাকুরবাড়িতে। অলীক-বাবুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আর তার প্রণয়িনী হেমাঙ্গিণীর ভূমিকায় কাদম্বরী, নতুন বৌঠান। হাস্যে লাস্যে প্রহর্ষিণী, সকলগুণবিচিত্রা গীতান্বিতা। যে চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়েও সুদূর সুরদেশিনী।

যে তার ঈশ্বরের ঠিকানা। 'হায়রে ওরে যায় না জানা, নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায় পায় না ঠিকানা।'

একেলা যেতাম যে-প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা॥

যে অভ্রান্ত অভিভাবকত্বে রবীন্দ্রনাথকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, বিপথে পা ফেলতে দেয়নি। যাকে বলা যায়, 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।'

'কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ-হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আমি এ ভগ্ন-হৃদয় আনি।
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।"

প্রথম যাত্রা সাংসারিক অর্থে নিষ্ফল হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথের আবার বিলেত যাওয়ার কথা উঠল। শুধু কাব্যলেখা বা নাটক করা চলবে না। তাকে ব্যারিস্টার হতেই হবে। এবার তার সঙ্গে চলল ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ। কিন্তু মাদ্রাজে পৌঁছেই সত্যপ্রসাদের মন ফিরল। সত্যপ্রসাদ সদ্য বিয়ে করেছে, বউয়ের জন্যেই তার পিছটান। সত্যপ্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ফিরল। তাদের আরেক সঙ্গী ছিল আশুতোষ চৌধুরী। কই, সে ফিরল না। তাকে সঙ্গে করেও তো যেতে পারত রবীন্দ্রনাথ। সে ফিরল কেন? তার কিসের পিছটান।'

'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া।'

ফিরে এসে মামা-ভাগ্নে দুজনে গেল মুসৌরিতে, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কত না জানি তিনি পীড়িত হবেন, তিরস্কার করবেন। কিন্তু, না,

তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না, ভাবলেন ঈশ্বর যা করেছেন ভালোর জন্যেই করেছেন। সকল কর্ম ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাতেই সম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যারিস্টার না হওয়া কত বড় মঙ্গল।

পিতৃদেব সম্বন্ধে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তাঁর প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার আধুনিকপন্থী অগ্রজেরা অনেক বিরুদ্ধতা করেছেন, তিনি কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করেন নি। আমার মধ্যেও অনেক কিছু ছিল, অনেক মতবাদ, যার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি, তবু তিনি শাসন করে তাঁর অনুবর্তী হতে কখনও আজ্ঞা করেন নি। তিনি জানতেন যে, সত্য শাসনের অনুগত নয়, তাকে পাওয়ার হলে পাওয়া যায় নইলে যায়ই না।'

ভগ্ন-হৃদয়ের উৎসর্গে শ্রীমতী হে-র উদ্দেশে নতুন একটি উপহার-কবিতা রচনা করল রবীন্দ্রনাথ।

হৃদয়ের বনে শত-শত সূর্যমুখী ফুটেছে, ফুটেছে তোমারই মুখ চেয়ে। বেঁচে থাক, বা শুকিয়ে থাক, ঐ মুখের দিকেই তারা তাকিয়ে থাকতে চায়। বেলা অবসান হবে। ওরাও চোখ মুছবে, ঐ মুখ চেয়েই যেন ঝরে যায় নীরবে। তোমার জীবনসমুদ্রে আমার জীবন তটিনীকে মিশিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যার বাতাসেই হোক বা উদ্দাম ঝটিকায়ই হোক যত ঢেউ উঠবে, কেউ জানবে না, তোমার চরণে গিয়েই বিরাম পাবে। তুমি জানো না, আমাকে এক নিয়মের পথ ধরে তুমি নিয়ে চলেছ। দূরেই যাই বা কাছেই আসি, সেই অটল আকর্ষণে আমি পথভ্রষ্ট হই না। নইলে কবে অনন্ত আকাশে ছিন্ন ধূমকেতুর মত দিশাহারা হয়ে যেতাম।

দেবী, সাগরের পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ। দিন ফুরোলে সেদেশে যেতে হবে একদিন। এপারে আমার সূর্য-চন্দ্র পড়ে থাকবে, পড়ে থাকবে গীত-গান, পড়ে থাকবে সুখ-শান্তি। স্নেহের অরুণালোকে এই শেষ গান যা গেয়ে গেলাম তা তোমার মনের ছায়ায় একটু আশ্রয় দিও, দিও তাকে একবিন্দু চোখের জল। আর কি আমাদের দেখা হবে?

এখানে মানস-অভিসারে রসলোকের পর রসলোকের উদ্‌ঘাটন। এ যে নিরন্তর অধ্যাত্মপ্রেরণা। এ-প্রেরণায় চরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু নেই। এ যে চিরন্তন না-পাওয়া। কিংবা যত পান তত পিপাসা।

কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা

অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে।

কিন্তু নদী যতক্ষণ না সমুদ্রে মিশে সমুদ্রায়িত হচ্ছে ততক্ষণ তার ব্যাকুলতা, তার অতৃপ্তিকে কে উল্লঙ্ঘন করবে? নদীর উদ্বেলতা যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর সমুদ্রের প্রশান্তি। আর, সুন্দর বলে দুইই সত্য। নীলোর্ধ্ব আকাশ যেমন সত্য তেমনি সত্য শ্যামল তৃণনীড়। সীমার বাতায়ন দিয়ে দেখা অসীম কী মহান আবার অসীমের আঙিনায় দাঁড়িয়ে দেখা সীমা কী অপরূপ!

অথবা শিথিল কলেবরে
এস তুমি, বসো মোর পাশে।
মরণ যেমন করে আসে
শিশির যেমন করে ঝরে
পশ্চিমের আঁধার সাগরে
তারাটি যেমন করে যায়।

যদি সত্যি তুমি তেমনি করে আসো, বসো আমার পাশটিতে, তখন তোমাকে কি আর তোমার মধ্যে খুঁজে পাব? তোমার কথা-হারা-চকিত চোখের আকাশে তখন পাব নাকি আরেক কথাভরা নতুন আকাশের ঠিকানা?

এল অসহ্য ভালোবাসার দুর্দান্ত আনন্দ। শিরার শৃঙ্খলছেঁড়া ক্রন্দন-ঝঙ্কার। 'ভালোবাসা স্বাধীন মহান, ভালোবাসা পর্বত-সমান।' সূর্য যেমন পৃথিবীকে ভালোবাসে। উজ্জ্বল করবার জন্যে ভালোবাসে, উর্বর করবার জন্যে ভালোবাসে। আমিও তেমনি ভালোবাসি। 'গান আসে বলে গান গাই, ভালোবাসি বলে ভালোবাসি।'

প্রবৃত্তিই গতি। এই প্রবৃত্তিই নদীকে টেনে নিয়ে চলেছে দীর্ঘ মরুপথ দিয়ে, টেনে নিয়ে চলেছে পরমনিবৃত্তি সমুদ্রের দিকে। সসীম প্রেম নিয়ে চলেছে পরমপ্রেমের সন্নিধানে।

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে নমি নমি॥
নমি নমি তোমারে হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত
লুপ্তি সুপ্তি বিস্মৃতি হে নমি নমি॥"

রবীন্দ্রনাথের বয়েস একুশ, এল চন্দননগরে। সেখানে গঙ্গার পারে মোরান

সাহেবের বাগানবাড়িতে রয়েছেন জ্যোতিদাদা আর নতুন বৌঠান।

গঙ্গা, গান, সন্ধ্যা, সূর্যাস্ত, জ্যোৎস্না, জলে-স্থলে শুভ্র শান্তি—এই তো কবিতার পরিপূর্ণ পরিবেশ। নদীর মতো আছে কী, নদীই তো চৈতন্যস্বরূপিণী। 'যে নদী বিশ্বের দূতী, দূরকে নিকটে আনে।' হোক সে তটবদ্ধ, তবু তার মধ্যে বেজে চলেছে কলধ্বনি, আত্মপ্রকাশের প্রাণমর্মর। বন্ধনের মধ্য দিয়ে বেগে প্রবাহিত হচ্ছে বলেই তার সৌন্দর্যের এমন অনিবার্যতা।

'নদী যখন চলতে থাকে, 'বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসঙ্গীত বাজে, আমাদের জীবন তেমনি প্রতিক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক, যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃতবাণীটি সঙ্গীতের মতো বাজতে থাকে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'

কখনো গঙ্গা, কখনো পদ্মা। 'নদীর পালিত এই জীবন আমার।' একদিকে গঙ্গা, প্রাণপ্রদা—'তুমি যে প্রাণের ছবি, হে জাহ্নবী'; আরেকদিকে পদ্মা, বিনাশহাসিনী, 'ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী, শাণিত অসির মতো ভীষণ প্রখরা।'

এইখানে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ঘর বাঁধল।

'অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"

ঘনঘোর বর্ষা নামে কখনো, দিন-কালো-করা বর্ষা, রবীন্দ্রনাথ একটা হার্মোনিয়ম নিয়ে মনের মতো স্বর বসিয়ে গান ধরে! 'সখি, আমার দুখের নাহিক ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' বর্ষণমুখর মধ্যাহ্ন শুধু তাই গানের খ্যাপামিতে কেটে যায়। কখনো বা সূর্যাস্তের সময় নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সকলে। রবীন্দ্রনাথ গান ধরে, সঙ্গে বেহালা বাজায় জ্যোতিরিন্দ্র। পূরবী থেকে বেহাগে এসে পৌঁছোয় সে গীতস্বর। সূর্যাস্তের শেষ সোনাটুকুও মুছে দিয়ে পূব বনান্তের পারে চাঁদকে কে তুলে ধরে। একটি ক্ষণিক সমারোহের পরে আরেকটি ক্ষণিক জাগরণ। ক্ষণে ক্ষণে শুধু এক অনন্তের উঁকিঝুঁকি।

'কী জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দ্বীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী।'

তারপর বাগানের ঘাটে ফিরে এসে নদীতীরের ছাদের উপর সবাই বিছানা করে চুপচাপ বসে থাকে। কী অপরূপ স্তব্ধতা, কী সুগভীর শান্তি, কী সুমহান নিঃসঙ্গতা। নদীতে নৌকো প্রায় নেই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে ঘনায়িত, শুধু নিস্তরঙ্গ নদীর ধারার উপর আলো ঝিকঝিক করছে। আর চারিদিকে এই যে অমৃতক্ষরণ, এ তো আকাশেরই গান। 'আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও, নয় খাঁচাটার থেকে।'

এ গান শান্তির গান, বিপুল বিরামের।

'সংসারের ক্ষুদ্রতার স্তব্ধ উর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি।'

চন্দননগরেই রবীন্দ্রনাথ তার 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনা করল। এই প্রথম জীবন ও জগৎকে দুই চোখ মেলে হৃদয় ভরে দেখবার চেষ্টা। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের মিলনের সেতু বুঝি এখনো তৈরি হয়নি, হৃদয়ের নিঃসঙ্গ অনুভূতির সঙ্গে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটেনি সামঞ্জস্য। সেই অবরুদ্ধ আবেগের থেকেই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' জন্ম। হে দারুণতম দুঃখ, তুমি এবার আবির্ভূত হও, দুয়ের মাঝখানের অভিশপ্ত যবনিকা সরিয়ে ফেল। মর্মলোকের সঙ্গে বিশ্বলোকের ব্যবধান ঘোচাও।

'হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলি নে তুই
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
তোর শুধু ওই তান।'

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখবিনে? চোখ মেলবিনে আকাশের দিকে?

কিন্তু হৃদয়কে নিরুদ্ধ করে তো জগৎকে দেখা নয়। আর জগৎকে বাদ দিয়ে শুধু হৃদয়চর্চাও তো আশ্রম-কারাযন্ত্রণা।

ব্যক্তিতে ও বিশ্বে, জীবনে ও জগতে কোথায় সামঞ্জস্য? এবং কী করে?

রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ে কমলার বিয়ে হচ্ছে প্রমথনাথ বসুর সঙ্গে। বিবাহ-সভার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ এসে পড়ল। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিলেন, বললেন, 'এ মালা এঁর প্রাপ্য।" পরে রমেশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়েছ?'

রমেশ দত্ত বললেন, 'না।'

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'পড়ে দেখো।' প্রশংসায় পুরস্কৃত করলেন রবীন্দ্রনাথকে।

ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে
করি পরিতোষ কোন উপহারে
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দু নয়ন কবি তারে বলে,
কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি॥'

॥ ছয় ॥

'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন স্বচক্ষে ?' একটি লোক প্রায়ই জিজ্ঞেস করে রবীন্দ্রনাথকে।

এ রকম একটা প্রশ্নও হয় নাকি ?

কী রকম অদ্ভুত, নির্বোধের মতন দেখতে। তার মুখের দিকে তাকায় রবীন্দ্রনাথ। সাফ জবাব দেয়, 'না, দেখিনি।'

'আমি দেখেছি।'

'তাই নাকি ?' বিদ্রূপের হাসি হাসে রবীন্দ্রনাথ, 'কোথায় ?'

'এই যে চোখের সামনে। চারদিকে বিজ বিজ করছে। দেখতে পাচ্ছেন না ?' লোকটি চারদিকে তাকায়। হাত দিয়ে দেখায় চারদিক।

পাগল ছাড়া আর কী। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখায় মন দেয়। পাগলের প্রলাপ শোনবার সময় নেই।

কিন্তু সেদিন সহসা সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সদর স্ট্রিটের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ কী দেখল রবীন্দ্রনাথ।

চোখের সমুখ থেকে যেন উঠে গেল যবনিকা। উড়ে গেল তুচ্ছতার আবরণ। সমস্ত কিছু যেন অনির্বাচ্য মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হল। এমনটি যেন কেউ ছিল না, যেন কাউকে কোনোদিন দেখায়নি। অথচ

এইটিই তার আসল সত্তা, তার স্বর্ণসত্তা। এত দিন চোখ দিয়ে দেখেছি বলেই কম করে দেখেছি, ভুল করে দেখেছি। আজ থেকে চৈতন্য দিয়ে দেখা সুরু হল। জাগল তৃতীয় নয়ন! আর এই তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখা, চৈতন্য দিয়ে দেখাই ঈশ্বরকে দেখা। জীবনদেবতাকে অভিনন্দন জানানো।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যতো মানুষ শত শত।
আসিছে প্রাণে মম হাসিছে গলাগলি।
পরাণ পুরে গেলো হরযে হলো ভোর
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।
প্রভাত হলো যেই কী জানি হলো এ কী
আকাশ পানে চাই, কী জানি কারে দেখি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে॥

'বৃক্ষতলে স্বর্ণমূর্তি।' ছ বছর আগে ন্যাশনাল মেলার মাঠে নবীন সেন দেখেছিলেন এক নবীন যুবককে। পরনে সাদা ঢিলে ইজের-চাপকান, একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। নবীন সেনের মনে হল কে যেন গাছের নিচে একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করে গেছে।

তুমি কে? সঙ্গের লোককে জিজ্ঞেস করলেন নবীন সেন।

রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র।

রবীন্দ্রনাথের ও চেহারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিল আছে। আনন্দে উদ্বেল হলেন নবীন সেন। কলেজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

পকেট থেকে নোটবই বার করে রবীন্দ্রনাথ কটি গান গাইল ও গীতকণ্ঠে পড়ল কটি কবিতা। নবীন সেন অভিভূত হয়ে গেলেন।

এ যে আশাতীত। এ যে অভাবনীয়। অলিখিত পাতায় এ কী প্রচ্ছন্নের চিত্রাঙ্কন!

বৃক্ষতলে স্বর্ণমূর্তি। মর্তের অমরাবতীতে সমস্ত মানুষই স্বর্ণমূর্তি।

রাস্তা দিয়ে মুটে-মজুর চলেছে, মনে হল এরা শুধুই মুটে-মজুর নয়। এরা ছদ্মবেশী। নিখিল সমুদ্রের উপর এরাও তরঙ্গলীলা। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু চলেছে হাসতে

হাসতে, এও এক মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আনন্দ-ছন্দ। একটা গরু আরেকটা গরুর পাশে দাঁড়িয়ে তার গা চাটছে এটার মধ্যেও অন্তহীন অপরিমেয়তার আস্বাদ। স্থূল আচ্ছাদন সরিয়ে ফেল, দূর করো এই দীনতার বেশবাস। উদ্ঘাটিত করো সেই নিহিত সত্তা, অব্যক্ত সত্তা, সেই স্বর্ণসত্তা। আর সেই সত্তাকে দেখাই সত্যকে দেখা।

রবীন্দ্রনাথের সেই সত্যদর্শন। সত্যদর্শনই ঈশ্বরদর্শন।

আর এই ঈশ্বরই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। ভাবে অর্থে ইঙ্গিতে জীবন-দেবতা বুঝি ঈশ্বরের চেয়েও অন্তরঙ্গ। ঈশ্বর ভাবলে মনে হয় যেন কোনো স্বতন্ত্র পুরুষ, 'মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক', 'অপ্রকাশ চির স্ব-প্রকাশ', কিন্তু জীবনদেবতা ভাবলে মনে হয় যেন সুখে-দুঃখে রসে-রঙ্গে মিলনে-বিচ্ছেদে এক অন্তরতম সুহৃদ। এক কথায় এই জীবনদেবতাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্বের সারথি।

গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার;
আজ লয়ে যাও মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে
নবতর বিজয়যাত্রায়।

বলেছেন, 'জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।'

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া।

জীবনদেবতা নানাভাবে নানাবর্ণে নানা মূর্তিতে জানান দেয়। সুপ্তিতে-জাগরণে আঘাতে-আনন্দে আলোকে-অন্ধকারে ভোগে-ত্যাগে বাসনায়-বৈরাগ্যে। জীবনদেবতা শুধু সন্নিহিত নয়, অনুস্যূত। জীবনদেবতাই নির্লক্ষ্য নিশ্বাসবায়ু।

'আরে এসো এসো।' সেই পাগলমতন লোকটিকে দেখে উছলে উঠল রবীন্দ্রনাথ।

লোকটি তো অবাক। যাকে দেখে চিরদিন আড়ষ্ট ও কুণ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, তার প্রতি এ কী উদার অভ্যর্থনা।

তোমাকে যে এতদিনে ঠিক-ঠিক চিনতে পেরেছি। চিনতে পেরেছি তোমার আসলকে। তোমার অতলকে। তোমার ভিতরের যে বস্তু মরে না

সেই অমৃতকে। দেখি তুমিও যে আমিও সে। কোনো অনৈক্য নেই বৈষম্য নেই। আমরা একজাত, আমরা আত্মীয়। আমরা অমৃতের সন্তান। আর সব মর্ত পরিচয় মিথ্যে, অবান্তর।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা বিরাট ওলোট-পালোট হয়ে গেল। গুহাগৃহে বন্দী ছিল যে জলকুণ্ডল তার আলস্য-স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রবিরশ্মিরেখা স্পর্শ করল তাকে, তার সীমার সংসার থেকে তাকে ডাক দিল বাইরে। তাকে গতি দিল স্রোত দিল দিল শাণিত ধারাবাহিকতা। ছুটে চলো, এগিয়ে চলো, জৈব অস্তিত্বের সংকীর্ণ কারাগার থেকে বেরিয়ে এস বিশ্বপ্লাবনে, বিশ্বানুভূতিতে প্রসারিত হও। মহাসাগর তোমাকে ডাকছে। দূর হতে সেই অমোঘ আহ্বান শুনতে পাচ্ছ না? সেই মহাসাগরই ঈশ্বর। সমস্ত সংসার ভূখণ্ডকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ধুয়ে-ধুয়ে বয়ে যেতে হবে, কঙ্কর-প্রস্তর কোমল-শ্যামল কাউকে উপেক্ষা না করে, সব কিছুকে অঙ্গীকৃত করে এগিয়ে যেতে হবে, মিলতে হবে সেই ঈশ্বরে। ঈশ্বরান্বিত হতে হবে। গুহা হচ্ছে অহং, সমুদ্র হচ্ছে আত্মা, প্রাণনির্ঝরিণী অহং-এর গুহা থেকে যাত্রা করল আত্মার নিকেতনে।

'স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'ইচ্ছে করছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—আমার মধ্যে এ এবং সে—এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখনই তার আনন্দ।

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার
পার হল যে পার হল
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে
সকল সুখের সার হল।
বিরহের ব্যথাখানি, খুঁজে তো পায়নি বাণী
এতদিন নীরব ছিল সরম মানি—
আজ পরশ পেয়ে উঠল গেয়ে
তোমার বীণার তার হল॥

হে সমুদ্র, তুমিও যে জল আমিও সেই জল। আমিও তোমারই। শুধু আমি আবদ্ধ, তুমি মুক্ত। আমি খণ্ডিত তুমি অনন্তব্যাপ্ত। আমি ঘট তুমি আকাশ। আমি কূপ তুমি ইয়ত্তাশূন্য। আমি কুণ্ডলীকৃত তুমি বিসর্পিত। আমি তুমি দুই ভাবে একজন।

সেই তোমাকে ধরতে চলেছি আমি। পেতে চলেছি। তোমাতে হতে চলেছি। নদী সমুদ্রকে পেতে চায় না, সমুদ্র হতে চায়। তেমনি আমারও এই হওয়ার সাধনা। কোনো কিছুকে এড়িয়ে নয়, সব কিছুকে পেরিয়ে। ধরা না দিয়ে তোমার পথ কোথায়? কেন না তুমি তো শুধু শেষে নও, তুমি সোপানে-সোপানে, তরঙ্গে-তরঙ্গে। তুমি তো পথের ইতিতে নও, তুমি যে পথের রীতিতেও। আমার এই পথ-চলাতেই আনন্দ। 'জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী, পথে চলার লহো লহো লহো নমস্কার।' তোমাকে নিয়ে তোমার দিকেই তো চলেছি আমি, এই আমার অনন্তসুখ। যাত্রা অনন্ত বলে সুখও মাত্রাহীন।

এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

আমি আবিষ্কার করেছি নিজেকে। প্রাণের মহতী এষণাকে। তাও, হে জগৎসূর্য, সন্দেহ নেই, তোমার কৃপায়। তিমিরগুহায় তোমার করুণ করস্পর্শটি পাঠিয়েছিলে বলে। সদর স্ট্রিটের সামনে সেই ফ্রি স্কুলে বাগানের গাছের অন্তরাল থেকে মুখটি বাড়িয়েছিলে বলে। হে পূষণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, উন্মুক্ত করো সেই আবরণ। কী অগাধ বাসনা আমার জেনেছি এতদিনে। আর সে বাসনার বসতি কোথায় তারও পেয়ে গেছি ঠিকানা।

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি
যত কাল আছে বহিতে পারি
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি—

কেন পারব না? এ যে তোমার দিকেই যাওয়া। জগতের দিকে যাওয়া। মানুষের দিকে যাওয়া। পথের শেষ কোথায় কে জানে, পথে যখন বেরিয়েছি তখনই পেয়েছি তোমাকে। দুয়ার খুলে যখন চেয়েছি সমুখে, তোমার মুখের

দিকেই চেয়েছি। আর আমাকে কে ঠেকায়। সব পথই তোমার পথ। সব যাওয়াই তোমার দিকে যাওয়া।

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়—
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

'সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল' ব্যাখ্যা করছেন রবীন্দ্রনাথ: 'সেই বিরাট সমুদ্রকেই বলেছি এখন বিরাট পুরুষ। সেই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক। সেই যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে এই নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে ভোগ ত্যাগে কিছুই অস্বীকার না করে, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে—হয়তো বা সমস্তের স্পর্শ নিয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।

আমিও তোমারই মত অফুরন্ত। তোমার রয়েছে অনন্ত অন্তরীক্ষ আমার রয়েছে অনন্ত হৃদয়। তোমার সমস্ত আকাশ সেখানে বাসা বাঁধতে পারে অনায়াসে। খেলা করতে পারে পৃথিবী। কাউকে বাদ দিলে তো তোমার স্বাদ পাব না, তাই ধূলির যে ধূলি তারও মধ্যে তোমারই মুখচ্ছবি।

ব্যক্তিচেতনা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বচেতনায় প্রবাহিত প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত আত্মার তৃপ্তি কোথায়?

জানিস কি রে কত সে সুখ
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ!

কোথায় থাকত প্রাণধারণের চেষ্টা যদি আকাশে এত আনন্দ না থাকত। সেই 'সুদূর দূরে সুনীল নীলে' আজও এতটুকু ক্ষয় বা ক্ষোভের রেখা ফুটল না। অক্ষুণ্ণানন্দ আকাশ। সেই আকাশে হৃদয় চায় তারার মত ফুটতে, শিশিরের মত ঝরতে। আকাশে মাথাটি নুয়ে মেঘের মত ভেসে যেতে। আর আকাশে যদি না-ই উঠতে পাই, বেশ তো, থাকব ওই মাটির নিকেতনে।

মাটির নিকেতনে ফুল হয়ে ফুটব, আর ফুল হয়ে ফুটে তাকাব সেই আকাশেরই দিকে।

যিনি সকল দিক থেকে জগতের প্রকাশক তিনিই আকাশ।

দুই হাতে আকাশে প্রেম বিলোচ্ছেন তিনি কে? সেই সুধা দেশে-দেশে গড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল। গাছেরা সবুজ পাতায় ভরে নিল, ফুলেরা মেখে নিল সকল গায়ে, চোখে-মুখে। পাখিরা পাখায়-পাখায় এঁকে নিল, নিল সুরের রেখায়-রেখায়। সে প্রেম মায়ের বুক থেকে কুড়িয়ে নিল ছেলেরা, ছেলের মুখে মায়েরা দেখল সেই প্রেমের প্রতিলিপি। সে প্রেম দীপ্ত হল দুঃখে, দ্রব হল অশ্রুতে। মৃত্যুর খড়্গের আঘাতকে মনে হল যেন কার উৎসর্গের বরমাল্য।

'জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।'

'অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল—সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলছে নানা নাটক নিয়ে, সুখ-দুঃখের নানা খণ্ড প্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায় কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে, যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখ-দুঃখের যে সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে। এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে।"

সেই রসিকই জীবনদেবতা।

'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে-লোকে গ্রহ-চন্দ্রতারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে-হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে।'

বিশ্বদেবতা ঈশ্বর, জীবনদেবতা মনের মানুষ। 'আমার আপন গোপন রূপকার।'

আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে
তারি দানে দাবি আমার
যার অধিকার আমার দানে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নতুন বৌদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ বেড়াতে গেল। ইটকাঠ পাথরের শৃঙ্খলে তোমাকে দেখেছি, এবার দেখি তোমাকে মুক্ত বিশ্ব-প্রকৃতিতে, মহিমান্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘায়। দেবদারুবনে, গিরিদরীবিহারিণী নির্ঝরিণীতে। কিন্তু তুমি কোথায় ?

যাকে চাইছিল তাকে খুঁজে পেল না। পেল শুধু এক প্রতিধ্বনি—প্রতিচ্ছায়া।

সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া
এ কি তোরি ছায়া ?

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করল সৃষ্টির এই নিত্যপ্রবাহ যেন কোন কেন্দ্রসমুদ্রে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকেই রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে জাগছে নানা প্রতিধ্বনি। যেন কোন অব্যক্তের দেশে গান হচ্ছে আর চার দিকে এই ব্যক্তের দেশে, প্রাণ ও বস্তুর দেশে উঠছে তার খণ্ড খণ্ড প্রতিশব্দ। সীমার দর্পণে অসীমের প্রতিচ্ছায়া। পাখির গান পাখির গান নয়, আর কোনো গানের প্রত্যুত্তর। নির্ঝরের কলস্বর নয় আর কোনো গানের প্রতিঘাত। সমস্ত শ্রুত শব্দের ওপারে বেজে চলেছে অশরীরী গান, সেইটিই মূল গান, আর এ সব ধ্বনিবিন্দু তারই প্রতিভাষণ। শুধু ধ্বনি নয়, সমস্ত আভা আর শোভা সমস্ত স্বপ্ন আর সৌরভও তারই প্রতিবিম্ব।

তেমনি আমি-তুমি সকলে। কোথায় সেই মূল গায়েন আলো-ছায়ার মাঝখানে বসে অহর্নিশ বাঁশি বাজিয়ে চলেছে।

আমরণ চিরদিন কেবলি খুঁজিব তোরে
কখনো কি পাবনা সন্ধান
কেবলি কি রবি দূরে অতি দূর হতে
শুনিব রে ঐ আধো গান।
এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী॥

সেই তো পরশ পাথর। তাকেই তো খুঁজছে সেই সন্ন্যাসী। সেই তো তার কাম্যধন ভূমানন্দ। সংসারের সুখশান্তি, সোনা-রূপো, সব সে নস্যাৎ করে এসেছে, ধুলোমাখা দীর্ঘজটে খুঁজছে সে এক টুকরো পাথর, যার ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যাবে, মর্ত তনু হবে ভাগবতী তনু। খুঁজছে আর খুঁজছে। নুড়ির পর নুড়ি কুড়োচ্ছে আর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে। নেতি, নেতি। এ নয় এ নয়। আগে কহো, আগে বাড়ো, আগে খোঁজো। অবিশ্রান্ত অন্বেষণ। আদিগন্ত অন্বেষণ। কিন্তু সে কোথায়? কোন দূর জন্মের স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকারে তাকে রেখে এসেছি? কখন তার ক্ষণিক স্পর্শে জেগে উঠবে কনক বিদ্যুৎ?

সেই তো পরশ পাথর। পরমধন পরশমাণিক। এ কী সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার কাঁকালে ও সোনার শেকল কিসের? গাঁয়ের একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল সন্ন্যাসীকে।

সত্যিই তো, সন্ন্যাসী চমকে চেয়ে দেখল, কাঁকালের লোহার শিকল সোনা হয়ে উঠেছে। এ কী চমৎকার এ কী দুর্বিষহ। পথে যত কুড়িয়ে পেয়েছে নুড়ি, অভ্যাসবশে ঠুকেছে সেই লোহার শিকলে, আবার অভ্যাসবশেই দূরে ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে। সেই সব পরিত্যক্ত নুড়ির মধ্যেই ছিল বুঝি সেই পরানিধি। কোথায়, কোথায় ফেলেছে সে তাকে? হায় হায় সে নেতির মধ্যেই প্রেতি ছিল লুকিয়ে! ধূলির মধ্যেই সেই অসাধ্য ধন। প্রতিদিনের শত তুচ্ছতার আড়ালে-আড়ালেই রয়েছে তার মুখচ্ছবি। সহজের মধ্যেই দুরূহ সুখ। অভ্যাসের মধ্যেই অলৌকিক। বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। এমন কোনো পাথর নেই যা পরশ-পাথর হতে পারে না।

খ্যাপা আবার খুঁজতে লাগল। আগে খুঁজছিল সে পরমরতন, এখন খুঁজছে সে হারানো রতন।

তোমাকে না পাই তোমাকে খুঁজতে যেন না ছাড়ি। না ভুলি।

'তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের আমার জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। তুমি আছ এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে যেতে না পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম—কেনই বা কিছু দিনের জন্যে নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ভেসে বেড়ালুম, শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল? আমি আছি এই বোধটিকে আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস

করে ফেলেছি। প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তার হাতে শেষ কড়িটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড় দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারিনে। সেই জন্যে আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও।'

তোমাকে বাইরে দেখি, দেখি আবার অন্তরাত্মার নিভৃত-ধামে। বাইরের দেখা ঘটনার আবরণে মাঝে মাঝে ঢাকা পড়লেও অন্তরদর্শন অবাধ ও অব্যাহত। আর সেখানেই আমি নির্ভয়, আমি প্রসন্ন, আমি সুদক্ষিণ।

'তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি
তোমার আনন্দ-মূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর—পরাণবল্লব,
তোমার কোমলকান্ত চরণপল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবন-তরীতে
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে-মরিতে।'

॥ সাত ॥

ধরা-অধরার দেশে বাস করো, তুমি কে? যখনই তোমাকে চিনি তখনই তোমাকে হারাই। যখনই ধরেছি মনে করি তখনই দেখি রিক্ত মুষ্টি। আবার যখনই অন্যমনে থাকি তখনই সোনার কমল ফোটে, যখন ঘুমে থাকি তখনই শুধু পাশে এসে বসো। এমনিতে কত রাত নিদ্রাহারা কাটে তুমি আস না, কিন্তু অন্ধকারে যেই তোমার আসার লগ্নটি লেখা হয় তখনই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের অতল মৌনে তোমার গভীর রাগিণীটি বাজিয়ে যাও, তোমার মালার স্পর্শটি আর বুকে লাগে না। যখন জাগি, উঠে দেখি তুমি নেই। তোমার চলে যাওয়ার গন্ধে অন্ধকারে ভরে রয়েছে।

তোমার সেই চলে যাওয়ার গন্ধটি আমার জীবনে ভরে ওঠার গন্ধ হয়ে উঠুক। কিন্তু, যাই বলো, চোখ চেয়ে যা কিছু দেখছি সব কিছুই তো তোমার ছায়া, তোমার ছবি। প্রকৃতি, মানুষ দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বশোভাই তো তোমার

স্বহস্তে লেখা চিঠি, চিঠির অক্ষর। নিজের কথা এবার বন্ধ করি। চিঠির অক্ষরগুলি এবার কথা কয়ে উঠুক। আমার স্তব্ধতায় শুনি তাদের মর্মের কাকলি। কিন্তু সমস্ত পাঠোদ্ধারের পরেও সেই অনন্ত প্রশ্ন জেগে রইল, ঠিকানা কই? তুমি এত লিখলে কিন্তু তোমার ঠিকানাটুকু কোথাও লিখলে না কেন?

পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্যই তার বাতায়ন। সেই বাতায়ন দিয়েই বুঝি দেখা যায় অধরাকে, সেই দেখা না-দেখার মেশা চকিতদ্যুতিকে। শঙ্খের মাঝে শোনা যায় দূর সমুদ্রের গান। পাখির কণ্ঠে আরেক প্রভাতের সূর্যোদয়। শিশিরের চিহ্নে কোন এক অপরিচিত আকাশে চরণপাত। কোনো কিছুই নিষ্প্রতীক নয়। আমি-তুমি সকলেই সেই জীবনদেবতার সেই মহামানবের দূত।

'যা কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে,' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে।'

আমি-তুমি সকলেই সেই মহামানবের প্রতিধ্বনি।

'বহু যুগ যুগান্তের কোন এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর কাছে এসে।'

সমস্ত নিখিলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিতালি, কে কখন সেই অরূপের রূপটি প্রস্ফুটিত করে, কে কখন সেই অধরার অঞ্জনটি চোখে বুলিয়ে দেয়। সামান্য ধূলোতেও তাঁর অবহেলা নেই, কার চরণস্পর্শে ধূলির ধন কখন স্বর্গীয় হয়ে ওঠে কেউ জানে না। কাকে অবহেলা করব? মাটির প্রদীপ[illegible] দিন অবহেলা করলে কী হবে, রাত্রির শিখার চুম্বনটি তার জন্যে।

'জেগেছে নূতন প্রাণ বেজেছে নতুন গান
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নে রে কাছে আয় আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথি॥'

কর্ণাটের রাজধানী কারোয়ারে এসেছে রবীন্দ্রনাথ, আবার মেজদাদার কাছে তাঁর নতুন কর্মস্থলে। সেখানে, একুশ বাইশ বছর বয়স, রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখল, প্রকৃতির প্রতিশোধ। সে নাটকের শেষ কথা তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের মূল কথা, মর্মকথা।

বিশুদ্ধ অনন্ত বলে কিছু নেই। অনন্ত দূরের বাইরের জিনিস হয়েও আন্তর

জিনিস। সে বস্তুনিরপেক্ষ নয়, নয় বিশেষবিহীন। রূপের মধ্যেই সে অপরূপ, সীমার মধ্যে সে সুষমান্বিত। শূন্যতার গুহার মধ্যে সে নেই, সে আছে পূর্ণতার গৃহের মধ্যে। গুহার সঙ্গে গৃহকে মেলাও, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সৈনিককে। সীমার সঙ্গে অসীমের গাঁটছড়া বাঁধো। অসীম ছাড়া সীমা সামান্য, সীমা ছাড়া অসীম নিরুপায়। অসীমের অঙ্গনে সীমার বেড়া লাগাও। সীমার বৃন্তে ফুটিয়ে তোলো অসীমের শতদল। হে সুদূর, তুমি এত মধুর কেন? 'সীমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' অক্ষর তো সীমা, কবিতাই অসীম। মূর্তি তো সীমা, কল্পনাই অসীম।

তবে থাক তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ সুকোমল
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।

নিয়মের মধ্যে অসীমকে না পাই, হৃদয়ের মধ্যে অসীম অপ্রতিহত। এই নিয়মকেই বা মুক্তিরূপে আস্বাদ করতে পারব না কেন? নিয়ম যখন নিতে হবে অর্থাৎ যখন তাকে আপনার করে নিতে পারব, আত্মসাৎ করে নিতে পারব, তখনই সে নিয়ম মুক্তিতে ফুটে উঠবে, বৈরাগ্য ফুঠে উঠবে নিবিড়নিঃসীম অনুরাগে।

সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সূক্ত তৈরি হল বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। বন্ধনকে পরিহার করে নয়, বন্ধনকে অবন্ধনরূপে পরিণত করে। কর্মকে পরিহার করে নয়, কর্মকে বিরামরূপে পরিণত করে। বিষয়কে পরিহার করে নয়, বিষয়ের মধ্যে বিষয়াতীতকে আস্বাদন করে। যতক্ষণ আসক্ত ততক্ষণই আবদ্ধ, যখনই সঙ্গোত্তীর্ণ তখনই মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় উদয়ের মুক্তি। 'বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি, মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।' কিংবা 'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।'

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। ভেবেছিলাম ঘরেই থাকব, কোথাও যাবনা বাইরে। কিন্তু বাঁশি যখন বেজে উঠল, বলো তখন কী করি। তখন কী করে আর থাকতে পারি বদ্ধ ঘরের বাসিন্দে হয়ে? যদি তোরা কেউ পথ জানিস তো বলে দে আমাকে। আমি গিয়ে তার মুখের হাসি দেখে আসি, ফুলের মালা দিয়ে আসি তার গলায় দুলিয়ে। আর কানে-কানে বলে আসি

একটি কথা, গোপন কথা, গভীর কথা। সে কথাটি আর কিছুই নয়, তোমার বাঁশি বেজেছে আমার প্রাণের কুহরে আমার রক্তের প্রবাহ-ছন্দে। আমি জেগেছি, আমি এসেছি।

বালিকাকে বলছে সন্ন্যাসী, আয় এই অন্ধকার বদ্ধ গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ি। বসি গিয়ে চাঁদের আলোতে। কী শান্তিসুধা, কী গভীর বিরাম এই প্রকৃতির নিকেতনে। প্রার্থনার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছগুলি, পল্লবে মর্মর উঠেছে, বিকীর্ণ করেছে পুষ্পগন্ধ। অনন্তের পারাবারে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি কী সুন্দর! আয় কাছে আয়, তোর মুখখানি দেখি। তুই কি দু দণ্ডের ভ্রম? তোর এই সরলতায় লেখা মুখখানি, এ কি মিথ্যে? তোর চোখে আকাশের আলো, স্পর্শে ফুলবাস, ছন্দে স্নিগ্ধ সমীর, তুই কি অনন্তের স্বাক্ষর নিয়ে আসিস নি?

কিন্তু, না, এত সহজে হার মানলে চলবে না। মায়াবিনী মরীচিকা, সরে দাঁড়া। এত দিনের দৃঢ় ধ্যান, দগ্ধ জ্ঞান, দীপ্ত আশা—সব কি নিষ্ফল হবে, ব্যোমবিহারী পাখির মত উড়ে যাব, সাধ্য কি আমাকে বিদ্ধ করে মাটির ব্যাধশর?

দেখ, দেখ, লতাটিতে কেমন কুঁড়ি ধরেছে। প্রফুল্ল চোখে বললে সে বালিকা, প্রতীক্ষা করছে প্রভাতের। প্রভাতের আলোটি পেলেই ফুটে উঠবে।

ফুলন্ত লতা ছিঁড়ে ফেলল সন্ন্যাসী। সব মায়া, আলেয়া, মহাকায় জটিলতা। আমার এই আত্মকেন্দ্রিত গুহাবাসই ভালো।

কিন্তু গুহা যে শুধু নৈষ্ফল্যের হাহাকার দিয়ে তৈরি।

সে নির্বাসন থেকে বেরিয়ে এল সন্ন্যাসী। দণ্ড-কমণ্ডলু চূর্ণ করে দিল। হে বিশ্ব, মহাতরী, তোমার কোটি-কোটি যাত্রীর মত আমাকেও আশ্রয় দাও, আমাকেও নিয়ে চলো ওদের সঙ্গে। পাখী যখন ওড়ে, ভাবে পৃথিবী ত্যাগ করে এলাম, আরো ওড়ে, আরো উপরে ওঠে, অথচ কিছুতেই ছাড়তে পারে না পৃথিবী। আবার শান্ত ডানায় ফিরে আসে কুলায়ে। তেমনি যতই নিজেকে মাজা-ঘষা করি, ভস্মে আর গেরুয়ায়, মানুষ হওয়াকে অতিক্রম করব কী করে? গৃহ ছাড়তে পারি কিন্তু দেহ-গেহ ছাড়ব কোথায়? মানুষকে বিলুপ্ত করেই যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হতে গেলুম কেন? চিনি খেতেই আমার সুখ, চিনি হয়ে নয়। সুতরাং যে ভূমা খুঁজছি, সে মানবিক ভূমা। ঈশ্বরের যে রোমাঞ্চ খুঁজছি, সেই যে পরশাতীতের হরষ, সে এই নরদেহেই। আমি কি আর ঈশ্বর বলে প্রকাশিত হতে পারব, আমি মানুষ বলে প্রমাণিত হই।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে এল লোকালয়ে। আহা, সীমাসুন্দরেরই বা কি সীমা আছে ?

ওই ধান কাটে ওই করিছে কর্ষণ
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহবা করিছে স্নান কেহ তুলে জল
ছেলেরা ধূলায় বসে খেলা করিতেছে—

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার এই একটি মাত্রই পালা। পালার নাম সীমা ও অসীমের শুভমিলন। সীমা বধূ, অসীম বর। কন্যার গৃহেই বিবাহ। সীমার ঘরেই প্রথম শুভদৃষ্টি। পরে অসীমের পিছে সীমার অনুগমন।

অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।

'নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা।' 'পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।' 'ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান।' 'অনন্তকাল অচিরকালেরই মেলা।'

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা॥

'অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য, অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাই বিনাশ। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না, সেখানে তা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তা নিরর্থক। অসীম যদি সীমার বাইরে থাকেন তবে সেখানে এমন কোন সেতু নেই যার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতই মিথ্যে।'

'জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক তবু তার সীমা নাই।'

হে অরূপরতন, হে অমিয়রতন, তোমাকে আশা করে আমি ডুবেছি রূপ-

সাগরে। আমি আর এই ভাঙা তরী নিয়ে ঘুরতে পারি না ঘাটে-ঘাটে। অনেক দুলেছি অনেক ভুলেছি, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে অনেক পড়েছি-উঠেছি। আর নয়। এবার ঠিক করেছি, ডুবব, তলিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। তোমার রূপের সমুদ্র তো সুধার সমুদ্র। মরেও কারু মরণ নেই। এক রূপ থেকে আরেক রূপে নবায়িত হব। সেই নবীন হওয়াই তো অমর হওয়া।

এমন গান আছে যা কানে শোনা যায় না, প্রাণে শোনা যায়। কানের গান থামে, প্রাণের গান অবিচ্ছিন্ন। 'ধরা নাহি দেয় কণ্ঠ এড়ায় যে সুরখানি, স্বপ্নগহনে লুকিয়ে বেড়ায় তাহার বাণী।' সেই প্রাণের গান যেখানে বাজছে সেখানেই তো অতলের সভা, নিস্তব্ধের সভা। সেই সভায় আমি আমার প্রাণের বীণা নিয়ে যাব। নীরব কান্না দিয়ে সে প্রাণের বীণা আমি তৈরি করেছি। সেই কান্নাই তার চিরজীবনের সুর। কিছুই বলতে পারি নি, কিছুই চাইতে পারি নি, কিছুই হয়ে উঠতে পারি নি, এই তো তার কান্না। হে মহামৌনী, আর কী দিতে পারি তোমাকে? এই নীরব বীণাটিই রাখব তোমার পদপ্রান্তে।

অসীমের আনন্দটি বুঝি কী করে? সীমায়িত নদীরেখায়। গুচ্ছীকৃত কদম্বপুঞ্জে। সুহাসিনী শশাঙ্কলেখায়। অসীমের মমতাটি বুঝি কী করে? নবঘনশ্যামদূর্বাদলে। তিমিরমেদুর বনবীথিতে। শালমঞ্জরীর মৃদুস্নিগ্ধ সৌরভে।

অধরাকে ধরি কোথায়? গানের সুরে, কবিতার ছন্দে, রঙ ও রেখার ইঙ্গিতে। বিশ্বময় এই ইঙ্গিতময়তা। ক্ষণেক্ষণে শুধু চোখে-চোখে ইশারা।

দাঁড়িয়েছিলে জানলায়,
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের-পল্লবে
অধরা ছিল তোমার কাঁকন পরা
নিটোল হাতের মধুরিমায়।

আর রূপে-রূপে সেই অধরাই তো অপরূপ। 'রূপের কোলে পরম অপরূপ।' 'অপরূপ সে যে রূপে রূপে, কী খেলা খেলিছে চুপে-চুপে।' রূপ আর কী। সেই অপরূপেরই মুখমুকুর।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।

সেই অপরূপই অরূপ। হে অরূপ-অপরূপ, তোমার যা বাণী তাই জ্বলছে তোমার দীপসভায়। আমিও সে সভার এক মৃৎ-প্রদীপ, তুমি তাতে তোমার শিখাটি সঞ্চার করো। সেই দীপ্তিময়ী শিখা যা মৃত্তিকার যবনিকা ভেদ করেও জ্বলে অনির্বাণ। সেই শিখাই তোমার ইচ্ছা, তোমার লীলাবাসনা। তোমার সেই ইচ্ছার বহ্নিতে আমাকে জ্যোতিষ্মান করো। আমিও তোমার ইচ্ছার প্রজ্বলন্ত বাহক হই। তোমার বসন্ত-বাতাস যেমন পুষ্পে-পত্রে বিচিত্র বর্ণে তোমার গীতলেখা লিখে যায় তেমনি আমার জীবনেও তোমার স্বাক্ষরমালা ফুটে উঠুক। আমার প্রাণের কেন্দ্রকুহরে তোমার নিশ্বাস পুরে দাও, তোমার গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হই।

অসীম ধন থেকেও তো তোমার সাধ মেটে না, আবার আমার কাছে এসে হাত পাতো। আমার কাছ থেকে তুমি কণা-কণা করে নেবে, আমার দিন-রাত্রির কণা-কণা করে নেবে। আমার দিন-রাত্রির কণা-কণা আমার মুহূর্ত। প্রজাপতির মৃদু-মৃদু কম্পন। একটু-একটু করে খুঁটে-খুঁটে না নিলে যেন তোমার সুখ নেই। ছুটিয়ে টেনে নিয়ে যাবে, তা নয়; তোমার রথ-অশ্ব ছেড়ে আমার সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে যেতে চাও। সমস্ত পথটিই আমার সঙ্গে তোমার উপভোগ করা চাই। প্রত্যেকটি কাঁটা, প্রত্যেকটি ধূলি, প্রত্যেকটি পদস্খলন। 'তুমি পান্থ আমি পান্থ জয় জয় জয়।'

শুধুই নেব, কেন আমার কী দেবার কিছুই নেই? আমি কি এমনই নিঃস্ব? কেন আমার বুকে কি ভালোবাসা নেই? তুমিও তো শুধু ভালোবাসা দিয়েই সমস্ত ভুবন ভরে দিয়েছ। 'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ-আলোক তনু-মন-প্রাণ'—তোমার সেই ভালবাসার বিনিময়ে আমিও ভালোবাসাই দেব। আর তুমি তা না চাইলেও দেব। তোমার প্রয়োজন না থাক শুধু আমার দেবার গুণে আমার সামান্যও মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। তোমার যেমন প্রয়োজন নেই আমারও তেমনি আকাঙ্ক্ষা নেই। তোমার যেমন আনন্দ আমারও তেমনি আনন্দ। তোমার বরমাল্য পেয়ে আবার তোমাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া।

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলেম দেখা, অন্ধকারে একা একা
ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন।

ইচ্ছে ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন।

কত যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে ধূলামাটির মানুষ হয়ে জন্মেছি। জন্মেছি এই মাটির খেলাঘরে। এই মাটিমাখা দেহে এত সুধা ছিল বলেই তো এই মাটি বসুধা।

হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি বালিকা বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথায় থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু।

এই মাটিই তো সকল শূন্যের চেয়ে বেশি। এই মাটিই তো স্থির, ধ্রুব, পুরাতন। 'হে মাটি হে স্নেহময়ী অয়ি মৌন মূক, অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন।' সীমার মহিমা দেখাব বলেই তো আমার আসা, মাটিতে বাসা বাঁধা —শুধু ঠিকানা-হীন স্বর্গের সীমানা রচনা করব বলে। 'দিয়েছ আমার 'পরে ভার, তোমার স্বর্গটি রচিবার।' ফাঁকির ফাঁকা ফানুস যে আমি হই নি, মহা-অব্যক্তকে যে আমি প্রকাশিত করেছি রূপে-রেখায় বর্ণে-বাক্যে, এই তো আমি অর্থান্বিত করেছি স্বর্গকে, স্রষ্টাকে। এই তো ভারতবর্ষের সাধনা। মাটিতে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। মানবদেহে ঈশ্বরের প্রস্ফুরণ।

'অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয় তোরণ চূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে
মেলিনু নয়ন; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে, একাকীর কোন লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।'

রূপের পদ্মেই আমি অরূপের মধুপান করেছি। নিঃশব্দ অন্তরে শুনেছি সেই অনন্ত মৌনের সম্ভাষণ। অন্ধকার প্রান্তর শূন্যময় নয়। আর শূন্যও তো মরুমাত্র নয়। 'এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়, এ যে চিত্তময়।' অন্ধকারেও তো অভ্রান্ত জ্যোতির পথ আঁকা। 'আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি, ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।' তেমনি আমিও কি শুধু বিধাতার এক

বৃহৎ পরিহাস? আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিণতি কি ভস্মাবশেষ, একস্তূপ কঙ্কাল-কলঙ্ক?

নয়, নয়। আমি অরূপের রূপকার। আমি প্রকাশকের প্রকাশক। আমিই মর্ত্যের ধূলিতে স্বর্গের নির্মাতা। আমিই সেই, সোঽহং।

'ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্র-বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।'

অব্যক্ত থেকে প্রাণ। প্রাণ থেকে মন। মন থেকে বাক্য।

প্রাণের সমারোহ। মনের আনন্দলীলা। বাক্যের দীপালি-উৎসব। আর চারদিকে শুধু মানুষের মেলা। মাটিতে যেমন স্বর্গ তেমনি মানুষেই ভগবানের ঠিকানা।

'এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে প্রধান একটি অমৃত রস—মরবার পূর্বেও যদি অঞ্জলি ভরে পান করতে পাই তা হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়।'

রুক্ষতা-রিক্ততার বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধ। সুন্দরের হাতে পরমপ্রেমীর হাতে জটা-বল্কলধারীর পরাভব। বসন্তের বন্যাস্রোতেই সন্ন্যাসের অবসান।

শিলাইদহ থেকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মত বেঁচে এবং মানুষের মত মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মত হাওয়া হয়ে যাওয়া আমার কাজ নয়।'

বর্ষার শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ ফিরল কলকাতায়। চৌরঙ্গির কাছাকাছি লোয়ার সার্কুলার রোডে এক বাগানবাড়িতে এসে উঠল। বাড়িটার দক্ষিণে বিরাট এক বস্তি, অগুনতি মানুষে ভরা। মানুষ আর মানুষ আর তাদের নানানখানা। কাজ বিশ্রাম খেলা আনাগোনা কান্না কলহ কোলাহল, নানান রকম ব্যবহার। নানা জিনিসকে দেখবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি তখন রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু শুধুই মাটিরই মানুষ নয়, দেখবার বস্তু আকাশেরও তারাবলী।

এত দীপ তোমার আকাশে। চেয়ে দেখ আমিও এক আকাশপ্রদীপ। মাটির ঘরের প্রদীপ্ত প্রণতি।

রবীন্দ্রনাথ শুধু নানাকেই দেখে না, যিনি এক, যাঁর এই নানা, তাঁকেও দেখে।

'হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি শ্রবণ চিন্তা আমার সমস্ত কর্ম তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই—বল রক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি।' প্রার্থনা করছেন রবীন্দ্রনাথ: 'আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।'

॥ আট ॥

কী শান্তি, তোমাকে জানতে দিয়েছি। দিয়েছি বুঝতে। বুক খালি করে দিয়েছি। রক্তের প্রচ্ছন্ন অক্ষরে যে কথা লেখা তা পড়িয়েছি তোমাকে। প্রাঞ্জল করেছি অশ্রুজলে।

শুধু শান্তি নয়, মুক্তি। যে মুক্তির আরেক নাম রিক্ততা। যে মৌন গুহার মধ্যে নিগূঢ় হয়ে ছিল তাকে শব্দের মধ্যে নিঃশেষ করতে পেরেছি। নিরগল করতে পেরেছি। এই তো মুক্তি। দুর্বার, দুর্ধর। এ তো শূন্যতা নয়, শূন্যায়িততা। আমি যে তোমার জন্যে পিপাসিত এ জানানোতেই আমার পিপাসা-মোচন। আমি যে আর্তনাদ করতে পেরেছি এই আমার আনন্দ।

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে সব কিছু মোর নিলে এসে
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।
দুঃখসুখের পারে তোমায়, পেয়েছি আনন্দ॥

আমি তোমাকে পাই না। আমি তোমাকে চাই। পাওয়ার চেয়েও তপ্ততরো ব্যাপ্ততরো সুখ এই চাওয়া। পেলেই তো হয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল। 'হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে দিয়ে যায়।' কিছু একটা দগ্ধ হয় বলেই আলো ফোটে। আমিও তেমনি দগ্ধ হয়ে হয়ে আলো দেবো। সে আলোর শিখাই পিপাসা প্রলয়ঙ্করী।

আমি তোমাকে চাই অথচ তুমি তা জেনেও জানলে না, আড়াল দিয়ে চলে গেলে পাশ কাটিয়ে, এ আর হবার উপায় নেই। সকলের সামনে জড়িয়ে ধরেছি তোমাকে, রাহু যেমন সূর্যকে গ্রাস করে। রাহু তবু ছেড়ে দেয়, আমি ছাড়ব না। আঁকড়ে থাকব, কাঁটার মত বিঁধে থাকব মর্মমূলে। একবার যখন তোমাকে দেখেছি তখন আর কী করে তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবে? তুমি আমাকে চাও কি না চাও কিছু এসে যায় না। আমাকে খোঁজো কি না খোঁজো কে খোঁজ করে? তোমার প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত কে বসে-বসে প্রতীক্ষা করবে? তোমার পায়ে পায়ে ফিরব, মিশে থাকব গায়ে-গায়ে। আমি তোমার ছায়া। তোমার অনন্তকালের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী।

তোমাকে ছেড়ে দেব না। এক মুহূর্তও দেব না ভুলতে। তোমার কানের কাছে আমার এক নামই অনর্গল জপ করব। কেবল সাধব, কেবল কাঁদব। সেধে-কেঁদে না পারি, বাঁধব তোমাকে শৃঙ্খলে, আমার প্রাণ যদি পাষাণ হয়, সেই পাষাণ-শৃঙ্খলে। ভাবছ, গভীর নিশীথে বিরলে বসে বিশ্রাম করবে একা-একা। অসম্ভব। দেখবে আমি তোমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে। উপায় নেই। সে অনন্ত বিভাবরী আমার সঙ্গে তোমার যাপন করতে হবে। তুমি ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না। যদি ঘুমিয়ে পড়ে পাশে-বসা লোকটিকে দেখতে না পাও, নিজেকে যে হতভাগিনী বলবে। যদি অকূল সমুদ্রে জগৎ-তরী ডুবেও যায়, যদি তুমি ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, দেখবে আমিও তোমার বাহু আঁকড়ে ধরে ভাসছি। দেখবে সেই অতলেও আমি তোমার হাত-ধরা। ডুবি আর ভাসি, উঠি আর পড়ি, তোমাকে ছাড়ি নি।

কী আনন্দ, তোমাকে বিষাক্ত সাপের মতো জড়িয়েছি। তনুর তন্তুতে-তন্তুতে ঢুকেছি রোগের মত। লোকে রোগে কাতর হয়, শোকে কাতর হয়, তুমি আমাতে কাতর হবে। এই নিদারুণ আলিঙ্গন, এই সরীসৃপ-আলিঙ্গন থেকে তোমার মুক্তি নেই। যেমন গাছকে ঘিরে লতা তেমনি তোমার রূপকে ঘিরে জেগে থাকবে আমার ক্ষুধা। আর, তোমার রূপ!

স্খলিত বসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলে যায়—

রূপের অমন শুভ্রতা বলেই তো ক্ষুধার এমন তীব্রতা। অত আশা বলেই তো এত ভয়। 'আশা হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয়।' আর সুদুঃসহ প্রেম বলেই তো অনিবার্য মৃত্যু।

তাই বলে ভেবো না তোমার ছুটি আছে। বা আমার আকাঙ্ক্ষার আছে কোনো নিষেধসীমা। 'প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর, আনিবে না কোনোই উত্তর।' তবু তোমাকে ডেকে যাব, খুঁজে যাব, চেয়ে যাব আমরণ। যখন একবার তুমি আমার চোখে পড়েছ, তখন এ কথা ভেবো না যে চোখ বন্ধ করলেই তুমি অদৃশ্য হবে অন্ধকারে। এই মরুময় তৃষাময় অন্ধকার দিয়েই তৈরি করব চিরজ্যোৎস্নার রজতরাত্রি।

এই 'রাহুর প্রেম।' রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সের লেখা।

হেরো অন্ধকার মরুময়ী নিশা
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা
অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা
　　　　করিতেছে হাহাকার,
আজকে যখন পেয়েছি রে তোরে
এ চির-যামিনী ছাড়িব কী করে?
এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
　　　　মিটিবে কি কভু আর?
বুকের ভিতরে ছুরির মতন
মনের মাঝারে বিষের মতন
রোগের মতন, শোকের মতন
　　　　রব আমি অনিবার॥

প্রথমে এই নীরন্ধ্র ব্যাকুলতা, আবরণ বাসনার বহ্নিশিখা। আসক্তি না থাকলে শক্তি আসবে কী করে? তারপর সেই শক্তি শিবে প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ইচ্ছার বাতায়ন দিয়ে দেখবে নিখিলের ইচ্ছাকে। সে ইচ্ছা শুভের ইচ্ছা, ধ্রুবের ইচ্ছা। সে ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা তখন স্বচ্ছন্দ হবে। বিশ্বের দীপ-সভায় যে ইচ্ছাটি জ্বলছে তাই শেষে মাটির প্রদীপে প্রাণ পাবে।

'নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা
আমি শুধু তার মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।'

ইচ্ছার স্বাভাবিক ধর্ম সে অন্য ইচ্ছাকে চায়, কেবল জোরের উপর তার আনন্দ নেই। 'ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি', বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওয়াটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিয়েছেন—বিশ্বনিয়মের জালে একে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি—সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা। ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ওই একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।'

কামনা তখন দাঁড়াবে এসে কল্যাণে, বাসনা তখন বৈরাগ্যের রঙ ধরবে। আর তখন উন্মাদনা নেই, শুধু প্রসাদমধু। আর উদ্বেলতা নেই, শুধু উৎপূর্ণতা। তখন আর রূপ নয়, ভালোবাসা। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।' তখন আর সুখে থাকা নয়, কোলে থাকা। 'সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে। যাক না গো সুখ জ্বলে।'

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর প্রতিদিন আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াচ্ছেন। বলছেন, আমি রাজখাজনা নিতে আসি নি, তোমার প্রেম নিতে এসেছি।

কী অপরিমেয় বিত্তের আমি অধিকারী—এই অপরিমাণ প্রেম। দিয়ে-দিয়েও একে শেষ করতে পারি না, বিলিয়ে-বিলিয়েও পারি না ফুরিয়ে ফেলতে। আপনার মাঝে আপনার প্রেম, তাহারো পাইনে কূল। তোমার যেমন আলোর শেষ নেই অন্ধকারের শেষ নেই আকাশের শেষ নেই তেমনি আমারও ভালোবাসার শেষ নেই।

তুমিও আমার এই ভালোবাসার ভিখিরি।

'তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আমার মধ্যে এই অদ্ভুত আমির লীলা ফেঁদে বসেছ, এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।'

কিন্তু কাম ছিল বলেই তো প্রেম। কামের কাছে রূপ ছিল বলেই তো প্রেমের কাছে তা অপরূপ। উন্মাদনা ছিল বলেই তো এই নিস্তারিণী শান্তি। দাঁতে-নখে ভয়ঙ্কর ঝড় ছিল বলেই এই নিঃসঙ্গানন্দ আকাশের নির্মলতা। সমস্ত চাঞ্চল্যের গভীরে একটি পরিপূর্ণ অক্ষোভ।

দুর্দাম প্রেম কি এ,
প্রস্তর ভাঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষা দিয়ে।
মানে না শাস্ত্র জানে না শঙ্কা
নাই দুর্বল মোহ
প্রভুশাপ পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ।
করুণ ধৈর্যে গণে না দিবস
সহে না পলেক গৌণ
তাপসের তপ করে না মান্য
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুকে দেয় টিটকারি তার হাস্তে
মঞ্জীরে বাজে যে ছন্দ তার লাস্তে
নহে মন্দাক্রান্তা,
প্রদীপে লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা॥

সমস্ত বিপ্লব-প্লাবন পেরিয়ে এসেই তো সামঞ্জস্যের শান্তি। তখন আর আহরণ নয়, তখন উৎসর্গ। তখন আর সঞ্চয়ের দম্ভ নয়, তখন শুধু সমর্পণের তৃপ্তি।

তখন, আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি তুমি অবসরমত বাসিয়ো।

তখন আবার কান্না, আরেক রকম কান্না, তুমি কে, তুমি কোথায়? এ আবার এক অলৌকিক কৌতূহল। শরীরের মধ্যে অশরীরী, তুমি কোথায়?

তোমাকে যে পেয়েও পাওয়া যায় না, ধরা দিয়েও তুমি অধরা। বলো কার তুমি অদেখা দূত, কার তুমি ইঙ্গিতলেখা? তোমার এত সৌন্দর্য, কোথায় তোমার সে সৌন্দর্যের প্রাণমূর্তি? এত লাবণ্যপুঞ্জ, কোথায়, সে কান্তির সুধাসত্তা, কোথায় সে রূপশক্তি? তোমাকে কোথায় ধরি, কোথায় রাখি? তোমার এই প্রদীপ্ত প্রাণস্পর্ধার উৎস কোথায়? তুমি কোথায়?

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমার
সে কোথায়?

তুমি তো শুধু বল্কল-পল্লব নও, নও মঞ্জরী-বল্লরী, তুমি গন্ধসুধা। তুমি তো দেহ নও তুমি আত্মার রহস্যশিখা। সে দীপ্তিময়ী তৃপ্তিময়ী শিখাকে ছুঁই কী করে, মৃত্তিকার ভাণ্ডে বন্দী করি কী করে? অথচ সে শিখাস্পর্শ না পেলে শুধু মৃৎভাণ্ডে আমার কী হবে? তোমার চোখের কালো তো শুধু কালো নয়, ও কালোর আলো, যে আলো আরেক কোন আকাশ থেকে উৎসারিত। সে অপরিচিত আকাশকে ধরব কী করে আমার চার দেয়ালের উঠোনে? তুমি কি আমারই প্রয়োজনের সংসারে প্রসাধন হতে এসেছ? আমার হাতের মুঠোয় নিষ্পিষ্ট হতে?

বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি,
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?

হায়, ছিঁড়ে নিলেই কি পাবে? ফুলের পাপড়ি থেকে ছিঁড়ে নিতে পারবে তার কোমলতা? ত্বকের থেকে তার প্রাণ-লাবণ্য? প্রকৃতি আর আত্মা একসঙ্গে জড়িয়ে আছে। শুধু কামনা দ্বারা আত্মাকে কী করে পাবে? আর আত্মাকে না পেলে সেই জ্যোতিষ্মতী শিখাকে না পেলে পেলে কী?

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

সুতরাং নয়নের নীরে বাসনাবহ্নি নির্বাপিত করো। সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে দেখ। মঙ্গলকে দেখ। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মাকে মেলাও। নিয়মের সঙ্গে মেলাও মুক্তিকে। প্রকৃতি হচ্ছে বাঁশের টুকরোটা, আত্মা হচ্ছে তার রন্ধ্র, দুয়ে মিলে বাঁশি। নিয়ম হচ্ছে তীর, মুক্তি হচ্ছে স্রোত, দুয়ে মিলে নদী। প্রকৃতি জিনিস আত্মা জায়গা। জিনিস দিয়ে জায়গা মেরো না, আবার জায়গাকেও করে তুলো না শূন্যতার হাহাকার। কর্মকে আনন্দময়, ব্রহ্মময় করে তোলো, আবার ব্রহ্মকে নির্বাসিত কোরো না নৈষ্কর্মে। কর্ম আর ধর্ম দুইকে মিলিয়ে নিয়ে আনন্দময় সংসার করো। কর্মলিপ্ত ধর্ম আর ধর্মধৌত কর্ম। কর্মসঙ্গীতে বাজুক শুধু ঈশ্বরের নাম।

রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

যতই উপকরণে আকীর্ণ হোক সংসার, দুহাত যতই ধনরত্নে ভরে উঠুক, আমি যে কিছুই পাইনি এ যেন এক মুহূর্তের জন্যেও না ভুলি। তোমাকে না-পাওয়ার দুঃখ যেন শয়নে-স্বপনে লেগে থাকে, লেপে থাকে, বিঁধে থাকে। শুধু শয়নে-স্বপনে নয়, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, এক-একটি করে প্রতিটি মুহূর্তের চলে যাওয়ায়।

যতই উঠে হাসি যতই বাজে বাঁশি
যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে॥

তোমার চন্দ্রসূর্যের মত যদি আর কিছু থাকে অনির্বাণ, সে আমার এই ঊর্ধ্বশিখার উন্মুক্ত বেদনা, উজ্জ্বল বেদনা : তোমাকে পাই নি, তোমাকে পাইনি।

ঘর ছাড়ব কেন? ঘরেই বসেই সকল কর্মকে ঈশ্বরের পরিচর্যা বলে জানব। যামিনী অতিবাহিত করব ঈশ্বরের কথাপ্রসঙ্গে। সে গৃহ বন্ধন নয়, কণ্টককানন নয়, সে গৃহ স্বর্গীভূত, তীর্থীভূত। সে গৃহেই তাঁর নব-নব অবির্ভাব।

'গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্।
মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহামতাঃ॥'

ওরে, তোরা তারে কেউ চিনলি না রে, সে যে দীনহীন পাগলের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে। 'ছবি ও গানে' সেই পাগলকে দেখল রবীন্দ্রনাথ।

আপনমনে সে গান গেয়ে বেড়ায়, কিন্তু চোখ রাখে জগতের দিকে, সর্বচক্ষু হয়ে সকলের দিকে। কেউ শোনে কেউ শোনে না। কেউ দেখে কেউ বা চোখ বুজে থাকে। সে কি আপনাকেও জানে? কে বলবে? শুধু আপনাতেই মেতে বেড়ায় আপনি। তৃণের মত তারার মত, দিকে দিকে প্রাণস্রোতের মত। যেখানে দিয়ে চলে যায় গলে যায় পথের পাথর, শুধু বলে যায় চলি-চলি। শ্যামল দেহে মাটি শিউরে ওঠে, লতার প্রার্থনা ফুলে-ফুলে ফুটি-ফুটি করে।

আকাশ বলে এস এস কানন বলে বসো বসো
সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে।

যখন গান গায়,—বনের হরিণ বড়-বড় চোখ তুলে কাছে এসে দাঁড়ায়, মেঘপঙক্তি নেমে আসতে চায় মাটিতে। একে-একে সাঁঝের তারা আর সকলকে ডেকে আনে, আসর জাঁকিয়ে বসে সেই গান শুনতে। নিজের স্বরে নিজে তো সে মাতেই, যে শোনে তাকেও মাতায়। যে শুনবে না-শুনবে না বলেও কান ফিরিয়ে নিতে চায়, ফিরিয়ে নিতে-নিতেই সে ঘুরে দাঁড়ায়, ফিরে আসে। এককণা কুড়িয়ে পেলেই সে পেতে চায় এক সমুদ্র। একটি অসতর্ক ফাঁক যদি খুলে রাখে জানলার, ভুবন-ভাসানো জ্যোৎস্না তারই ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়বে। এতটুকু একটু সঙ্কেত পেলেই পাঠাবে আকাশ-প্রসারী সম্ভাষণ।

তোরাই শুধু শুনলিনে রে
কোথায় বসে রইলি যে রে,
দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে
কেউ তাহারে দেখলি না তো চেয়ে।
গাইতে গাইতে বলে গেল
কতদূর সে চলে গেল
গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে
দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ মনে॥

দুয়ার খুলে দে এবার। দুয়ার খুলে বেরিয়ে যা তার সঙ্গী হয়ে। যদি

একবার তার মুখের দিকে তাকাতে পারিস, সুখে থাকতে পারবিনে আর ঘরের মধ্যে। ঘরকে তখুনি বাহির আর বাহিরকে তখুনি ঘর করে তুলবি। যে তোর পথের পথিক সেই তোর প্রাণের অতিথি হয়ে উঠবে। সেই পথের সাথিই তো তোর জীবন-সারথি, তোর জীবন-দেবতা। 'জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথি, পথে চলার লহো লহো লহো নমস্কার।' ওরে, তার সুরের সঙ্গে সুর মেলা। তার ভরা-নদীর অমল উচ্ছল জল, তার শস্য ক্ষেতের কাঁচা সোনার ঢেউ আর তোর বুকের উজাড়-করা আনন্দ একত্র করেছে। তার আশ্চর্য করা আনন্দের সঙ্গে তোর আশ্চর্য-হওয়া আনন্দ।

যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ রে চেয়ে গভীর সুখে
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে!

শাস্ত্র বললে, তিনি আছেন, শুধু এইটুকুর বেশি আর কিছু বলা যায় না! রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি শুধু 'আছেন' নয়, তার চেয়েও বেশি, তিনি 'আসেন'। 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, ওই যে আসে আসে আসে।' 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।' শুধু আমিই তাঁকে খুঁজছি না। তিনিও আমাকে খুঁজছেন। তাই তো এত সৃষ্টি, এত লীলা, এত পত্র-পত্রোত্তর।

কারোয়ারে কালানদী পেরিয়ে আসবার সময় একটি অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি দেখল রবীন্দ্রনাথ। উদার শুভ্রতা আর নিবিড় স্তব্ধতা দিয়ে তৈরি। শব্দহীন স্পর্শহীন স্পন্দহীন গভীরতা যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে চন্দ্রালোকে। সেই যোগযাদুমন্ত্র কানে এসে লাগল। জ্যোৎস্নাস্নানে সর্বাঙ্গ পুলকনিশ্চল হয়ে গেল। দেখলাম অগণন যাত্রী নিয়ে বিশ্ব ভেসে চলেছে মহাশূন্যে, সুনীল শূন্যে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে বা নাবিকের গান। কিন্তু আমি কোথায়? আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? সেই নিস্তরঙ্গ নিশীথে আমার মহান একাকীত্ব অনুভব করলাম। কিন্তু আমিও যাব, বসে থাকব না। আমিও অনন্তের যাত্রী, সমস্ত চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি পরম নির্বাণে ডুবে যাব, নিবে যাব, মিশে যাব অনন্তে। হে অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, আমাকে কোথায় ফেলে যাবে?

অনন্ত জীবন শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে,

বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

'সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'জগৎ প্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা হোক।'

একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্য নক্ষত্রের সাথে।
তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়॥

॥ নয় ॥

রবীন্দ্রনাথের বয়স সবে বাইশ, তার বিয়ে হল। বিয়ে হল খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর বড় মেয়ে ভবতারিণীর সঙ্গে। ভবতারিণীর বয়স তখন দশ-এগারো।

বারোশ নব্বুই সালের চব্বিশে অগ্রহায়ণে বিয়ে। ভবতারিণীর জন্মবর্ষ বারোশ আশি সাল।

সে যুগের মেয়ে। দশ পেরিয়ে গেলেই নিন্দে। বেণীমাধব মেয়ের কথা ভেবে উচাটন হয়ে উঠেছে। পাত্র কোথায়?

বেণীমাধব মহর্ষির এস্টেটের সাধারণ কর্মচারী। সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তার মেয়ে পড়বে?

মেয়েটির খবর নিয়ে এল আদ্যাসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথের মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা। দেখতে কেমন? সুন্দর। কুল-গোত্র? পিরালীঘর। লেখাপড়া? গাঁয়ের পাঠশালা শেষ করেছে। পরীক্ষাকেন্দ্র দূরে বলে পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। গ্রাম ছেড়ে অত দূরে পরীক্ষা দিতে গেলে যে নিন্দের কান পাতা যাবে না।

পরীক্ষা দিল না তো বাড়িতে বসে কী করে ?

খেলাঘর পেতে বাল্যসঙ্গিনীদের নিয়ে খেলা করে আর ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথকে প্রথম ভাগ পড়ায়।

মহর্ষি বললেন, ঐ মেয়েটিকেই চাই। কর্মচারী সদানন্দকে বললেন, কথা দিয়ে এস।

পিতৃবাক্যের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ লঙ্ঘন করল না। এই ঈশ্বরের বিধান, নম্রশিরে মেনে নিল।

কিন্তু বিয়ে দক্ষিণ ডিহিতে হবে না, কলকাতায় হবে। হবে ব্রাহ্মমতে, আদি সমাজের নিয়ম অনুসারে। বেণীমাধব রাজি তো ? জিজ্ঞেস করলেন মহর্ষি।

রাজি।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির ব্রহ্মোৎসব-দালানে বিয়ে হল। কন্যার ভবতারিণী নাম ঘুচে গিয়ে নতুন নামকরণ হল মৃণালিনী। রবির সঙ্গে মৃণালিনীরই বুঝি সঙ্গতি হয়। কিম্বা মৃণালিনীর মধ্যেই বুঝি মর্মের সেই অস্ফুটমর্মর নলিনী নামটি বেঁচে আছে : 'হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা'—বেঁচে আছে সেই ডাকার সুরটুকু।

সংসারের ছোট বউ। আদর করে রবীন্দ্রনাথ কখনো ডাকে ছুটকি, কখনো বা আরো সংক্ষেপে ছুটি।

'ভাই ছুটি,' চিঠি লিখছে রবীন্দ্রনাথ : 'মানুষের আত্মার চে‍ে সুন্দর আর কিছু নেই, যখনি তাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখা‍ি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয় তখনি যথার্থ ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোনো মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার কোন দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না—কিন্তু দূরে নিকটে সম্পদে বিপদে অভাবে এবং ঐশ্বর্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্য দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জনা এবং দুঃখ স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।'

এই রবীন্দ্রনাথের সেই 'ধরার সঙ্গিনী'। তার বৈষ্ণব-কবিতার ধরিত্রী-মূর্তি।

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?' পূর্বরাগ অনুরাগ মান-অভিমান অভিসার প্রেমলীলা মিলন-বিরহ সমস্তই কি বৃন্দাবনের? রতি-প্রীতি মাদন-মোদন কিছুই কি এই প্রাকৃত সংসারে নেই? নেই কি আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা? নেই কি অব্যর্থকালত্ব? হ্লাদিনী কি এই গৃহেই বিরাজ করছে না? কালিন্দীকূলে কদম্ব-মূলে চার চোখের চেয়ে দেখা কি শুধু দেবতার, শুধু রাধাকৃষ্ণের? সরম সম্ভ্রম-ভরা সেই চার চোখের প্রণয়-স্বপন কি কম অলৌকিক? যে ধরার মেয়ে বাম বাহু ধরে প্রথম এসে পাশে দাঁড়াল, হৃদয়ে মৌন ভালোবাসা নিয়ে, সেই কি মহাভাববতী রাধিকার ছায়া নয়? সেই কি নয় মূর্তিময়ী বৈষ্ণব-গীতিকা?

নইলে, বৈষ্ণব কবি, বলো কোথায় তুমি এই প্রেমচ্ছবি পেয়েছিলে, শিখেছিলে বিরহসন্তপ্ত প্রেমগান? কার দুটি চোখ দেখে রাধিকার সাশ্রুনেত্র মনে পড়েছিল? বলো সে কি তোমার সেই খেলার সঙ্গিনী মর্মের গেহিনী নয়? বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে কে তোমাকে দুটি বাহুডোরে বেঁধে হৃদয়ের অগাধ সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেছিল? বলো সে কি তোমার মর্তবাসিনী প্রতিবেশিনী নয়?

এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে? আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে? তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চির দিন?

রবীন্দ্রনাথে আগে মাটি পরে আকাশ, আগে ভোগ পরে ভক্তি, আগে প্রাকৃত পরে অপ্রাকৃত। বৈষ্ণব কবিতে শুধু দিব্যপ্রেম, রবীন্দ্রনাথে মর্তপ্রেমের দিব্যায়ন। বৈষ্ণব কবি একটি প্রাপ্ত তত্ত্বকে একটি মাত্র রূপকের সাহায্যে মূর্তিময় করেছেন—রবীন্দ্রনাথে কিছু প্রাপ্ত তত্ত্ব নেই, শুধু অপ্রাপ্তের সন্ধান, শুধু সৌন্দর্যপিপাসা। বৈষ্ণবে কোনো মালিন্য নেই ধূসরিমা নেই, শুধু ভোগাতীতে প্রেমের মহামহিম বিশুদ্ধতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই বিশুদ্ধতায় পৌঁছুবার আগে অনেক সংগ্রাম আছে তপস্যা আছে, অনেক স্খলন-পতন বিরোধ-ব্যবধান উত্তীর্ণ হওয়া আছে। বৈষ্ণব কবি ঈশ্বর থেকে সুরু করে ঈশ্বরেই থেকে

গিয়েছে, বিশ্বে নামতে পারে নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব থেকে সুরু করে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁচেছেন। ঈশ্বর থেকে বিশ্বকে বাদ দিয়ে নয়, সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরময় করে তুলে। রবীন্দ্রনাথ একদল ফুল নয়, সহস্রদল পদ্ম।

'আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে, দেখ। বাস্। একবার চেয়ে দেখ। আর কিছুই না।'

'তুমি কি ভাবছ চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি?' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড় এই গ্রহতারাচন্দ্রসূর্যখচিত প্রাণে-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারদিকে অহোরাত্র নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল—এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এত বড় জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে?'

স্পষ্ট করে দেখ, পূর্ণ করে দেখ, নির্মলচক্ষু হয়ে দেখ। আলোক যে প্রত্যহ প্রভাতে আমাদের চোখকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিচ্ছে—তা কেন? শুধু নির্মলনয়নে স্পষ্ট করে ব্যাপ্ত করে দেখবার জন্যে।

কাকে দেখব?

'কাকে দেখবে?' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না, তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীর্ত রূপের ধারা অনন্তকাল ধরে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা, কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাইনে, ভেবেও পাইনে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্ত রূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক সার্থক হবে।'

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য-তারা দলে দলে—
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগনতলে।

এই যে সেই, এই যে এই। এই যে কাছেই, চোখের সামনেই, পাশটিতে দাঁড়িয়ে।

'এই যে এষঃ, এই যে এই।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়ছে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠেছে, এই যে দুঃখ রূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরমকল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠেছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, অত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কশা মাঝে মাঝে আকাশে ঝলকে ঝলকে উঠছে—এই তো এষঃ, এই তো এই।'

যা কিছু কাছে এসেছে আছে, এনেছে তাঁরে প্রাণে
সবারে আমি নমি।
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে টেনেছে তাঁরি পানে
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি
মানি বা আমি নাহি বা মানি
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।

তবে এই যে ধরার সঙ্গিনী সেও সেই হ্লাদিনীসারভূতা জয়শ্রীরূপধারিণী রাধিকারই প্রতিচ্ছায়া।

বৈষ্ণব-কবিতার মূল কথা কী? তা জানতে হলে বৈষ্ণব-ধর্মের মূল তত্ত্বটি জানতে হবে।

সংক্ষেপে হলেও বিশদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ:

অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রেই ঈশ্বরের সঙ্গে বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ উপলব্ধি করবার

উপদেশ আছে। তিনি পিতা আমি পুত্র, অতএব তিনি আরাধ্য। তিনি সর্বশক্তিমান আমি সর্বশক্তিশূন্য অতএব তিনি আমার উপাস্য। তিনি মঙ্গল বিতরণ করছেন আর আমি তা আহরণ করছি অতএব তিনি আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন। ধর্মবুদ্ধির আরো নিম্নতন অবস্থায় তিনি ভীষণ, আমি ভীত, তিনি যথেচ্ছচারী দাতা আর আমি স্তুতিবাদক প্রার্থী।

বৈষ্ণবধর্মে এই বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক নেই। বৈষ্ণবধর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে একটি অহেতুক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। আমি তাঁকে কেন চাই তা আমি জানি না, তাঁকে নইলে আমার চলে না, পৃথিবীতে আর কিছুতেই আমার পরিতৃপ্তি নেই। সহস্র পার্থিব বন্ধনের মধ্যে বাস করেও তাঁর বিচিত্র ব্যাপার সত্ত্বেও সুখ খুঁজে পাচ্ছি না। তাই মাঝেমাঝে যখন তাঁর বাঁশি বেজে ওঠে তখন চিত্ত উতলা হয়ে পরিপূর্ণ প্রেম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য পরিপূর্ণ আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে গৃহত্যাগ করতে চায়।

এই যে অকারণ আকুলতা, অন্তর্নিহিত অনন্ত অসন্তোষ এ কে আনল? এর কি আবশ্যক ছিল?

না, কোনো আবশ্যকতার কথা নেই। রহস্য এই. আমি যেমন তাঁকে চাই তিনিও তেমনি আমাকে চান, আমাকে ছাড়া তাঁরও চলে না। তাই তিনি আমাকে এত করে আকর্ষণ করছেন। তাই বিশ্বজগতের সর্বত্র তাঁর বাঁশি আমারই নাম ধরে বেজে চলেছে। তাই আকাশ এত নীল, শরতের চাঁদ এত সুন্দর, বসন্তের পুষ্পবন এত মোহকর। তাই প্রিয়ার মুখে আমরা স্বর্গের আভাস দেখি, শিশুর হাসিতে আমাদের স্নেহের ঝরনা উছলে ওঠে। সমস্ত সুন্দর জিনিসই আমাকে আমার কাছ থেকে টানছে—আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে সেইখানেই আমার পরমবন্ধু হাসিমুখে বসে আছেন। আমি যাঁকেই ভালোবাসি না কেন, তাঁকেই ভালোবাসি। সর্বপ্রকার ভালোবাসার অর্থই ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা। এই জগতে আমার পক্ষে যা কিছু প্রিয় যা কিছু সুন্দর সেইখানে বসে ঈশ্বর আমাকে ডাকছেন—সেইখানেই তাঁতে-আমাতে মিল।

যেখানে তিনি অসীম আমি সসীম, যেখানে তিনি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, তিনি ঈশ্বর আমি দীন—সেখানে তাঁতে-আমাতে অনেক ব্যবধান, সেখানে কিছুতে তাঁর নাগাল পাবার সম্ভাবনা নেই। যেখানে তিনি আমারই জন্যে সুন্দর হয়ে, প্রিয় হয়ে পুত্র হয়ে বন্ধু হয়ে প্রেমিক হয়ে দেখা দিয়েছেন, সেইখানেই তিনি

আমার সমান হয়ে আমার প্রেমপাশে আপনাকে ধরা দিয়েছেন। সেইখানেই তিনি মথুরার রাজত্ব ছেড়ে বৃন্দাবনের রাখাল বালকের দলে বাঁশি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অন্তবাসনাশূন্তা অন্ততাৎপর্যহীনা ভালোবাসা। প্রেমপরিপ্লুতা অবিচ্ছিন্না মনোগতি। কোনো সুখের অভিসন্ধি নেই, কোনো প্রাপ্তির লালসা নেই। ভালোবাসার জন্তে ভালোবাসা। এ সমস্তই এক মর্ত-প্রতীক, সংসারমন্দিরের এক পরমা প্রতিমাকে আশ্রয় করে।

'সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না—'

কাকে যে ভালোবাসি কে জানে, আর কেনই বা ভালোবাসি তা কে বলবে? আর কোথায়ই বা তাকে ধরব?

মায়ার তরণী বেয়ে তুমি চলেছ মায়াপুরীর দিকে, স্বপ্নে ঢল-ঢল বিবশ-বিহ্বল দুটি চোখ মেলে। মনে হয় আমার পরাণ যা চায় তুমি তাই, তুমি তাই। তোমারই সুধাস্বরে জগতের গান বাজছে। আকাশে যে প্রভাতটি ঝলমল করছে সেটি তোমার চোখে লেখা। যে লাবণ্য অরণ্যে ঢেউ দিয়েছে সেটি আঁকা তোমার শরীরে। তোমাকে ভালোবাসি। তোমার দশদিগন্ত আদ্যোপান্ত ভালোবাসি। তোমার ঐ খেলা, তোমার ঐ গান, তোমার ঐ হাসির মধুরিমা। সীমার বাঁধনে বাঁধা অথচ তোমার সীমা কোথায়? কেন দূরে দাঁড়িয়ে আছ? কেন আসছ না কাছে? তুমি কি শুধু ভুবনে আছ, তুমি কি আমার ভবনে নেই? আমার ভবন কি ভুবন ছাড়া? আমার মন কি ভুবন ছাড়া? আমার এই ব্যাকুলতা কি বৃথা যাবে? তোমাকে ডেকে আনতে পারবে না, টেনে আনতে পারবে না?

কিন্তু তোমার কাছে কী চাই, তোমাতে আমার কিসের প্রয়োজন? সারা দেহ-মন ঘর-উঠোন সব কিছু বলছে, সুখ চাই। সুখের তরীতে করে ভাসতে চাই সুখের সরোবরে। তুলতে চাই সুখের পদ্মফুল। হায়, সুখ কথাটুকু বলতে বলতেই ফুরিয়ে যায় তার পরমায়ু। সংসারের রোদটুকু লাগল কি না লাগল, নিমেষে শুকিয়ে গেল সুখের সে শিশিরকণা, সে শিহর-শিশিরকণা। এরই জন্তে কি ভালোবেসেছিলাম? এরই জন্তে? সুখের সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকেও হারাতে?

ভালোবেসে দুখ সেও সুখ,
সুখ নাহি আপনাতে

আনো সজল বিমল প্রেম
ছলছল নলিন নয়নপাতে।

সজলবিমল প্রেম চাই, সুখ চাইনে। সুখ নেই-ই তো, চাইব কী। 'মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো।' যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে অনন্ত সুখ, শুধু-সুখ নয়। সে অনন্তসুখের নাম হচ্ছে ভূমা। যা গভীরতম দুঃখের গহনতম আনন্দ দিয়ে তৈরি। যা একাধারে বিশুদ্ধতম আলো, আবার নির্মলতম অন্ধকার। যা চেয়ে পাওয়া যায় না, চেয়ে-থেকে পাওয়া যায়। 'মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো।' যা নিয়ে পাওয়া যায় না, দিয়ে পাওয়া যায়।

এরই নাম প্রেম। সজলবিমল প্রেম। অকারণ অবারণ ভালোবাসা। অহেতুক কৃপার উত্তরে এই ভালোবাসাও অহেতুক, অকৈতব।

জনহীন বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলে, একা একা আপন সুরে আপনি নিমগ্ন হয়ে, দেখতে পেলুম তোমাকে। তোমার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু তোমার পথের ধারে একটি বাতি জ্বালিয়ে দিলুম। সেই মৃদুকম্পিত আলোটুকুই ভালোবাসা। কত লোক ভিড় করে আসছে তোমার দুয়ারে, কত কিছু ভিক্ষা চাইছে, কত কিছু অনুগ্রহ। তোমার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু বিনা-পণে দিয়ে দিলুম নিজেকে। দিয়ে দিলুম তোমার পায়ে। কিছু চাইব কিছু তুমি দেবে সে লজ্জা পাবার অবকাশ নিলুম না, ঢেলে দিলুম। 'আমি কিছুই চাইব না তো, রইব চেয়ে।' 'মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো।'

সুখ অনুসন্ধান না করার নামই সুখ।

এই তো অমলা ভক্তি। সর্বলাভার্পণ।

স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক, আমাদের সংসার-যাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক—এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার-পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি, সেখানে কোনোমতেই লাভ-ক্ষতি আত্মপরকে

ভোলবার যো নেই—সেখানে ছোটখাট বিষয়ের দ্বারা সর্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষকালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্রভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না।

বালিকা-বধূকে লরেটো হাউসে ভর্তি করে দিল রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত শেখবার জন্যে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে নিযুক্ত করল। সহধর্মিণীকে অন্বর্থ সহধর্মিণী করে তুলল। তাই লিখতে পারল স্ত্রীকে :

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥

কিন্তু ঈশ্বর তো স্বর্গের কোনো নিভৃত প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে নেই। তিনি তো এই ধুলোর সংসারেই সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে রয়েছেন। তাই সংসারকে ছেড়ে গেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে কী করে? যে জাহাজে করে চলেছি যাত্রী হয়ে সে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে জল সাঁতরে কি বন্দরের দেখা পাব? এই জাহাজে করেই যেতে হবে ভাসতে ভাসতে, আর-সকলের সুখ-দুঃখের সরিক হয়ে, খণ্ডের মধ্যে অনন্তকে দেখে-ছুঁয়ে। সে অনন্ত বাসা নিয়েছে মানুষের মর্ত্তনুর অণুতে-অণুতে। মানুষের মুখই ঈশ্বরের প্রতিলিপি। মানুষের অঙ্গই তাঁর রঙ্গলীলা। তাই কী করে মানুষের হাত ছেড়ে দেব, সরে যাব পাশ কাটিয়ে? মানুষকে ছুঁয়েই তো ঈশ্বরকে ছোঁয়া। মানুষকে ভালোবেসেই তো ঈশ্বরকে আস্বাদ করা। নিজের অন্তরের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করি কী করে? শুধু মানুষকে ভালোবেসে। অন্তরের মধ্যে অনন্তের অনুভবের নামই ভালোবাসা।

চলো দিবালোকে চলো লোকালয়ে
চলো জনকোলাহলে,
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।

ধর্ম? শুধু ধর্ম? ধর্ম তো নিশ্চয়ই কিন্তু শুধু ধর্ম নয়, মানুষের ধর্ম। মানুষ শুধু জীবযন্ত্র নয়, নয় শুধু একটা তরল তামাসা। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিভূ, ঈশ্বরের প্রতিভাস। এই ভাবটি দেহ-মনে ধারণ করা ও জীবনে উদ্ধৃত করে দেখানোর নামই ধর্ম।

তুমি কি শুনেছ বসি, হে বিধাতা, হে অনাদি কবি
বিশাল মানব-প্রাণ মোর মাঝে বর্তমান।

শুধু প্রাণ—চারদিকে প্রাণের উত্তাল সমুদ্র। 'প্রাণ দিয়ে যে ভরেছে বুক, সেই তার সুখ।'

॥ দশ ॥

কড়ি ও কোমলে এসে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। মানুষকে বাদ দিয়ে, কেটে-ছেঁটে সরিয়ে-তাড়িয়ে ছোট করে রেখে বাঁচতে পারব না। সে বাঁচায় সুখ নেই সম্পূর্ণতা নেই। সুখ বা সম্পূর্ণতা কিসে? মানুষ যেখানে অমর, যেখানে অমিতজীবী, সেখানে বেঁচে। কোথায় মানুষ মৃত্যুহীন, কোথায় মহিমময়? মানুষ মৃত্যুহীন ঈশ্বরে, মহিমময় ঈশ্বরে। সেই সর্বলোকের মহামানব, অতিমানব যে ঈশ্বর, তাতেই মানুষকে বিধৌত হতে হবে, বিভাসিত হতে হবে। সেই প্রকাশ-বাসগৃহেই থাকব আমি মানুষের প্রতিবেশী হয়ে।

বিধাতার বৃহৎ পরিহাস হয়ে নয়, বিধাতার বিরাট প্রতিভাস হয়ে। সেই মহত্তম প্রতিশ্রুতিকে পরিপালন করে যাব। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যাব প্রেমে, আনন্দে—আর, আনন্দই তো ভূমা। প্রেমই তো মৃত্যুহীন।

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে।
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে॥

তারই জন্যে তো এই ঘোষণা: মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। 'যেন গো রচিতে পারি অমর-আলয়।' অমর-আলয় রচনা করবার জন্যেই এই পৃথিবীতে আসা, মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা।

মানুষ তো শুধু বাইরে নয়, মানুষ যে আবার অন্তরের মধ্যে। 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।' 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী, তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।' 'হৃদয় মন্দিরে প্রাণাধীশ আছ গোপনে।' 'মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে। পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে, নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥'

সে যে মনের মানুষ কেন তারে
বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে।

ডাক না রে তোর বুকের ভিতর
নয়ন ভাসুক নয়নধারে ॥

এই মনের মানুষকেই বাইরের মানুষের মধ্যে এনে দেখা। সেই দেখার মধ্য দিয়ে বাঁচা, মানুষের মধ্যে বাঁচা। তাকেই বাউল বলছে, 'মনের মানুষ এই মানুষে আছে, লও চিনে। তারে দেখ রে মন জ্ঞান-নয়নে।' কিংবা—

'ঘরে মানুষ, বাইরে মানুষ, ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই মানুষ
আমি খুঁজে পাইনে মনের মানুষ,
হল কি জ্বালা,
সে শোনে সকলের কথা, অন্যে ডাকলে হয় কালা ॥'

রবীন্দ্রনাথেরও সেই কথা :

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে।
আছে সে নয়নতারায়
আলোকধারায়, তাই না হারায়,
তাই দেখি তায় যেথায়-সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।

'সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই কথা উপনিষদেরও কথা। যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো, অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।'

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।

ব্যক্তিক অর্থেই বা কেন আমি চাইব মরতে? যিনি এই ভুবনকে সুন্দর করে রচনা করেছেন, সেই ভুবনকে যদি ত্যাগ করি তবে তো সেই ভুবনসুন্দরকে ত্যাগ করা হবে। দুটি চক্ষু মেলে অপরূপকেই তো দেখতে এসেছি রূপে-রূপে। কেন সাধ করে চোখ বুজব, মুখ ফিরিয়ে নেব? কেন বিরাগে বিরামে বঞ্চিত করব নিজেকে? প্রকৃতির লাবণ্যলেখায় তাঁরই পত্রটি উদ্‌ঘাটিত। কেন আমি সে পত্রটি ছত্রে-ছত্রে পড়ে নেব না? আমার প্রতিদিনের চলার মধ্যে কেন খুঁজে পাব না শাশ্বতী গতির আনন্দ? ক্ষণিকের মুঠির মধ্যে কেন পাব না অনন্তের অমিয়? পত্র যদি পড়তে নাও পারি তবু শুধু পত্র পাবার আনন্দেই

কেন স্পন্দিত-কম্পিত হব না? পত্র যে আমি পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট, এই আমার অশেষ।

দে পড়ে দে আমায় তোরা
কী কথা আজ লিখেছে সে,
তার দূরের বাণীর পরশমাণিক
লাগুক আমার প্রাণে এসে।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের আত্মসমর্পণ। কিংবা বিশ্বজীবনে প্রসারণ ব্যক্তিজীবনের। সেই সমর্পণটি প্রেমে, প্রসারণ সৌন্দর্যে। কোনো দায় নেই বাধ্যতা নেই, সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, না-ভালোবেসে থাকবে কী করে, যাবে কোথায়? যদি মহাজন হয়ে খাজনা আদায় করতে আসতেন, হয়তো পালাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ যে মহামানব হয়ে প্রেম আদায় করতে এসেছেন সুন্দরের থালায়! ধরা না দিয়ে করি কী। ধরা না দিলে তো আমিই ঠকব, আমিই পারব না ধরতে। সেই ঠকা সেই না-ধরাই তো মৃত্যু। আমার দিন-রাত্রির সকল নিমেষ যে অশেষের ধনে ভরা আছে এই অনুভবটি যদি না আসে সেই তো দৈন্য। আর সেই দীনতাই তো মৃত্যু।

আমি মরব না, চাই না মরতে। আর দৈহিক মৃত্যু যদি হয়ও, সে পরম প্রকাশরূপে দেখা দিক। প্রকাশের মন্ত্র আর কিছুই নয়, আমি মরেও মরি না। দেহাতীত দেহ হয়ে অম্লান আলোক-শিখায় জ্বলি অত্যুচ্চের সৌধচূড়ে। সৌন্দর্যের স্বর্ণপ্রদীপ হয়ে।

'সংসার জীবনময়, নাহি হেথা মরণের স্থান।'

আমার তাই নিবৃত্তি নেই, সমাপ্তি নেই, নেই নির্বাপণ। আমি অনিঃশেষ প্রাণ, অনির্বাণ শিখা, অফুরন্ত পথ-চলা।

তুমিও যে চিরনূতন, নিত্যনূতন। তোমার যে পুরোনো প্রাচীন ধরণী, হয়েছে শ্যামলবরণী। আশ্চর্য, কত যুগ যুগ ধরে আছ অথচ এতটুকুও পুরোনো হওনি, অভ্যস্ত হওনি। যেখানে শ্মশানের ধূলি স্তূপীকৃত হয়ে আছে সেখানেই ফোটাচ্ছ অতসী-আকন্দ। বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে একটি দৈববাণীর মতই এনেছ নীলমণি ফুলকে। তার কণ্ঠস্বরের নির্মলতার এতটুকুও হানি হয় নি। এতদিনকার আকাশ, মনে হয় আজকের তৈরি, এই এক্ষুনি ঘষা-মাজা শেষ হল। সেই কবে একটি তারার কণা জ্বালিয়ে রেখেছ এক কোণে, আজও অম্লান চোখে চেয়ে আছে। নীলকান্তমণির পেয়ালাটি উপুড় করে কত সুধা ঢাললে, কত

সোনার রোদ আর কত রুপার জ্যোৎস্না, এতটুকু কম পড়ল না হিসেবে, টান পড়ল না ভাঁড়ারে।

ঝরা পাতার শব্দের দেশে চলে এল নবপল্লবের কোলাহল। কোথা থেকে নিবিড়শ্যামল মেঘ করে এল, কেতকীর গন্ধে স্নান করে উদাসী মন উড়ে চলল বিস্মৃত বিরহের চিহ্ন খুঁজতে। কিছুই মরে না, শুধু নতুনের রূপ ধরে আসে, নতুনের আলো জ্বেলে চেয়ে থাকে। তুমি তো পুরোনোকে বিদায় দাও না, তার প্রাণের মধ্যে তোমার বাঁশিটি বাজিয়ে দাও নতুন করে। তেমনি আমাকেও তুমি নতুন করো, নতুন রাখো। আমার পুরোনো দেহের কুহরে ভরে দাও তোমার নবনবীনের নিশ্বাস, তোমার প্রতপ্ত প্রাণের সুর। অপরিমেয়তার সুর। হে লোচনলোভন, আমাকেও তোমার মত সহজশোভন করো। আমি নইলে তোমাকে দেখবে কে, ধরবে কে, তোমার জন্যে কাঁদবে কে, তোমাকে নিয়ে ভরে উঠবে কে ?

> তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে।
> আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে।
> এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
> ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
> পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে॥

আর সকলের শেষ আছে তোমার-আমার শেষ নেই। অভাবের শেষ আছে ভাবের শেষ নেই। বাঁধা-বরাদ্দের শেষ আছে, উপরি-পাওনার শেষ নেই। পৃথিবীর শেষ আছে আকাশের শেষ নেই।

নতুন হবা'র সাধনাই তোমাকে পাবার-সাধনা। তুমি যেমন অক্ষয় আমিও তেমনি ক্ষণে-ক্ষণে জন্ম লাভ করে অক্ষয় হব।

যেদিন রবীন্দ্রনাথের বিয়ে সেদিনই সংসারে মৃত্যুর ম্লানচ্ছায়া। খবর এল, শিলাইদহে সারদাপ্রসাদ মারা গেছে। সারদাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই মহর্ষির প্রথম শোক। এই সেই শোক যার ফলে মহর্ষি লোকালয় ছাড়লেন, ছাড়লেন তাঁর সংসারনীড়, তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িঘর।

মৃত্যুর আচ্ছাদনের নিচে নববধূর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখচন্দ্রিকা হল। তার দাম্পত্য-স্বপ্নেও তিনি রাখলেন ঈশ্বরকে।

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্বচরাচরে
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ-গীত করিছে রচনা
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

'দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো, প্রভু, তুমি থাকো। দুজনে যাহারা চলেছে তাদের তুমি বাখো, প্রভু, সাথে রাখো।'

স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'ভাই ছুটি, আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে কোনো খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়—আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখদুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে—তা ছাড়া অনন্ত নক্ষত্রলোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়সার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দেখতেও পাওয়া যায় না।'

তারপর, এবার, দূর থেকে নয়, মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করল স্পষ্ট চোখের উপর। সেই ছেলেবেলায় কবে মা'র মৃত্যু দেখছিল, সে বিষণ্ণ স্মরণ-চ্ছায়ার পাশ কাটিয়ে কবে চলে এসেছে। সে কেমন একটা ঝাপসা-ঝাপসা চোখ, পরিচ্ছন্ন বেদনার রক্তাক্ত দহনরেখা নয়। কিন্তু এবার যে গেল সে হৃদয়ের নিভৃত দেশের মানুষ, মনোরমা সুখাবহা বহুলানুরাগরসিকা—এক কথায়, জীবনের পরিপূর্ণ নির্ভর। গেল, যেন শাখায়-শিকড়ে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মাত্র দুই বছরের বড়। কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি, ন বছরের সেই বউ এসেছিল বাড়িতে, চতুর্দোলায় চড়ে, মায়ার দেশের আনকোরা নতুন মানুষটি। কত দুপুর-সন্ধে কেটেছে তার প্রশ্রয়ে ও স্নেহে, গানে, কবিতায়, দাবাখেলায়, শুলপো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে কাঁচা আম খাবার মজলিশে। গলায় পলার হার, নবকৈশোরের মেয়ে, রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম পূজার ফুল। তার খেলার সাথি, গল্পের সঙ্গী, কবিতার সহচরী। কল্পনার কাঞ্চনমালা। 'তোমাকে দিলাম' বলে যাকে উৎসর্গ করেছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—সেই মধুরতম তুমি। বিলেতে গিয়ে যাকে সব চেয়ে বেশি মনে পড়ত। যার স্নেহভরা স্থির চোখ দুটিকে মনে হত আকাশের ধ্রুবতারা।

জীবনের মাধবী মদিরা সেই কাদম্বরী সহসা আত্মহত্যা করল। মৃত্যু এসে দাঁড়াল সুপ্রত্যক্ষের মত।

চারদিকে সব ঠিক আছে, শুধু সে নেই। যে এতদিন নিশ্চিতরূপে নিবিড়-রূপে নিগূঢ়রূপে বর্তমান ছিল তার কোথাও আর চিহ্ন নেই লেশমাত্র। এত যে সামনে ছিল কেমন করে সে চলে গেল আড়ালে? সহস্র স্পর্শের মধ্যে যে এত স্পষ্ট ছিল সে কী করে মিলিয়ে গেল স্বপ্ন হয়ে? এই থাকা আর না-থাকা, এর মধ্যে মিল কোথায়? যা এখনো আছে এবং যা একেবারেই নেই, এর মধ্যেই বা কোথায় সামঞ্জস্য?

তুমি কোথায় গেলে? কোন নতুন কবির দেশে? এখানে অপার দাক্ষিণ্যভরা দুটি চোখে আমার কবিতা শুনতে। এখন কার কবিতা শুনছ? সে নবীন কবির নাম কি?

তুমি কোথায়? সে যে অনন্ত অজানা দেশ, আর তুমি যে সেখানে একেবারে একা। তুমি কী করে পথ খুঁজে পাবে? কে আলো দেখাবে তোমাকে? তুমি নিতান্তই স্নেহের পুতুল, সহসা সে অসীম শূন্যে গিয়ে কার মুখের দিকে তাকাবে? আমরা কেউ রইব না আশে-পাশে, আমাদের কথা আর শুনবে না তুমি। তোমার কাছে আর পৌঁছুবে না আমাদের ভালোবাসা। শূন্যের দিকে তাকিয়ে আমরা কাঁদব, ডাকব তোমাকে তোমার হারা-নামে। সেই মহাবিজনে শুনবে না কি এই বিলাপমন্ত্র?

চির দিন তরে হবে পর
এ ঘর রবে না তব ঘর।

যারা ওই কোলে যেত তারাও পরের মত
বারেক ফিরেও নাহি চাবে,
হায় কোথা যাবে!

মৃত্যু যেন দিগন্তশেষের যবনিকাটা একটু ফাঁক করে দেখাল, আরো এক জগৎ আছে। অনবচ্ছিন্ন জীবনের আরো এক পরিচ্ছেদ। সমাপ্তিহীন যাত্রার হঠাৎ একটি পথের বাঁক। ক্ষণকম্পিত অন্তরাল—এ ঘর আর ও ঘর—একটিমাত্র দুয়ারের ব্যবধান।

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়। জয় অজানার জয়।'

মৃত্যু ক্ষতি নয়, মৃত্যু এক অপরূপ প্রাপ্তি। জীবনের নতুন অমৃতায়ন। চলে যাওয়া নয়, ফিরে আসা। শোক হয়ে আসা, শুচিতা হয়ে আসা।

কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক ভাগবতী দীপ্তি। ভাগবতী শান্তি।

'আমাকে চিনতে পারো না?' নির্জনে বনের ছায়াতে হঠাৎ কে কথা কয়ে উঠল।

'মনে পড়ছে কিন্তু ঠিক নামটি জানা নেই।'

'আমি তোমার সেই অনেক কালের সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।'

যাকে সেদিন শ্রাবণমেঘের মত কালো দেখিয়েছিল আজ তাকে দেখাচ্ছে সোনার প্রতিমা। এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি। সে বললে, 'যা ছিল শোক তাই আজ শান্তি।'

প্রাণলক্ষ্মীই মৃত্যুর ছদ্মবেশ পরে মুখে কালো ঘোমটা টেনে দেখা দেয়। কালো ঘোমটা খুলে নিলে দেখা যাবে প্রাণলক্ষ্মীই তার চিরপরিচিত মুখশ্রীতে প্রসন্ন হয়ে আছে।

বিধাতার পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ কর যবে ভোগ।
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা, যা কিছু অক্ষয়॥

মৃত্যু শুধু ছায়া ফেলে, গ্রাস করতে পারে না। জড়ের কবলে জীবনের পরাভব নেই। মৃত্যু শুধু ঈশ্বরকে দেখবার নিভৃত বাতায়ন। তাঁকে দেখলেই জীবনমৃত্যু এক হয়ে গেল।

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,

তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।

এখানে যা সন্ধ্যা ওখানে তা ভোর। এখানে যদি দরজায় আগল পড়ল ওখানে দরজা গেল খুলে। এখানে নৌকো যদি ঘাটে বাঁধা ওখানে হাওয়ায় তা পাল-তোলা। এখানে যা অন্ধকারে রজনীগন্ধা ওখানে তা সোনার রৌদ্রে কনকচম্পক।

এ ঘর আর ও ঘর।

মৃত্যুর ডাক শুধু বাসা-বদলের ডাক। শ্রান্তির দেশ থেকে শান্তির দেশে বেড়িয়ে আসা। জীবনকে জীবনের পথে আরো খনিকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবার ছাড়পত্র।

তাই মৃত্যুর পরে জীবনের জয়জয়কার। মৃত্যুর ছায়া তাই জীবনের সমীরণে উড়ে যায়। ভুলতে পারে বলেই তো জীবন চলতে পারে সমুখে। প্রবেশ-প্রস্থান আছে বলেই তো জীবনের নাটক এত জমজমাট। ঢেউ আসে আর চলে যায়, চলে যায় আর আসে বলেই জীবনের প্রবাহটি অমলিন।

মিছে শোক মিছে এই বিলাপ কাতর।
সমুখে রয়েছে পড়ে যুগ যুগান্তর।

শিশুকে স্তন হতে স্তনান্তরে নিয়ে যাচ্ছে জননী। উদয়শিখর আর অস্তশিখর—এই সূর্যের পরিক্রমা। সূর্য কি আর ওঠে, না ডোবে? সূর্য ঠিকই থাকে, আমাদেরই দেখবার দিক-ভুল। জীবন একই থাকে, আমরা শুধু দু-টুকরো করে দেখি।

তাই তাকে যেতে দাও। পূর্ণ দিনের সোনার অর্ঘ্যটি রেখে সে চলে যাক। নিঃস্ব দিনের নিষ্ঠুর রিক্ততার মধ্যে তাকে লজ্জা পেতে দিও না।

গাছটিকে দেখ। যেমনি প্রাণের উৎসাহ তার অসীম তেমনি তার মৃত্যুর উৎসাহও অফুরন্ত। যেমন করে যাওয়া তেমনি করে আবার ভরে ওঠা। একদিকে রিক্ততা আরেকদিকে সম্পৎশ্রী। দেওয়া আর পাওয়ার খেলা খেলছে অবিরাম। ফেলে দেওয়া আর ফিরে পাওয়ার খেলা। একবার জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে আর একবার ফিরে পাচ্ছে নবীনকান্তির লাবণ্য। যে মৃত্যু এমনি করে বারে বারে প্রাণের অক্ষরে চিহ্নিত হচ্ছে সেই মৃত্যুর সঙ্গে আমার চেনা হোক।

মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

সেই চতুর্দোলায় চড়া নববধূ জ্যোতিষ্কের আলোছায়ায় পথভোলা হয়ে ফিরছে পথে-পথে। তার গলায় ফুলমালা থেকে একটি পাপড়িও স্খলিত হয় নি।

জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে কাদম্বরী মিশে গেল জীবনদেবতায়। তারপর আবার রবীন্দ্রনাথের জীবনে ফিরে এল।

আবার সেই কথা: জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

যে সর্বভূতের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখে সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কী, আর শোকই বা কী।

লেশমাত্র শূন্য কোথাও নেই, মৃত্যুও তাই কোনো বিচ্ছেদ নয়। অমৃত যেমন ঈশ্বরের ছায়া মৃত্যুও তেমনি ঈশ্বরের ছায়া।' সমস্তই এক প্রাণ-ওঙ্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়, সমস্ত প্রাণস্পন্দিত, কোথাও রন্ধ্র নেই অন্ত নেই অবকাশ নেই। সমস্ত কিছু প্রাণ থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে, কম্পিতও হচ্ছে প্রাণের মধ্যে। মৃত্যুও সেই প্রাণেরই উদ্‌ঘাটন।

তাই শুধু প্রাণকে প্রণাম। যে প্রাণ আসছে তাকে প্রণাম, যে প্রাণ চলে যাচ্ছে তাকে প্রণাম। যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা পরে আসবে তাও প্রাণের মধ্যে রয়েছে। যে প্রাণ ক্রন্দন করছে তাকে প্রণাম। যে প্রাণ গর্জন করছে তাকে প্রণাম। যে প্রাণ বিদ্যুতে উদ্দীপ্ত হচ্ছে তাকে প্রণাম। যে প্রাণ বর্ষায় বিগলিত হচ্ছে তাকে প্রণাম। এই বিরাট প্রাণ-সমুদ্র ঈশ্বর। জীবন আর মৃত্যু সে সমুদ্রের দুটি ঢেউ। 'তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে। কুসুম ঝরিয়া যায় কুসুম ফুটে।' জীবন আর মৃত্যু প্রাণপ্রতিমার দু'হাতের দুটি সোনার বলয়।

বিষাদের মেঘ উড়ে গেল, দূরে গেল বৈরাগ্যের সুর। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আবিষ্কার করল, আমার যৌবন-স্বপ্নে ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ। 'অমর কবি মিলটনের নবীন দেবমূর্তি দেখেছ?' তরুণ দীনেশ সেনকে লিখছে তরুণ বন্ধু কবি দীনেশ বসু: 'সেদিন আমি দেখলাম ঠাকুরবাড়ির প্রকাণ্ড পুরীর দোতলার সিঁড়ির মুখে। তার নাম রবি ঠাকুর। দেহছন্দ দীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখ নাক চোখ ভ্রূ নিখুঁত তুলিতে আঁকা। গুচ্ছ গুচ্ছ ক'টি কেশতরঙ্গ কাঁধের উপর এসে পড়েছে। হালের ফ্যাশান না মেনে দীর্ঘ কেশ রেখেছেন,

তাঁকে সাহসী পুরুষ বলতে হবে। পরনে ধুতি। কিন্তু মনে হচ্ছিল গৈরিক বসন পরলেই যেন বেশি মানাত। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে। কিন্তু স্বভাবটি স্থির। স্বর, কোমল মধুস্যন্দী। একটি গান শোনাতে বললাম। এতটুকু সাধতে হল না। বনবিহঙ্গের মত মুক্তকণ্ঠে গান ধরলেন: 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না—'

'আজকাল আমি বিকেলে সন্ধ্যার দিকে ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি।' লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'পূর্বদিকে যখন ফিরি একরকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-একরকম দেখতে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপর যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে, আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারি সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা, একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে। চোখ চেয়ে রাস্তা ধরে গেলেই হল, নানারকম বুদ্ধিপূর্বক শর্টকাট খোঁজবার দরকার দেখিনে; সুখ-দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে, কোনো রাস্তা দিয়ে তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই, কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।'

॥ এগারো ॥

কোথা রাত্রি কোথা দিন কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা
কে বা আসে, কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা
কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা!

রবীন্দ্রনাথের মনে জাগল নতুন জিজ্ঞাসা। অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকাল, তুমি কে? কে তুমি অনন্ত মহা-অস্তিত্ব? খণ্ডকালের খেলাঘরে এত যে সব ক্ষণিকের আয়োজন, সমস্ত মিলিয়ে সে কি এক মহাশূন্য? এত যে জনস্রোত, এত যে কলকোলাহল, তার যোগফল কি এক মহামৌন নিঃসঙ্গ সমুদ্র? এত যে আলোর কণিকা তার সমাহার কি এক নিশ্ছিদ্রনিশ্চল অন্ধকার?

কেন তুমি তমোভূত নিরাশ্রয়ের মত একাকী বসে আছ? কেন তুমি এত নির্মম, এত উদাসীন? আমাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার প্রতি কেন তোমার এই বিশ্বব্যাপিনী উপেক্ষা? কেন তুমি এত স্তব্ধ এত বধির? এত নির্বিকার? কেন তোমার কিছুতেই কিছু এসে যায় না? তবে তুমি কেন চিরবিরহীর মত চিররাত্রি জেগে আছ? বিশেষ্যও নেই বিশেষণও নেই, তুমি কে? কী বলতে চাও?

বলতে চাও, আমাদের এত যে সব ক্ষণকালের সমারোহ, সমস্ত মায়া, অসার-অবস্তু? 'তুমি শুধু একা আছো, আর সব আছে আর নাই?' 'প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়ে?' 'বাঁশি শুনে চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার?' খণ্ড আর কী, খণ্ড অখণ্ডেরই ছায়া, ক্ষণকাল মহাকালেরই পলকপতন। অখণ্ড যদি সত্য হয়, খণ্ডও সত্য। মহাকাল যদি শাশ্বত হয় তবে এই ক্ষণকালের মধ্যেই রয়েছে নিত্যতার সুর।

জগৎ, যা চলছে, আর সত্য যা স্থির হয়ে আছে। চলাটা শুধু স্থির হবার জন্যে। না চললে যে স্থৈর্যে উপনীত হওয়া যায় না। না শব্দ করলে যে আসে না স্তব্ধতা। যদি স্থৈর্য ও স্তব্ধতা সত্য হয়, তবে এই জগৎ যা শুধু গতি আর কোলাহল দিয়ে ভরা, এই জগৎও সত্য। ছত্রে-ছত্রে সত্য।

না বাঁচলে মরে কী করে? মৃত্যু সত্য হবে আর প্রাণ সত্য হবে না? শুধু অন্তিমাই সত্য, প্রথমা সত্য নয়? প্রথমা থেকে অন্তিমা, জীবনের সমস্ত মুহূর্ত-প্রতিমাই প্রাণের প্রিয়তমা। অনিত্যের বুকে অসীমেরই হৃৎস্পন্দন। প্রতিটি নিমেষ যে অশেষেরই পক্ষছায়া।

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।

সুখ, যায়, কিন্তু স্মৃতি থাকে। সুখ ক্ষণকালের স্মৃতি অনন্তের। আবিভাব ক্ষণকালের উপস্থিতি সর্বব্যাপিনী।

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখি
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঞ্চয়িতায় কড়ি-ও-কোমলের 'চিরদিন' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যেহেতু তাঁর মতে এটি কবিতা হয় নি, তত্ত্বকথা হয়েছে।

এইটেই বড কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু ঋষি নন, তিনি ঋষির চেয়েও বেশি। তিনি কবি। তিনি সর্বানুভূ।

কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফারের বয়সের গাছ-পাথর নেই। এ তো রবীন্দ্রনাথেরই কথা।

দুখানি মেঘ ভেসে আসছে দুদিক থেকে। চতুর্থীর চাঁদের আলোয় তাকাল পরস্পরের দিকে। চেনা-চেনা, তবুও যেন কোথাও অচেনার ধূসরতা। মনে হয় কোথায় যেন দেখেছি অথচ আরো যেন দেখবার বাকি রয়ে গিয়েছে। অনেক আসা-যাওয়া হয়েছে, হয়নি মিশে-যাওয়া। এবার মিশে যাই এস, কিন্তু, হায়, তবুও যেন থেকে যায় ব্যবধান।

মেলে দোঁহে তবুও মেলে না,
তিলেক বিরহ রহে মাঝে
চেনা বলে মিলিবারে চায়
অচেনা বলিয়া মরে লাজে।

চেনার জন্যে মিশতে চাওয়া, আবার অচেনার জন্যে ভেসে পড়া। 'দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা।' স্পর্শ করতে দাও কিন্তু রেখো না বন্দী করে। কুসুমের কারাগার থেকে মুক্তি দাও বাতাসকে। তাকে সুরভিত হতে দাও, সঙ্গে-সঙ্গে দাও প্রবাহিত হতে।

দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।

কেন, কেন এই মোহ, যখন ও আর থাকে না, 'যখন মিলিয়ে যায় ও মায়া হায়!' যদি একদিন ছিন্ন হয়েই যাবে বাহুডোর, তবে কেন ঐ বাহুডোরেই ধরা দেবার ব্যাকুলতা ? যদি একদিন ও দুটি কালো চোখ মদিরায় উচ্ছল হয়ে উঠবে না তখন কেন ঐ কালো চোখের উদ্দেশেই প্রাণ এমন ধাবমান ? যদি কথায়-কথায় এত লজ্জা, নিমেষে-নিমেষে এত অপ্রকাশ, তবে কেনই বা এই উন্মোচনের পিপাসা ? সবই যদি ছায়া, সবই যদি 'আজ হাতে তুলে নিলে ফেলে দেবে কাল,' তবে কেন এই তৃপ্তিহীন আকূতি ?

তাই বলি, ওকে ছুঁয়ো না, তোমার স্থূলস্পর্শে ম্লান কোরো না ওকে। হৃদয়ের ফুলকে ফেলো না পথের ধুলোয়। যে প্রদীপ আলো দেবে তাতে ফেলো না তোমার বিষাক্ত নিশ্বাস। প্রেমের প্রদীপে বাসনার নিশ্বাস। দেখ ওই 'লাজহীনা পবিত্রতা'। বসন ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ নিরাবরণ

নীলিমার মত, শ্যামলিমার মত। বসন এককোণে পড়ে রয়েছে আর তারই এক কোণে মুখ ঢেকেছে অতনু। লজ্জায় মুখ ঢেকেছে। এ যে স্পর্শের জিনিস নয়, পূজার জিনিস।

চকিতের মত পাশ দিয়ে চলে গেলে, তোমার আঁচলের প্রান্তটুকু গায়ে লাগল। সর্বাঙ্গের কানে-কানে কথা বলে গেল তোমার সর্বাঙ্গের নিশ্বাস। কিন্তু তোমার হৃদয়টুকু তোমার সর্বাঙ্গের কোন অতল সমুদ্রে লুকিয়ে রেখেছ? কী করে সেই রত্নরাজ্য উদ্ধার করি? চিরদিন তাই তীরে বসে কাঁদছি কী করে দেহের দেহলি পেরিয়ে পাব কবে তোমার নির্জনতম হৃদয়।

কত আর সেতু বাঁধব মর্তের সঙ্গে স্বর্গের, ধরার সঙ্গে অধরার? শরীরীর সঙ্গে অশরীরীর? তাই মনে হয় এ অন্বেষণ ছেড়ে চলে আসি সহজের বেড়া-দেওয়া সংসার-আবাসের মধ্যে। হে স্বপ্নসঞ্চারিণী, তোমাকে ধরতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। কিন্তু আমার সীমাসুষমাময়ী সংসার-প্রতিমাকে সহজে ধরতে-ছুঁতে পেরেছি। আমার সমস্ত লজ্জা সমস্ত তুচ্ছতা সে ঢেকে দিয়েছে। কোথায় আমার অনাদর, কোথায় বা অগৌরব তার হিসেব রাখেনি। নলিনীকে কে পায়, কাদম্বরীকে কে পায়, মৃণালিনীই সংশয়হীন শান্তি। গভীর তৃপ্তিময়ী আকাঙ্ক্ষা। তাই কী হবে শুধু অধরা-মাধুরীর সন্ধানে, ধুলিরুক্ষ বাস্তবভূমিতেই ঘর বাঁধি চলো।

সখি, কুসুমশয়ন ছেড়ে উঠে এস। পায়ের নিচে বাজুক এবার কঠিন মাটি, কণ্টককঙ্কর। আকাশকুসুমের কাননে বসে কত আর স্বপ্নচয়ন করবে? চলো দুই জনে এই বিরল বিরাম ছেড়ে মানুষের আবাসে সমাজের দুর্গকক্ষে, সমভাগী-দের প্রতিবেশিতায়।

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়।

কিন্তু তোমাকে নিয়ে ঘর বেঁধে আবার সেই প্রশ্ন, এ কি শুধু দরশ-পরশের খেলা? শুধু একটা রঙিন খেলনা কি তুমি, শুধু একতাল বাসনার সোনা? অমনি মন উঠল হাহাকার করে।

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি,

এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

পূর্ণ মিলন হবার নয় ঈশ্বর ছাড়া। তরুণ তনুখানি চুরি করে কেড়ে নাও, বেঁধে নাও বুকের মধ্যে। লজ্জা নাও বস্ত্র নাও, সর্ব আবরণ হরণ করো। চক্ষু হতে ঘুম নাও, সূর্য হতে দীপ্তি নাও, লুপ্ত হয়ে যাক চরাচর। শুধু তুমি আর আমি। বাধা নেই ব্যবধান নেই, তবু হায়, মিলন পূর্ণ হবার নয় ঈশ্বর ছাড়া। দুয়ের মাঝখানে ঈশ্বর এসে না বসলে হবে না সেতুবন্ধ।

লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে॥

এত অতৃপ্তি এত আবেগ এত অনুভব, রাশীকৃত কথায় প্রকাশিত করতে চাইছি দিনরাত। এত কথা এত কান্না, তবু যেন শেষ কথাটি আজও বলা হল না। হবেও না কোনো দিন। প্রত্যেক মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে কান পেতে রয়েছে সেই শেষ কথাটি শোনবার জন্যে। এখনো সে কথাটি শোনা হয় নি বলে ঘরে ফিরে যেতে পারছে না, ফিরে গিয়ে বন্ধ করতে পারছে না দরজা। এত কথা এত কান্না, তবু হায় শেষ কথাটি কী, শেষ কথাটি কোথায়!

মনে হয় কি একটা শেষ কথা আছে
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়
কল্পনা কাঁদিয়া ফেরে তারি পাছে পাছে
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী -
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।

আপন হৃদয়গহ্বরের দুয়ারে, কান পেতে বসে আছি। কোন গুহাহিত গোপনবাসীর গোপন কথাটি শোনবার জন্যে। নিভৃত নীল একটি পদ্মের জন্যে ভ্রমর সেখানে উন্মনা, নিঃসঙ্গ অন্ধকার রাতের একটি বিবাগী পাখি উন্মুখর। কে সে কে জানে। আভাসে-অনুমানে কখনো বা একটু তাকে দেখি, কখনো

যা দেখি না। বুঝতে চাইলে বুঝি না কিছুই। সে কে? সেই কি আমার অশেষ কথার শেষ কথা?

হায়, 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?'

কথার শেষ নাই যেহেতু আমারও শেষ নেই। 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব। ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।'

শেষ নেই, শেষ নেই। তৃষ্ণার শেষ নেই তৃপ্তিরও শেষ নেই। আলোক হয়ে দেখা দেয় শেষে জ্বলে আগুন হয়ে। জীবনে ফুল ফোটে মরণে ফল হয়ে ওঠবার জন্যে। আবার ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে ফুল। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপের সংক্রমণ। মৃত্যু বিদীর্ণ করে আবার অমৃত-উৎসার, আবার জীবন-চারণ।

যেখানে শেষ বলে রেখা টানি সেখানেই আবার আরম্ভ। এবং আরম্ভেরই বা আগে কী? প্রদীপের আগে সলতে পাকানো, কিন্তু সলতে পাকানোর আগে?

'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!' এ বাঁশি নিরন্তর বেজে চলেছে। কিন্তু কে যে ডাকছে তাই কেউ বলতে পারে না। তার ঠিকানা কারু জানা নেই।

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে,
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে।

অশেষই শেষে বিশেষ হয়েছে আমার মধ্যে। সকলের মধ্যে। বিশেষই আবার বিচিত্র হয়েছে। নানা অস্তিত্বের ভগ্নরেখা। সমস্ত ভগ্নরেখা একত্র হয়ে অনন্ত বৃত্ত। প্রত্যেকে একাকী হয়েও সেই অনন্ত বৃত্তে সকলে এক-পরিবার।

কড়ি-ও-কোমলের রবীন্দ্রনাথের বয়েস পঁচিশ কিন্তু ঐ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে উঠল: 'অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পুরিল না।' কী করে মিটবে? আমার যে আরোর পিপাসা, সুখের চেয়েও আরো যে সুখ, সেই সুখের। আমার ঘুচল না দীনবেশ, মুছল না অশ্রুরেখা। গভীর প্রাণের যে ক্ষুধা তা এখনো তার শেষ সুধা শেষ নিবৃত্তির সন্ধান পেল না। কত অজস্র তোমার ঢেলেদেওয়া। ঢেলে-দেওয়া আলো, ঢেলে-দেওয়া হাওয়া, ঢেলে-দেওয়া নীলাম্বর। এতই যখন দিয়েছ, দিতে পেরেছ, তখন আরো তোমাকে দিতে হবে, নিঃশেষ করে দিতে হবে। তা না হলে আমি মানব না, শুনব না। পেতে-পেতে এত এগিয়ে এসেছি, এখন আমি তোমাকেই পেতে চাই।

তোমাকে পাবার জন্যেই তো এত পাওয়া। তোমাকে পরিপূর্ণ আস্বাদ করবার জন্যই তো এত টুকরো টুকরো স্পর্শ। নিজেকে তুমি নিঃশেষে ঢেলে দেবে বলেই তোমার এত দেওয়ার দেয়ালি।

'কেন রে তোর দু হাত পাতা, দান তো না চাই, চাইলে দাতা। সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি।'

আমার যা কিছু আছে সমস্ত তোমাকে দিতে পারি না বলেই তোমাকে পাই না। দিতে পারি না আমার লোকলজ্জা আমার ভয়ভীতি আমার মান-অপমান আমার সুখ-দুঃখ ভাবনা-কল্পনা। অথচ আমার যা রয়েছে তাই রেখেই বা আমার কী সুখ। যা নিজের বলে রেখেছি তাই তো তোমাকে দূরে রেখেছে। 'কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে রবি। সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি।' যদি সব দিয়ে ফেললে অতি সহজেই তোমাকে পাওয়া যায়, তবে সব জেনেও তোমাকে সব দিতে পারি না কেন? 'তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না। আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমারে নেব, বাসনা।'

যুবক রবীন্দ্রনাথ আবার লিখল: 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে-নয়নে।' নয়নের সম্মুখে তুমি নেই, নেই বা থাকলে, তুমি আছ নয়নের মাঝখানে চক্ষুর চক্ষু হয়ে। রবীন্দ্রনাথ পরে যা একদিন বলবে তা এখুনি বলে রাখল।

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাহি আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার
কাল পারাবার করিতেছ পার
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি
যত জানি তত জানিনে॥

উনিশশো চৌদ্দ সালে পুজোর ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ উত্তরপ্রদেশের দিকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, ঘুরতে-ঘুরতে এসে উঠলেন সত্যপ্রসাদের বাড়িতে, তাঁর ভাগ্নে, বাল্যবন্ধু। সত্যপ্রসাদের এলবামে দেখলেন কাদম্বরীর ছবি। শুধু ছবি? না, চিত্রিতা চিরায়িতা, রবীন্দ্রবিশ্বের বাণী মূর্তিমতী। সহসা সমস্ত কাব্যভাবনা মুক্তবন্ধ আনন্দের ছন্দে অসীমের অভিমুখে প্রধাবিত হল।

'তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?' আশ্চর্য, যে তোমাকে ভুলে আছে সেও তোমাকেই ছুঁয়ে আছে। 'তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে, তাই ভুল।' নিশ্বাস যে ফেলেছি তাই তো ভুলে আছি প্রতি নিশ্বাসে। দিনের আলোতেও ভুলে থাকি আকাশে অতন্দ্র সূর্য জ্বলছে নিঃসঙ্গ। জীবনদেবতাকে ভুলেও তো এ জীবন চলে যাচ্ছে। সমস্ত ভুলের শূন্যতাও সেই মহৎ অস্তিত্বের আশীর্বাদ দিয়ে ভরা। 'ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা। বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।' সতর্ক সাবধানে থাকি, তোমার নামটি বলি না, কিন্তু যে নামটিই হৃদয়ের বল-বিশ্বাস-সৌন্দর্য-মাধুর্য-আর্তি ও আন্তরিকতা ঢেলে ডাকি, সেটিই তোমার নাম। নিশ্বাস কি জানে সে কি করছে? তবু সে অগোচরে প্রাণকে তপ্ত করে রেখেছে, স্বাদু করে রেখেছে, গীতঝঙ্কৃত করে রেখেছে। কী করে আমি দেখি, যদি তুমি না দেখাও, কী করে আমি লিখি যদি আমার অন্তরে তুমি কবি হয়ে না বিরাজ করো।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, নাহি কেহ জানে
তব সুর বাজে মোর গানে
কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি। নও শুধু ছবি।

কড়ি-ও-কোমল থেকে রবীন্দ্রনাথ চলে এল মানসীতে। যে ছিল শরীরী সেই হল মানসী, সেই পরে জীবনদেবতা। বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বপ্রকাশিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী। মূর্তিমতী মর্মের কামনা।

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।

ভালোবাসা মানেই তো সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করা। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের মৌনকে শোনা। অভাবকঠিন মলিন মাটিতে স্বর্গের একটি ফুলের বাগান তৈরি করা। ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার স্বাদ নেওয়া। ভূমিতে থেকেই ভূমায় আরোহণ করা। মানসীই তো ঈশ্বরের প্রথম প্রতিমা।

রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে এসেছে, সঙ্গে চৌদ্দবছরের স্ত্রী ও একবছরের মেয়ে, বেলা।

দার্জিলিঙ মনে একটি গভীর বিষাদের সুর এনে দিয়েছে, ধূসর একটি ঔদাস্যের লাবণ্য। দুটি হাতে দুটি হাত রেখে ক্ষুধার্ত চোখে তোমার চোখের অতলে তাকিয়ে আছি, তুমি কোথায়? ভৃঙ্গারে যে অমৃত লুকোনো ছিল সে কোথায় লুকোলো? প্রেমের মধ্যে কেন এই কামনার আর্তনাদ? আকাঙ্ক্ষার নীরাজনা? তুমি কি শুধু দেহ, না, আত্মার রহস্যশিখা? তুমি যদি আত্মারই রহস্যশিখা, কেন আবার তবে তুমি বিবাসিনী বাসনার বহ্নি?

'তোমারে কোথায় পাব, তাই এ ক্রন্দন।' 'অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে। অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে।'

একটা সমগ্র মানুষ তো অনন্তেরই অবতার। তাকে কী করে পাবে? পেতে হলে যে অনন্ত প্রেম দরকার তা কি তোমার আছে? তুমি তো নিজেই ভীত কাতর দুর্বল, তোমার কী অসম্ভব দুঃসাহস এই অসীম জগৎ-জনতায় তুমি চিরদিনরাত্রি তার চিরসহচর হয়ে থাকতে পারবে? তুমি শুধু হাসিটুকু কথাটুকু নয়নের দৃষ্টিটুকু নিয়েই তৃপ্ত থাকো। বেশি চেয়ো না, 'চেয়ো না তাহারে। আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।'

হৃদয়ের ধন কি কখনো দেহে ধরা যায়? অথচ দেহের ভাণ্ড ছাড়া কোথায়ই বা রাখবে তোমার হৃদয়ের ধন? বাস্তবের ভূমিতে কি প্রেম ফোটে? অথচ মর্তসীমা ছাড়া কোথায়ই বা খুঁজবে এই প্রেম? তাই একদিকে তীব্র আসক্তি অন্যদিকে প্রগাঢ় ঔদাস্য। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিষ্ফলতার, বেদনার সঙ্গে বৈরাগ্যের রাখীবন্ধন। একদিকে সংশয়ের আবেগ, সর্বগ্রাসী চোখ মেলে চেয়ে থাকা, অন্য দিকে বিচ্ছেদের শান্তি, 'আমি রহি একধারে, তুমি যাও পরপারে,

মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি।' একদিকে 'মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে', অন্য দিকে, 'সেই ভালো, তবে তুমি যাও।' একবার 'তুমি ঈশ্বরের তরে,' আরেকবার 'দেবতারে ভেঙে-ভেঙে করেছি খেলনা।'

কিন্তু যত ব্যথা তত প্রেম। যত বৈরাগ্য তত অনুরাগ।

তাই সেদিনের সেই দ্বন্দ্ব অপূর্ব প্রার্থনায় বিগলিত হতে চাইল, 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।' মাঝখানে কিছু রেখো না ব্যবধান, রেখো না তন্তুমাত্র আবরণ। সজনে-বিজনে নয়নে-অনয়নে সর্বকালে সর্বস্থানে তোমাকে যেন দেখতে পাই। তুমি আমার দারিদ্র্যভঞ্জন করো। দৃষ্টির দারিদ্র্য, স্পর্শের দারিদ্র্য, চিত্তের দারিদ্র্য।

হে প্রেয়সী, তোমার-আমার বিরহ যেদিন ঘুচবে সেদিন আমাদের দুজনের মাঝখানে ঈশ্বরকে এনে বসাব। সেদিন আমি দেখব তুমি অফুরন্ত, তুমি দেখবে আমিও বিনিঃশেষ।

সুরদাসেরও সেই প্রার্থনা :

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

॥ বারো ॥

রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন যাই লিখুন যাই করুন যাই দেখুন, সমস্তই ঈশ্বরভূমিতে দাঁড়িয়ে। যখন তিনি ভক্ত, শরণাগত, তখন তিনি স্পষ্ট করে ঈশ্বরকে উচ্চারিত করেছেন আর যখন তিনি কবি শিল্পী তখন তিনি ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করেছেন, গুহাহিত করেছেন, রেখেছেন অনুভবের গভীরে। ঈশ্বর ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রেম নেই। 'তোমা ছাড়া কেহ কারে, বুঝিতে পারিনে ভালো কি বাসিতে পারে।' তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমের কবিতা যেমন ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায় তেমনি নিয়ে যাওয়া যায় প্রেয়সীতে। অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায় যেহেতু প্রেয়সী তো 'অসীমের দূতী', ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া। 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে।' আর ঈশ্বরের কবিতাও নিয়ে যাওয়া যায়

প্রেয়সীতে। 'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি। কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনি।' আর প্রকৃতি তো ঈশ্বরেরই প্রেমপত্র। যখনই দেখেছেন প্রকৃতিকে, অপরূপকে দেখেছেন, তার মাঝে পরমাত্মীয় আপন জনটিকে খুঁজেছেন।

'কান পেতেছি চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি—
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।'
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

রবীন্দ্রনাথ যে লোকে-লোকে মানুষে-মানুষে আয়ত, বিস্তৃত, সে মানুষও তাঁর কাছে ঈশ্বরের প্রতিভূ। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সকলে তাঁর অবতার, তুমি নতুন লীলা কী দেখাবে, তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।' মানুষ শুধু জীবিকার বৃত্তিতেই বাঁধা নয়, তার মধ্যে রয়েছে অনন্ত উদ্বৃত্তি। সেই মহিমাময় মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, সে কৃষক হোক, শ্রমিক হোক, হোক বা গ্রাম্য বাউল। সার্থক সাধকের মত কখনো বলেছেন, আমিই সেই, 'দেখি তারে যে পুরুষ তোমার-আমার মাঝে এক।' আবার কখনো বলেছেন, 'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে।' কিংবা 'নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে, তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?'

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনাও ভাগবতী চেতনা। ঈশ্বরই তো পরম বৈজ্ঞানিক। নিজের ইচ্ছায় নিজের কৃপায় একটু-একটুকরে রহস্য উন্মোচন করছেন, আমরা বিজ্ঞানে অগ্রসর হচ্ছি, আবার আরেক রহস্যে বস্তুসংসারকে আবৃত করে আমাদের বিস্ময় বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বরই তো পরমতম বিস্ময়। পরমতম আবিষ্কারের বস্তু। সৃষ্টি নিছক একটা আকস্মিকতা নয়। যা আকস্মিক তা এত বিচিত্র এত বহুল এত জটিল এত বিপুল হতে পারে না। বৈচিত্র্য আর ঐশ্বর্যই স্রষ্টার লক্ষণ। আর শিল্পকর্মে যে আনন্দ তাও স্রষ্টারই আনন্দ। যন্ত্রে আনন্দ কই? তাই চারদিকে তাকিয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে তাকিয়ে, সহজেই বোঝা যায় একজন বিশ্বকর্মা আছেন, বিচিত্র তাঁর সৃষ্টিলীলা, বিচিত্র তাঁর আনন্দরূপ।

'একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবিমাত্র।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই। আমি বিচিত্রের দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।'

'হে পরমাত্মন', প্রার্থনা করছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করে আমাদের সচেতন করো। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানা দেশে নানা কালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হোক, অশ্রদ্ধা দূর হোক, অহংকার দূর হোক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল-সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমার সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি।'

দার্জিলিঙ থেকে রবীন্দ্রনাথ চলে এল গাজিপুরে, গঙ্গার কাছাকাছি এক বাংলোতে এসে উঠল। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ছে গঙ্গায়, 'বৈশাখের নীলধারা ক্ষীণগঙ্গা সৈকত শয়নে'—চরে ফলন হয়েছে, সর্ষের যবের ছোলার। বাড়ির সামনে মাঠের পশ্চিম কোণে এক মহানিম গাছ শ্যামচ্ছায়ায় রাশীভূত হয়ে আছে, প্রান্তরের শেষ ঘেঁসে আম গাছের সারি। 'কোমল সায়াহ্নে লেখা বিষণ্ণ উদার, প্রান্তরের প্রান্ত আম-বনে।' গোলকচাঁপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসছে—কোন সঙ্গীতের সরস্বতী বিশ্বের বুকের কাছে বসে শুনছে সেই সুধাস্বর, নিখিলের উদ্বেলিত মর্মবাণী। গুণ-টানা নৌকা চলেছে মন্থর ছন্দে, মাঝি নিজের মনে গেয়ে চলেছে বৃন্দাবনের গান। কই তোমার চিঠি কই? একা-একা দূর দেশে পড়ে আছি, কই তোমার সম্ভাষণ? মাঠ-জল-আকাশ-পর্বত কালো করে সন্ধ্যা নামল, তারা ফুটল বিন্দু বিন্দু। বলো, ঐ কি তোমার চিঠি, কানে-কানে-বলা তোমার মৃদু কণ্ঠের গুঞ্জরন? হ্যাঁ, ঐ আমার চিঠি। 'প্রতি রাতে লিখে রাখি জ্যোতি পত্র-লেখা।'

ঝড়ে পড়ে পুরীর স্টিমার ডুবেছে। সেই ঝড় সেই ফেনিল কুটিল সমুদ্র, মজ্জমান তরণী—সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, আর দেখতে পাচ্ছে, 'দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।' 'তাই আজ বারবার ধাই তব পানে, ওহে তুমি নিখিলনির্ভর।' মানুষের হৃদয়ে স্নেহ দিলে, প্রিয়জন দিয়ে ঘর সাজালে, প্রাণের ধনকে আবার কেড়ে নিলে বুকের থেকে, তুমি কে? ফুলের মত একটুখানি মুখ, ছোট-ছোট দুখানি হাত, অধরে চকিত ক্ষণিক হাসি, কিন্তু কী অপরিসীম তার শক্তি! তাকে ছাড়া এ বিশ্বচরাচর জলছায়াহীন

খাদ্যনিদ্রাহীন মরুভূমি—কে তুমি হৃদয়ের ধনকে এই অসামান্য মূল্য দিলে? তাকে অকালে হরণ করে নিতে পারো বলেই কি তার এত মূল্য? কেন নাও হরণ করে? তুমি কি শুধু শুষ্ক নিয়ম? যদি শুধু নিয়মই হবে তবে কেন এই স্নেহধারা, করুণার শিশিরসিঞ্চন?

'এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে, প্রেম এল কোথা হতে মানবের প্রাণে?'

এ প্রেম তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। 'তুমি আছ মোর জীবন-মরণ হরণ করি।' যাকে ভালোবাসি, তোমাকেই ভালোবাসি। তুমিই তো সকলের হৃদয় অধিকার করে বসে আছ। তোমাকে ছাড়া বিশ্বে আমার তিলমাত্র ঠাঁই নেই। তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার প্রকৃতি, তুমিই আমার পূজা। আমার প্রেমে তুমি আছ বলে সমস্ত নিখিলের সুখ দুঃখ প্রীতি, সমস্ত বিরহ-মিলন-পরিপূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছে। 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।' এ ভালোবাসায় তুমি না থাকলে শুধু যুগল দেহেই আবদ্ধ থাকতাম, যুগে যুগে জন্মে জন্মে ভেসে যেতে পারতাম না, দুটি প্রাণেই শুধু খেলা চলত কোটি মানুষের প্রাণকে পারতাম না স্পর্শ করতে। 'আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে।' শুধু তুমি আর আমি। শাশ্বত লীলা-নাট্যের দুই কুশীলব। আমার সকল আরম্ভের তুমিই আরম্ভ, সকল শেষের তুমিই শেষ।

আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখির মতো। কত দিন থেকে, কতদূর থেকে আসছে, সেই কথাটির জন্যে আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। উচ্চারণ করল আজ সেই কথাটি—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল।

নিমেষে সমস্ত জীবন ও জগৎকে যে সত্য করে তোলে সেই ভালোবাসা কে বাসে? কাকে বাসে?

'মানসীতে' 'মায়া' নামে একটি কবিতা আছে। 'পেলেও যেমন না পেলে তেমন, শুধু থাকে হাহাকার।' হৃদয়বেদনা ছায়ার মতন ছায়ার পিছনে ফিরছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, তবু বেদনার নিবৃত্তি হচ্ছে না। এ বেদনা কার জন্যে?

কত দেখাশোনা কত আনাগোনা
চারিদিকে অবিরত—
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত।

সেই পরম একের জন্যই ব্যথা। সেই পরম একের সঙ্গে মিলতে পারলেই ব্যথা আর ব্যথা থাকবে না, 'ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে।'

গাজিপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ লিখলে 'মায়ার খেলা'। প্রথম অভিনয় হল বেথুন কলেজে, শিল্পমেলায়। মেয়েরাই অভিনেত্রী আর অভিনয়ও মেয়েদেরই উপস্থিতিতে। সে যুগে সে একটা বড ঘটনা।

সুখের জন্যে প্রেম নয়, প্রেমের জন্যে প্রেম। আর এ প্রেম কখন এসে কার পথ জুড়ে দাঁড়ায় কেউ বলতে পারে না। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' কিন্তু কোথায় সে যে তোমাকে ধরবে বলে উৎসুক হয়ে আছে, কিংবা তুমিই ধরা দেবে বলে তাকে খুঁজে বেডাচ্ছ? সে কি দূরে, না কি সে কাছে? সে কি বাইরে বিশ্বে না কি তোমার অন্তরের গহনে?

কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনেব মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে।
মনের মতো সেই তো হবে
শুভখনে যাহার পানে চাও।

শুধু একটি দৃষ্টি দিয়েই তাকে চিনে নেওয়া। যে অন্তবে বিরাজ করছে সেই বাইরে বিশ্বে বিহার করছে। শুধু একবার মনের মতন ক'রে তাকে দেখা একটি করুণাস্নাত আলোকিত মুহূর্তে।

যত খেলা সংসারে সব আমার সঙ্গে তোমার। যত ঢেউ তুলছে দিকে-দিকে সবই তোমার খেলার ঢেউ। আমিও এই খেলাতেই আমার দিনরাত্রির তরী ভাসিয়ে দিয়েছি তোমার দিকে।

না হয় ডুবে গেলই, না-হয় গেলই বা,
না হয় তুলে লও গো, না-হয় ফেলই বা।
হে অজানা মরি মরি, উদ্দেশে এই খেলা করি
এই খেলাতেই আপন মনে ধন্য মানি।

পশ্চিমের শহর ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ আবার চলে এসেছে বাঙলায়, নদী ও মাঠের মাঝখানে, গ্রামের শ্যামল-স্নেহল পরিবেশে। থাকছে ঘাটে-বাঁধা

নৌকোর। পৃথিবীকে অসীম সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, আর নিজেকে মনে হচ্ছে অসীম নিঃসঙ্গ।

এই নদীতেই রবীন্দ্রনাথ দেখল সোনার তরীকে।

ক্ষুরধারা খরপরশা ভরা নদী হচ্ছে সংসার, জীবলোক। একখানি ছোট খেত হচ্ছে মানুষের সীমিত জীবন। ধান হচ্ছে কর্ম, কীর্তি—কর্মের আনন্দ, কীর্তির মহিমা। গর্জমান মেঘ ও ঘন বরষা হচ্ছে মৃত্যু। তরুছায়া মসীমাখা ওপারের গ্রাম হচ্ছে পরলোক। আর মাঝি? মাঝি হচ্ছে মহাকাল। কিংবা আর যা কিছু নাম দাও। 'ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি।' কিংবা বলো 'লীলার কর্ণধার।'

ওগো আমার লীলার কর্ণধার
জীবনতরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় কর পার।

সৌন্দর্য আর প্রেম, বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবলোক—দুইই রবীন্দ্রনাথে একীকৃত হল। বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হল কবিপ্রাণ, ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে বিশ্বচেতনা। জগৎ আর জীবন, দুই চলেছে হাত-ধরাধরি করে, দুই নিবিড় সত্য হয়ে পারপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করল। দুইই পরস্পরপ্রবিষ্ট, দুইই সমগ্রসুন্দর। পরম-অপরূপের এই দুইটিই রূপচক্ষু। এই দুই চক্ষুতেই তার পরিপূর্ণ দৃষ্টির প্রসাদ।

এই সামঞ্জস্যে পৌঁছুবার আগে রবীন্দ্রনাথকে অন্তরে বাহিরে অনেক ছুটোছুটি করতে হয়েছে। শোলাপুর গেল, সেখান থেকে পুনা। মহর্ষি ডাকিয়ে আনলেন কলকাতা, পাঠিয়ে দিলেন গ্রাম-বাঙলায়, জমিদারি দেখতে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে চলে এল বোলপুর, সেখান থেকে আবার কোলাপুর, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সেখান থেকে কী খেয়াল হল, চলে গেল বিলেত। সেখানে মাস তিনেক কাটিয়ে আবার প্রত্যাবর্তন। কেন গেল কেন ফিরে এল নিজেও জানে না। কী এক অজানা অস্থিরতা বিধিবদ্ধতার শান্ত গৃহকোণে বন্দী করে রাখতে পারছে না কবিকে। যেন কী এক সুদূরের পিপাসা বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। এ দুরন্ত সাধ কার জন্যে, কার জন্যে 'শৃঙ্খলছেঁড়া সৃষ্টিছাড়া এ ব্যথা?'

আমি এসেছি নিমেষে, যাইব নিমেষ বই
আমি আমারে চিনিনে, তোমারে জানিনে—
আমার আলয় কই?

বিলেত থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ আবার চলল উত্তরবঙ্গে, জমিদারির তদারকিতে। প্রথম কালিগ্রামে, তিনদিন লাগল পৌছুতে। একটা বড় নদী, তারপরে একটা ছোট নদী, দু ধারে গাছপালা, ক্রমেই নদী সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, তারপর নিতান্ত খালের মত, তারপরে হঠাৎ দেখা গেল এক জায়গায় ভয়ানক তোড়ে জল বেরিয়ে আসছে নদীতে—জন কুড়ি লোক মিলে জমিদারের নৌকো টেনে নিয়ে এল বিলের মধ্যে—সেই বিলের থেকেই জল নদীতে এসে পড়ছে। আর ঐ বিলই চলনবিল, তারই কাছাকাছি নাগর নদীর পারে পতিসর কাছারি। বিলে জল অল্প, মাঝে মাঝে নৌকো ঠেকে যায় মাটিতে, তখন তাকে ঠেলাঠেলি করে জলে ভাসাতে দেড ঘণ্টার ওয়াস্তা। তারপর কী ভয়ঙ্কর মশা!

'মোদ্দা কথাটা, এই বিলটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। তারপর মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী, মাঝে মাঝে বিল। এমনি করে তো এসে পৌঁচেছি। আবার এই রাস্তা দিয়ে যে বিরাহিমপুর যেতে হবে সেটা আমার কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না।' মৃণালিনীকে লিখছে রবীন্দ্রনাথ: 'নিতান্ত অসহ্য হলে এখান থেকেই কলকাতায় পালাব। আমার মিষ্টি বেলুরাণুর চিঠি পেয়ে তখনি বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যে তার আবার মন কেমন করে—তার তো ঐ একটুখানি মন, তার আবার কি হবে? কাল রাত্তিরে খোকাকে স্বপ্ন দেখেছি—তাকে যেন আমি কোলে নিয়ে চটকাচ্ছি, বেশ লাগছে।'

একটী গৃহাসক্ত স্নেহপরবশ আবেগপ্রবণ সংসারী মানুষ—কিন্তু তারপর?

কে তুমি দিয়েছ সেই মানবহৃদয়ে
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন,
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন?

এ স্নেহ যেমন তোমার স্পর্শ এ নির্মমতাও তোমারই আলিঙ্গন। তোমার থেকে যা নিয়েছি তাই আবার তোমাকেই ফিরিয়ে দেব।

রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।

এ জীবন যেমন এক তীর্থ, মৃত্যুও তেমনি আরেক তীর্থ। জীবনেই জীবনের

শেষ নয়, দেহান্তে আছে আবার আরেক আলয়-আশ্রয়, আরেক সন্ধান-যাত্রা, আরেক প্রেমস্রোত।

এখন মন্দিরে তব এসেছি হে নাথ
নির্জন চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমর্পিব। তারপর—
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর।

আর জীবনের চেয়েও ভালোবাসা বেশি বলে, বিশ্বাস যে জীবন চলে গেলেও ভালোবাসা থেকে যাবে। তেল ফুরুলেই দীপ নেবে কিন্তু জীবন ফুরুলেও ভালোবাসা নেবে না।

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মত। জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

সর্বত্রই এই পরিচিত মহান অজানার মৌন সম্ভাষণ।

পতিসরের কাছারিতে বসে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজ করছে—এ আবার এক নতুন রবীন্দ্রনাথ। কাছারিতে বসেছে চৌকির উপর, সামনে প্রজারা সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করছে, পাশে আমলারাও বিনীত ভঙ্গিতে করজোড়ে দাঁড়িয়ে, যেন তাদের উপর কর্তৃত্ব করবার জন্যে কে এক মহাপরাক্রান্ত অতিমানুষ উপস্থিত হয়েছে। তার একটু সামান্য ইঙ্গিতেই যেন অস্তি-নাস্তি ঘটে যেতে পারে। সে যে তাদের মতই একজন সামান্য মানুষ, তাদের চেয়েও নিরীহতর, এ যেন কিছুতেই তাদের বুঝতে দেওয়া নয়।

'আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভান করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে। অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখ-কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর। এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এঁদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। আমাকে

এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোস পরে থাকতে হয়।'

সর্বত্রই বুঝি এই মুখোসের আড়ম্বর। ভয়ের মুখোস, হিংসার মুখোস, নাস্তিকতার মুখোস। এই মুখোসের অন্তরালেই রয়েছে অনিন্দ্যসুন্দরের মুখ।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

আর মৃত্যু? 'মৃত্যু সে তো পথিকেরে ডাক।'

এ আবার আরেক রবীন্দ্রনাথ। শুধু মানুষ রবীন্দ্রনাথ নয়, মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ। আবার এটুকুর মধ্যেই সমস্তখানি নেই। সম্পূর্ণ মানুষ যে অমিতচারী অমিতজীবী মানুষ, বিরাটতমের নিকটতম প্রতিবেশী।

আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।

কিংবা

নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

যখন যে ভাবের মধ্যেই থাকুন, বারে বারেই জানান দিয়েছেন তাঁর ঈশ্বরকে, রাজাধিরাজকে, তাঁর অস্তিত্বের সারথিকে, যাকে কখনো বা বলেছে গোপন-বিহারী, অন্ধকারের স্বামী, কখনো শুধু অন্তরের ধন, কখনো বা প্রাণের ঠাকুর। কখনো বা পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!

বারে বারেই বলতে হয়েছে—'পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়। পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।'

'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন: 'যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন জীবনের ক্ষেতটুকুর তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন মানুষের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার স॰৷ত্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে, তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে

আমার হবে কী ? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

'পরশ পাথর' কী বলছে ? বলছে, 'ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।' যা সামান্য বলে তুচ্ছ বলে ফেলে দিয়েছি তার মধ্যে স্পর্শমণিটিও ছিল। অসতর্কতায়, অন্যমনস্কতায় তাকে চিনতে পারিনি। তার তো কোনো স্বতন্ত্র সমারোহ ছিল না, ছিল না কোনো চোখ-ঝলসানো আলো, সে অভ্যাসের স্রোতেই নিরীহের মত স্তিমিতের মত চলে এসেছিল, ধুলোকাঁকরের মধ্যে ছিল বলে তাকেও ধুলোকাঁকরই ভেবেছি। চক্ষুষ্মান ছিলাম না তাই বুঝতে পারিনি ইশারা, উৎকর্ণ ছিলাম না তাই শুনতে পাইনি সম্ভাষণ। প্রতিদিনের মধ্যেই যে চিরদিনের আবির্ভাব, পরিচিতের মধ্যেই যে অপবিমিততার আয়তন, এ কোনোদিন হিসেবের মধ্যেই আনিনি। এখন তাই তো দেখছি, মুহূর্তের নুড়ির স্তূপের মধ্যে আমার অনন্তের স্পর্শমণি হারিয়ে গিয়েছে।

'দুই পাখী,' বনের পাখি আর খাঁচার পাখি। আকাশ আর নীড়। ভূমি আর ভূমা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। দুই পাখি পরস্পর বন্ধু। একশক্তি টানে আরেক শক্তি আটকায়। এক স্বর ডাকে আরেক স্বর ঘুম পাড়ায়। এক পাখি ফল খায় আরেক পাখি দেখে।

দুই পাখিকেই চাই। বনের পাখিকে খাঁচায় পোরো, তারপর খাঁচার পাখিকে দাও বনে উড়িয়ে।

নইলে দেখ না 'আকাশের চাঁদ' ধরতে কোথায় গেল লোকটা ? ঘরে তার সব কিছু আছে, আলো হাসি গান স্নেহ, কিন্তু কী তার অদ্ভুত প্রার্থনা, বলে, আকাশের চাঁদ চাই। চারদিকের এত যে সব কিছু এ আকাশের চাঁদ নয় ? সে ওসব বোঝে না, বলে 'শশী চাই করতলে।' জগতে-জীবনে যে সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা চলেছে তাতে তার আকর্ষণ নেই, সে পথে বেরিয়ে পড়েছে, এসে দাঁড়িয়েছে শুষ্কতায়, কৃচ্ছ্রে, অস্বীকৃতিতে। রুদ্ধেন্দ্রিয় তপশ্চর্যায়। কিন্তু শশী কই ? যেখানে ছিল সেখানেই সে রয়ে গেছে আর এত দূর চলে এসেও সে একপা-ও এগোয়নি। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল তার ফেলে-আসা জীবন, ফেলে-আসা সংসার। দেখল, সুনীল সিন্ধুতীরে ধরণী কী সুধা-শ্যামলিম ক্ষেতে সোনার ধান ফলিয়ে রেখেছে, কৃষান তাই কেটে আঁটি বেঁধে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, পাল তুলে ভেসে চলেছে নৌকোর সার, মাঝিরা গান গাইছে, বধূরা ঘাটে এসেছে কলসী নিয়ে, মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন চলছে গ্রামের হাটে, দূরে মন্দিরে কাঁসর

বাজছে। তপস্বী বলছে, 'শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই আরবার এ জীবন।'

সুধাংশু-পিপাসু আরো দেখছে। দেখছে, সুন্দর লোকালয় চিরকল্লোলময় হয়ে রয়েছে। স্নেহসুধা নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরছে গৃহলক্ষ্মী, প্রতিদিনের কাজে প্রতিদিনকে মধুর করে রাখছে। ঘরের ছেলের মত দুটি ভাই, সকাল আর বিকেল নিত্যি আসা-যাওয়া করছে, রজনী এসে কোলে নিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। ছোট হাসি ছোট কথা ছোট সুখ প্রতিনিমেষের ভালোবাসা—এরা কি চাঁদের চেয়েও বেশি ছিল না? কোথায় সামনে তাকাবে, তপস্বী তাকিয়ে রইল পিছনে। কী চাও? তপস্বী বললে, 'যা একদিন পেয়েছিলাম তাই আবার পেতে চাই।'

কিন্তু না, ফিরে যাবার পথ নেই। ভুললে চলবে না, তার চাঁদ চাই। তাকে যেতে হবে আরো নির্জনে, আরো অন্ধকারে, অতল নিস্ফলতায়।

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া কোথা সে চলিল ভেসে
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি রবিশশীহীন দেশে।

॥ তেরো ॥

'আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি,' কালিগ্রাম থেকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে, যেন এর মনে-মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি; এত অসহায় অসমর্থ অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।'

তাই তো দ্বারপ্রান্তে বসে পৃথিবী কেবলই বলছে, 'যেতে নাহি দিব।' সর্বক্ষণ দেখছে সব কিছু চলে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছে,—'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান'—তবু তার অন্তহীন কাতরোক্তি, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'

কে যায়? কোথায় যায়? কেন তুমি বিষণ্ন মুখে বসে আছ?

বিদায় নেবার সময় এবার হল
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো—

আমি যখন তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে চলে যেতে পারি ? আর তুমি যখন আমাকে ভালোবাসো তখন তুমিই বা আমাকে কী করে চলে যেতে দিতে পারো ? যখনই প্রেমের জন্ম হয়েছে তখনই মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছে। তাই চলে যাওয়া নয়, শুধুই এগিয়ে যাওয়া।

তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।' তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ-তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই।'—হেন গর্বকথা।

মৃত্যু অবশ্য হাসে, ভাবে, দেহটাকে গ্রাস করলেই বুঝি অস্তিত্বের লয় হল ; শেষে সে দেখে, সমস্ত কিছু সে জীর্ণ করতে পারলেও প্রেমকে জীর্ণ করতে পারে নি। প্রেমই চিরজীবী থেকে গেছে। 'চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই অনন্ত সংসার।' প্রেমই জয়ী হয়েছে মৃত্যুর উপর। জীবন হতে নবীনতর জীবনই তো প্রেম।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে-আলোকে।

মৃত্যু তো ক্ষণিক থেমে পড়া আর প্রেমই তো পথ চলা, অমৃততীর্থের পথে অনন্ত কালের পথ চলা। যতি সত্য নয় যাত্রাই সত্য, থামা সত্য নয় চলাই সত্য। বদ্ধ হয়ে থাকা সত্য নয় বেরিয়ে পড়াই সত্য।

কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।—
কতই নামে ডেকেছি যে
কতই ছবি এঁকেছি যে

কোন আনন্দে চলেছি তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায় যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।'

এড়িয়ে তারে পালাস না রে
ধরা দিতে হোসনে কাতর,
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।
মরতে মরতে মরণটারে
শেষ ক'রে দে একেবারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে॥

কিন্তু কে সে, কার জন্যে এই অভিসার? কোথায় সেই ভূমানন্দ অমৃতের তীর্থ? সে কি মানুষের হৃদয়ের মহাদেশে? সর্গস্থিতিপ্রলয় পরিব্যাপ্ত করে যে মহাদেশ।

মানব-হৃদয় সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ ওঠে পুরে।

বারে বারে কত তর্ক, কত কোলাহল, কত সন্দেহের ধূলিজাল। দূরে-নিকটে কত মৃত্যুর গর্জন। কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে আড়াল করলেও একেবারে উৎখাত করতে পারে না। প্রমাণের অগোচরে থেকেও তুমি প্রতীয়মান, প্রত্যক্ষের বাইরে থেকেও তুমি অনুভবগম্য। শুধু প্রসারিত চেতনার উপরেই তোমার উপস্থিতির পাদপদ্ম।

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।
তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো
নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখো
আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন॥

এই আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবনের দিকে তাকালেই বিশ্বাস হয় মৃত্যুই 'চিরস্থায়ী সীমাশূন্য মহাপরিণাম' নয়। আর শাশ্বত যে আছে সে এই জীবনের সমস্ত ক্ষণখণ্ডেরই সমাহার আর মৃত্যুও এমনি সামান্য এক ক্ষণখণ্ড।

'বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি।' সাজাদপুর থেকে ভাইঝি ইন্দিরাকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে, যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তাহলে আর কিছু অসাধ্যসাধন করতে চাইনে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই।'

তাই তো মৃত্যুর কাছে এই করুণ প্রার্থনা, এখুনি এই ক্ষণিক 'খেলার পুরী' ভেঙে দিও না, আরো কটি চঞ্চল-উজ্জ্বল মুহূর্তের টুকরো কুড়িয়ে নিতে দাও, দাও

আরো, আরো একটু ভালোবাসতে, জীবনের লাবণ্যপ্রবাহে আরো কটা ডুব দিয়ে নিতে।

আর সমস্ত প্রেমের মধ্যে তীব্রতম পূর্ণতম হচ্ছে কান্তাপ্রেম। যে এই কান্তাপ্রেম আস্বাদ না করল সে ঈশ্বর-প্রেম-আস্বাদের যোগ্য নয়। যে কান্তার জন্যে ব্যাকুল না হয়েছে সে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হবে কী করে?

সে মনোভবমনোহরার যে নামই দাও, বলো তাকে ললিতযৌবনা অনঙ্গ-মঞ্জরী, রসকল্লোলিনী রঙ্গবিহ্বলা কিংবা সুরতা সুখদায়িকা, আসলে সে ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি, বিশ্বপ্রকৃতিরই প্রেমপত্রিকা। বিশ্বে যত সৌন্দর্য আছে সে তারই আধারভূতা, ঈশ্বরে যত প্রেম আছে সে তারই জয়শ্রীরূপধারিণী।

তাই 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।' সেখানে শুধু একটি ভক্তের চিরন্তন আরতির আয়োজন।

অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি অচপল দামিনী।

মানসসুন্দরী তাই শুধু মর্মের নর্মসহচরী নয়, সে এক নিরিন্ধন দিব্যাগ্নিচেতনা। বাসনাকে কে অস্বীকার করবে? বাসনাকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তারপরে অতিক্রম করা। পরিহার করে নয়, পরিপাক করে। সেই বাসনার সরোবরে ডুবলেই মনে হয় এ কতটুকু জল, কতটুকু এর পরিধি, আমার বাসনার তো এতে পরিপূর্তি হচ্ছে না। শুধু দেহ-দশার মধ্যেই আমি সমাপ্তি পাচ্ছি না। হে প্রেয়সী, তুমি কার বার্তাবহা, তুমি আমাকে আরো কোথায় নিয়ে যাবে, কোন নিরুদ্দেশে, ইন্দ্রিয়ের পরপারে কোন সে ইন্দ্রলোকে?

কোন বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গ সম। এই যে বেদনা
এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার

ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?

শুধু কি ভাসিয়েই নিয়ে যাবে, কোনো স্থির তীরে আমাদের উত্তরণ হবে না ? হবে—সেই বিপুল বিশ্বাসেই রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়স্থিত। দেহের দেহলি পার হলেই সেই ভূমানন্দের দেউল।

'বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

যখন তুমি সংসারলক্ষ্মী, সংকীর্ণ সম্ভোগের কুম্ভটি শুধু ভরে নিতে চাও, সেটুকু তুমি পাবে আমার হৃদয়-যমুনায়। যদি উদাসীন হয়ে মনোবিলাসে প্রহর কাটাতে চাও, আমার প্রেমে পাবে সেই তন্ময়তা। যদি নির্লজ্জ নিমজ্জন চাও পাবে সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস। কিন্তু প্রেয়সী, নিয়ে যাও আমার প্রেমের অতল-স্পর্শতার পরিচয়, যে প্রেম মৃত্যুর মতই এক মহৈশ্বর্যে উন্মোচিত।

যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর নাহি তল নাহি তীর
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান আদি-অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে।

প্রেম তো শুধু সম্রাট করে না, স্রষ্টা করে তোলে। আর কামনাই সমস্ত সৃষ্টির মূল। তাই কামনা মিথ্যাভূতা সনাতনী নয়, আদিভূতা সনাতনী। এই কামনার কৌলীন্য একমাত্র আদিমতম ঈশ্বরকামনায়।

তাই প্রেয়সী মর্তময়ী হয়েও মনোময়ী। 'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।' 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' কখনো গৃহের বনিতা কখনো বা বিশ্বের কবিতা। কখনো শরীরিণী বক্ষবিলাসিনী কখনো বা 'অখিল

মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী।'

জীবনে কত লৌকিক কাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ছেন রবীন্দ্রনাথ, কত গদ্য-রচনায় হাত দিয়েছেন, ভাইপো সুধীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকায় রাশি-রাশি লিখছেন মাস-মাস, কত মসীযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে, তবু সর্বক্ষণ মন পড়ে রয়েছে কবিতার দুয়ারে। 'একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তা হয় না।' কবিতা লিখতে বসা মানেই অনন্তের দুয়ারে কান পাতা, যদি শব্দের করাঘাতের উত্তরে এসে পড়ে কোনো ধ্বনির সঙ্কেত। সেই অশেষের উপস্থিতির ইশারা।

কবিতা কখনো শেষ হয় না, কথা শেষ হয়ে গেলেও নিঃশব্দতার মধ্যে তার কথা চলে। কবিতা লিখতে বসাই তো অনির্বচনীয়ের উপাসনায় বসা।

তাই, কবি, কত আর তুমি বাক্য রচনা করবে? সহস্র কোটি বাক্যেও তাকে তুমি প্রকাশ করতে পারবে না। তাই এবার বাক্যের বাইরে চলে এস, নিজেকে ঢেলে দাও অগাধ সমর্পণে, অবাধ শরণাগতিতে।

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে
নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রভাতরবি॥

কিন্তু ততদিনে রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্প লিখতেও সুরু করেছেন। এই ছোট গল্পে মানবহৃদয়ের অপরিমেয় রহস্যকে অসীম স্নেহে উদ্ঘাটিত রছেন, তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে একান্তআত্মীয় করে দেখেছেন প্রকৃতিকে, কখনো করুণাদ্রবা, কখনো বা উদাসিনী বৈরাগিনী।

ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু চারিটি অশ্রুজল।

নিজের হৃদয়ের মধ্যে মানুষের প্রতি অপার মমতা ও ঈশ্বরের প্রতি অসীম বেদনা ছিল বলে ঐ দু-চারিটি অশ্রুজল কালের কপোলতলে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রেম ছাড়া বেদনা নেই, আর এই বেদনা ছাড়া সৃষ্টি নিরর্থিকা।

সব কথা গেছি ভুলে
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিস্বনে।

আমার বেদনাই তো আমার সৃষ্টিকর্তাকে বারে বারে চঞ্চল করেছে। আমার কাব্য যে তিনি না ভালোবেসে পারেন না, তাঁর আপন-দেওয়া ধন তো আমার কাব্যে দ্বিগুণ করে ফিরে পেলেন। তাঁর বসন্তের ফুল কেমন কথা বলে সে-কথা তো তিনি বারে-বারে আমারই গান থেকে জেনে নিয়েছেন। শ্রাবণ-রাত্রির বৃষ্টিধারায় কী অনাদি বিচ্ছেদের সুর বাজছে এ তো আমিই তাঁকে শুনিয়েছি। পূর্ণিমারাতে পুষ্পিত শালের বনে যখন নিজের মনে চলেছি, অসমাপ্ত সুরগুঞ্জন করতে করতে, দেখেছি নিঃশব্দ পদচারে তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন, উৎকর্ণ হয়ে চলেছেন, আমার বাঁশিতে তাঁর বাঁশির উত্তরটি ঠিক বাজে কি না। তারপর—

যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয় তিমিরে॥

রাজসাহিতে বন্ধু লোকেন পালিত তখন জেলা-জজ, রবীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন কটা দিন এখানে কাটিয়ে যাও। শিলাইদহের বোটে একা আছেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা শোলাপুরে মেজদার কাছে। শিলাইদহে তো শুধু প্রকৃতির সাহচর্য করা নয়, জমিদারি দেখা—লোকেনের কাছে গেলে কটা দিন অন্যভাবে কাটবে, কাটবে কাব্যচর্চায়। কবিতা তো শুধু লেখায় নয়, সমানানুরাগ কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায়ও বহুতর আনন্দ।

রাজসাহিতে দিন পনেরো কাটিয়ে চললেন নাটোরে মহারাজ জগদিন্দ্র-নারায়ণের নিমন্ত্রণে। সেখানে দিনসাতেক কাটিয়ে ফিরলেন শিলাইদহে,

আবার তাঁর নদীর নির্জনতায়, তাঁর কবিতায়, রহস্যপুরীতে।

মানবকেও কি একটা নদীর মত মনে হয় না? 'মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে—' লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে আর একপ্রান্ত মরণসাগরে। দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি, কোনো কালে এর আর শেষ নেই।' কিন্তু কবিতা লেখা হচ্ছে কোথায়? জমিদারি তদারক করব, না, কবিতাকে নিয়ে বসব? তরুণ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, 'আমি কতক জমিদারীর কাজ দেখছি, কতক সাধনার জন্যে লিখছি এবং চেষ্টা করছি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে লিখতে। কিন্তু হয়ে উঠছে না। কেন না কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্যপ্রয়াসিনী। 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসরমত বাসিয়ো' এ ঠিক তার সেন্টিমেণ্ট নয়। এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সব প্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না।' আবার লিখছেন, 'সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যাকথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।'

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

সে তখন কী পড়বে, কতটুকু পড়বে? কতটুকু পাবে? শুধু বসন্তের প্রভাতের আনন্দের লেশমাত্র ভাগটুকু? শুধু ক'টি ফুলের সুগন্ধ, পাখির কাকলি, ঘরে-আসা পথহারা ভ্রমরের গুঞ্জন? শুধু সন্ধ্যা-আকাশের রাগরক্তিমা, যৌবনের বেদনা? এর বেশি কিছু নয়? শুধু মর্তপ্রেম, শুধু মানবকরুণা? এর বেশি কিছু নয়? দেখবে না কি এ কবিতা সমস্ত জীবনব্যাপী সমস্ত চরাচরব্যাপী এক উদার প্রার্থনা—প্রকাশের প্রার্থনা, আর সেই প্রার্থনার পরিপূর্তিতে এ এক ভাগবতী উপস্থিতি।

রাজসাহিতে একটা নিদারুণ প্রবন্ধ পড়ে বিদগ্ধ সমাজকে চমকে দিলেন, অথচ তার বক্তব্য কী সরল, আর রবীন্দ্রনাথের মতে, 'আসলে সবই সোজা,

একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে', আর সেই রাস্তাতেই স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা। 'শিক্ষা' সম্বন্ধেই বলছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর বলছিলেন, মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, আর মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা সর্বব্যাপী হতে পারবে, নচেৎ নয়।

এ যাবৎ এ চিন্তাই প্রবল ছিল ইংরেজি না শিখলে জ্ঞানের বিকাশ অসম্ভব, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' সে চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করল। ইংরেজির সঙ্গে বিরোধ নয়, ইংরেজির একাধিপত্যের সঙ্গে বিরোধ। ইংরেজি যদি অত্যাবশ্যক হয় তো হোক, অনাবশ্যক বাঙলারই প্রয়োজন বেশি। সেই অনাবশ্যকেই আনন্দ ও কল্পনা, মনন ও মুক্তি।

কবিতাও তো সেই এক মহান অনাবশ্যক। কী হবে এ কবিতা দিয়ে?

কী হবে!

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি
পুষ্পের মত সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশ ভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে॥

সংসারে আনন্দলোকের প্রতিষ্ঠার জন্যেই তো কবিতা। কী আর হবে? সংসারে দু-একটি সুর মধুর করে রেখে যাব, তুলে দিয়ে যাব দু-একটি কাঁটা, নয়নের জলকেও রেখে যাব সুন্দর করে। আর চিনিয়ে দিয়ে যাব সেই মনের গোপন মানুষটিকে যে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে নিরন্তর।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর॥

মহর্ষি ডেকে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথকে, উত্তরবঙ্গ ছেড়ে এখন উড়িষ্যায় যাও। সেখানকার জমিদারিটা তদারক করে এস।

॥ চৌদ্দ ॥

উড়িষ্যার দিকে রওনা হবার আগে মাঘোৎসবের জন্যে গান লিখতে হল রবীন্দ্রনাথকে। আর গান মানেই তো উর্ধ্বের অভিসার।

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই।

লিখলেন: 'এ কী পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে, অনন্ত বসন্তসমাগমে।' আবার লিখলেন: 'হৃদয়মন্দিরে প্রাণাধীশ আছ গোপনে। কে পারে পশিতে আনন্দ-ভবনে, তোমার করুণা-কিরণ-বিহনে।' তৃতীয় গান: 'চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু, তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, তোমার জগতে চিরসঙ্গী চির-জীবনে।' চতুর্থ গান: 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর। মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।' আর শেষ গান: 'জয় রাজরাজেশ্বর।'

ভাইপো বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে নদীপথে যাত্রা করল। নদীপথে মানে নৌকো করে কাটা-খালের অলি-গলি দিয়ে। কটকে পৌছে উঠল জেলা-জজ বি এল গুপ্ত বা বিহারীলাল গুপ্তের বাড়ি। সেখানে এক সাহেবি কাণ্ডে বিষম ঠোক্কর খেল রবীন্দ্রনাথ।

সাহেব সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। উৎকট ইংরেজ, প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড়হাত চিবুক, গোঁফদাড়ি কামানো, মোটা গলা, একটা পূর্ণপরিণত জনবৃষ—রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেই সাহেবের বর্ণনা দিচ্ছে। এসেছিল বিহারীলালের বাড়িতে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে। জুরির বিচার দেশ থেকে তুলে দেওয়া উচিত, গভর্নমেণ্ট এমনিধারা অভিমত প্রকাশ করেছে আর তারই বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে জনমত। সেই সম্পর্কে ইংরেজ অধ্যক্ষ অযাচিত এক মন্তব্য করে বসল: 'এ দেশের লোক জুরি হবার যোগ্য নয়।'

কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ চমকে উঠল।

বিহারীলাল অবশ্য আপত্তি করল। কিন্তু ইংরেজ জনবুল বা জনবৃষ

নিবৃত্ত হবার জন নয়। কেন যোগ্য নয় তার কারণও সে ব্যক্ত করল। বললে, 'আপনাদের দেশের লোকের মর‍্যাল স্টাণ্ডার্ড অত্যন্ত নীচু আর তাদের জীবনের 'সেক্রেডনেস' সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই।'

বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে এরকম হীনকথা বলতে লোকটার এতটুকু বাধল না। তাহলেই বোঝো ইংরেজ ভারতবাসীদের কী কদর্য চোখেই দেখে। রবীন্দ্রনাথ মরমে মরে গেল। এ সম্পর্কে লিখল ইন্দিরাকে: 'আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। খাবার টেবিল থেকে যখন ড্রয়িংরুমের এককোণে এসে বসলুম, আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মত ঠেকছিল। আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ন হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ইভনিংড্রেস-পরা মেমসাহেব এবং কানের কাছে ইংরিজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবসুদ্ধ এমনি অসঙ্গত। আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্যি আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টিহাসি, ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কী সুগভীর মিথ্যে!

'দেখুন একটা কথা মনে রাখবেন—' গোরা-উপন্যাসে গোরা বলছে সুচরিতাকে, 'যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে ইংরেজরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমরাও ঠিক ইংরেজটি না হলে কোনোমতে প্রবল হতে পারব না, তাহলে সে অসম্ভব কোনোদিন সম্ভব হবে না এবং কেবলি নকল করতে-করতে আমরা দু'য়ের বা'র হয়ে যাব। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভাল-মন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতরে থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হোন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে খৃস্টানী সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থিমজ্জায় দীক্ষিত হয়ে একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবলি আঘাত করতেই থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।'

গোরা আরো বললে, 'ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের

সঙ্গে একদলে মিশে ধূলায় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউ বা বোঝে কেউ বা বোঝে না—তা নাই হল—আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক—তারা আমার সকলেই আপন—তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।'

স্বদেশকে কী মূর্তিতে দেখছে রবীন্দ্রনাথ? দেখছে বিশ্বদেবতার রূপে।

হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে,
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে।
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

'জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে, আমরা যাহারা ইংরেজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে-বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে: পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।'

কটক থেকে পুরী যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ আর জেলা-জজ মিস্টার গুপ্ত। তখনো রেল লাইন বসে নি, যাচ্ছে ভাড়াটে কিটন গাড়িতে, কম্বল বিছানা পেতে, তিনটি পিঠের কাছে তিনটি বালিশ রেখে আর কোচবাক্সে জজসাহেবের একটি চাপরাশি চড়িয়ে।

কতদূর গিয়েই কাঠজুড়ি। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে যাত্রীদের পাল্কিতে উঠতে হল। এবার ধূসর বালুকাস্তর অতিক্রম করে চলো।

'ধূসর বালুকা ধূ-ধূ করছে।' চিঠি লিখছে রবীন্দ্রনাথ: 'ইংরেজিতে একে যে নদীর বিছানা বলে—বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো—নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন তার ভার দিয়েছিল, তার বালু-শয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে, সেই বিশৃঙ্খল

শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি। এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষসীমায় কৃষ্ণ-পক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর-একটি উপমা পাওয়া গেল।'

যতই পুরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে ততই রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য বাড়ছে, কখন না জানি সমুদ্র দেখা দেয়, কখন না জানি অভাবনীয়ে বুক ভরে ওঠে।

নানা গাছগাছালিতে ঘেরা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। স্বল্পজলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে ছাপরওয়ালা গরুর গাড়ি। গোলপাতার ছাউনির নিচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে। পথের ধারে গাছের তলায় খেতে বসেছে যাত্রীরা। শোনা যাচ্ছে ভিখিরিদের বিচিত্র কণ্ঠের আর্তনাদ। আরো চলো আরো এগোও। যতই এগোচ্ছে বাড়ছে যাত্রীর জনতা। ঢাকা গরুর গাড়ি চলছে সার-সার। মাঝে মাঝে মন্দির, পান্থশালা, বড়-বড় পুকুর। তারপর—

'তারপর পথের ডানদিকে একটা খুব মস্ত বিলের মতো—তার ওপারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা।

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, একটি চরম দেখা একটি পরম দেখা আছে, সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।'

রবীন্দ্রনাথ প্রতি মুহূর্তে এই পরম-দেখায় সমুত্তীর্ণ।

'পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশ সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করেছে।'

তেমনি করে আবার দেখা দিয়েছে হিমালয়, পরম দেখার আলোকে ধরা দিয়েছে।

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত

নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—'শুন শুন বিশ্বজন সবে,
জেনেছি, জেনেছি আমি।' যে-ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
আদি-অন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোক-পানে
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে।

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর গেল রবীন্দ্রনাথ। মন্দিরে দেখল আবার সেই পরমদর্শনীয়কে।

'উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া মূক বলিয়া হৃদয়ে যেন আরো বেশি করিয়া আঘাত করে।'

এই বিশ্বই রবীন্দ্রনাথের কাছে এক মুক্তদ্বার আনন্দমন্দির আর তার অধিপতি ভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বর হে
মোচন করো বন্ধন সব মোচন করো হে॥
প্রভু, মোচন করো ভয়
সব দৈন্য করহ লয়
নিত্যচকিত চঞ্চলচিত করো নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে॥

শোনো তবে এবার রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা: 'হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে-জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, সূর্যাস্ত প্রতি সন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহু লোকের চিরপরিচিত, আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে, পাপের লজ্জায়, আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ রাখিয়া

পথের পঙ্কে যদৃচ্ছ লুণ্ঠিত হওয়াকে আমার সুখ, আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি।'

পুরী থেকে আবার কটকে ফিরল রবীন্দ্রনাথ, কটক থেকে গেল বালিয়া।

'আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না।' চিঠি লিখছে রবীন্দ্রনাথ : 'ভারি ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে—এক অংশ গৃহস্থ, আর-এক অংশ সন্ন্যাসী। কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে।'

এই দুই নিয়েই রবীন্দ্রনাথ। ভূমি আর ভূমা। নীড় আর আকাশ। শান্তি আর অশ্রান্ততা।

নিজেই আবার বলছেন, থাকবার জন্যে যেমন ছোট্ট নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। মাটি আর আকাশ—এই দুই নিয়েই জীবন। মাটিতে তুমি সকলকে নিয়ে থাকো কিন্তু আকাশে তুমি একাকী। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যেন এ না বলতে হয়, আকাশকে হারিয়ে ফেলেছি, আকাশকে খুঁজে পাচ্ছি না। আবার আকাশভ্রমণে বেরিয়ে যেন এ না বলতে হয় মাটিতে নেমে এসে দাঁড়াবার পথ পাচ্ছি না।

যতই মন ঘরের কোণে ভিড়ের মধ্যে প্রতিহত হয় ততই সে ভাবনার নিরালা আকাশে উড়ে বেড়াতে চায়। দিবারাত্রি সে কেবল অখণ্ড অবসর খোঁজে—'সৃষ্টি-কর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী, মনও আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়।'

> পথে যতদিন ছিনু ততদিন
> অনেকের সনে দেখা,
> সব শেষ হল যেখানে সেথায়
> তুমি আর আমি একা।

সেই একাকিত্বেই কবি আর স্রষ্টার সহাবস্থান। সেই একাকিত্বেই কবি উপলব্ধি করে তার একজন দোসর আছে, দ্বিতীয় আছে। সেও তারই মতন একা। একা না হলে অজস্র হয় কী করে বিচিত্র হয় কী করে? তার কাজই তো শুধু, কেমন ভেবেছে কেমন ভালোবেসেছে তারই প্রকাশরূপটি বাইরে এনে দেখা।

জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে।
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

সেই মহা-একাই বুঝি চিরন্তন কাল ডাক দিয়ে ফিরেছে। 'অকস্মাৎ মহা-একা—ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।'

অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে
মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে। একাকীর কোনো লজ্জা নাই
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।

আমি একটি দেউল নির্মান করেছিলাম। পাষাণভার দিয়ে তার জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে সব দিকে অন্ধকার করে রেখেছিলাম। ত্রিভুবনকে ভুলে গিয়েছিলাম, বিশ্বজনের মুখের দিকে তাকাই নি, শুধু মন্দিরের মাঝখানে দেবতাকে বসিয়ে তার মুখের দিকেই চেয়েছিলাম অনিমেষে। কতশত গন্ধময় বাতি জ্বলেছে, কনকমণির পাত্রে পুড়েছে ধূম্র ধূপ, কত ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে মন্ত্র-মন্ত্র—সৃষ্টিছাড়া সৃজনের মধ্যে দেবতা নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। তারপর সহসা একদিন সে দেউলের উপর দেবতার আশীর্বাদের মতই বাজ পড়ল, পাষাণ-স্তূপ অপসৃত হয়ে গেল মুহূর্তে। নীরব ধ্যানের আর অবসর রইল না। সংসারের অশেষ সুর ভিতরে প্রবেশ করল। দেবতার মুখে তখন কী অপূর্ব মহিমা, কী পরিতৃপ্ত প্রসাদ-হাসি। প্রকাশিত দিনের আলোর কাছে রাতের প্রদীপ ম্লান হয়ে গেল। ভিত্তিগাত্রের নিষ্প্রাণ ছবিগুলো লজ্জায় মুখ ঢেকে পালাল। দেখ চারদিকে প্রকৃতির এই শোভাচিত্র, শোনো জনসমুদ্রের কল্লোলগান। দেউলের দেয়াল ভেঙে পড়ে দুয়ার খুলে গেলেই দেবতার জাগরণ ঘটে।

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে

নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

কটক থেকে কলকাতা ফিরছে রবীন্দ্রনাথ। এবার খাল-পথে নৌকো করে নয়, যাচ্ছে স্টিমারে করে, সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দিয়ে। সেই সমুদ্রের উপরে স্টিমারে বসেই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বনৃত্য' লিখল।

ওগো কে বাজায়—বুঝি শোনা যায়—
মহারহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর 'পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল
গগনে-গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ঈশ্বর যেমন একাকী, তিনি আবার তেমনি জনসমাগমে সর্বব্যাপী হয়েও আবার সর্বাতিরিক্ত। আবার বিবিক্ত হয়েও সর্বসন্নিবিষ্ট। সমস্তকে অধিকার করেও তিনি, সমস্তকে অতিক্রম করেও তিনি। আমার মধ্যেও তিনি, সমস্ত বিশ্বমানবের মধ্যেও তিনি। তাই বিশ্বকে বাদ দিয়ে আমি কোথায়? আমার যে বড়-আমি তাই তো বিশ্ব, তাই তো ভূমা। দেশে-কালে খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন যে সত্তা তাই তো বিশ্বের বিরাটত্বে প্রসারিত আর সেই বিরাটত্বের শেষ সীমাই তো ব্রহ্ম। আর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগই তো মানব-চৈতন্যের শাশ্বত অধিকার।

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দেবে এই তৃষিতে।

'জাতিজালপাশ' ছিন্ন করে ফেলে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। বিশ্ব-মানবতাবোধই তো মানুষ হয়ে জন্মাবার পরম পরিতোষ। জগৎ-প্রাণে স্পন্দিত

ও সঞ্জীবিত হবার জন্যেই তো এ প্রাণের স্ফুরণ। শুধু জড়তার বন্ধনই ঐ মহৎ প্রাণে প্রসারিত হতে দিচ্ছে না। প্রাণের সমস্ত আবরণ-অবগুণ্ঠন ছিন্নভিন্ন করে না দিলে সর্বজগদগত ভূমার যে আস্বাদন হয় না।

দে দোল দোল
আয়রে ঝঞ্ঝা, পরাণ-বধূর
আবরণ রাশি করিয়া দে দূর
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল
দে দোল দোল।

'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে, এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর-দেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ। আরো বলছেন, 'আমি আমাকে সার্থক করবার জন্যেই বিশ্বকে চাই। আমারই জ্ঞান সার্থক বিশ্বজ্ঞানে, আমারই শক্তি সার্থক বিশ্ব-শক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে, সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে—এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ।'

কিন্তু হে বিশ্ববাসী,তুমি তো আমার থেকে কত ভাবে ভিন্ন, কত ভাবে বিচ্ছিন্ন, তোমাকে আমি কী করে আমার সত্য আত্মীয় বলে অনুভব করব, কী করে সম্ভাষণ করব বন্ধু বলে? একবার শুধু ঈশ্বরকে দেখ, তাহলে তাঁকেই দেখতে পাবে সকলের মুখে। একবার ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তাহলেই সমস্ত মানুষকে ভালোবাসা সম্ভব হবে। যিনি চিরজন্ম একমাত্র পরিচিত, তাঁকে বলো, তিনিই চিনিয়ে দেবেন, তিনিই মিলিয়ে দেবেন।

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা নাহি কোনো ডর
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

'হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের দেবতা, এ কথা যেন আমরা

একদিনের জন্যেও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষেরই পূজার অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গূঢ় এই চির-সঙ্কল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়-সঙ্কোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও।'

আমি যে শুধু দেশে জন্মাইনি জগতে জন্মেছি, আমি যে শুধু সত্তায় সঙ্কীর্ণ নই, সত্যে পরিব্যাপ্ত, সেই পরমবোধে জাগ্রত হই।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক॥

॥ পনেরো ॥

রবীন্দ্রনাথ সমগ্রের কবি। রূপের কবি, অরূপেরও কবি। তিনি শুধু রূপসাগরেই নিমগ্ন হয়ে থাকেন নি, রূপসাগর থেকে অরূপরতন উদ্ধার করে এনেছেন। তিনি ধূলির কবি, নক্ষত্রেরও কবি। তিনি ধূলি দিয়ে কপালে তিলক পরেছেন। আবার নক্ষত্র রাজসভায় বসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। 'ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।' ভূমাকে দেখতে গিয়ে তিনি ভূমিকে ছাড়েন নি। তিনি সংসারের কবি, আবার তপোবনেরও কবি। তিনি শুধু লোকালয়ের নন, তিনি গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির। তিনি অংশে আবদ্ধ নন, তিনি সমগ্রে বিস্তারিত। তাই তিনি মানুষের কবি হয়েও ঈশ্বরের

কবি। পৃথিবীর কবি হয়েও স্বর্গের।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার॥

আঁকড়াবার আসক্তি না থাকলে উর্ধ্বে ওঠবার শক্তি আসবে কোত্থেকে? মৌনের বিপুল শক্তি তো মুখরতার মধ্যেই। মর্তের ভঙ্গুর ভাণ্ডের মধ্যেই তো অমৃতের সঞ্চয়। তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন মর্তের কবি তেমনি অমর্তের কবি, যেমন মূর্তের কবি তেমনি কবি অমূর্তের। লোকে-লোকেই তো অলৌকিকের লীলা। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু সার্বদেশিক নন, তিনি সার্বলৌকিক।

প্রথমে এই কাছের জিনিসটাকেই আঁকড়ে ধরো। সবচেয়ে কাছের জিনিস কী? সবচেয়ে কাছের জিনিস মাটি। সবচেয়ে স্থির সবচেয়ে ধ্রুব সবচেয়ে পুরাতন।

আজকে খবর পেলেম খাঁটি,
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন।

যত দূরে যাই, যত উর্ধ্বে উঠি, যতই তর্কে-তন্ত্রে পাক খাই, অ 'র ফিরে আসি আমার মাটির কাছে।

'ফিরে চল মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'
'যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে,
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।'
'কি ভুল ভুলেছিলেম আহা,
সবচেয়ে যে নিকট, তাহা
সুদূর হয়েছিল এত দিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে

চারদিকে এই যে-ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।'

তাই প্রথমেই মাটি, মা—দেশ, দেশের মাটি, বিশ্বময়ী বিশ্বজননী।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

তারপরেই পৃথিবী, বসুন্ধরা, 'হে শ্যামলা, সর্বসহা, মৃন্ময়ী জননী।'

কী নিবিড় দুর্বার ভালোবাসা এই পৃথিবীর সঙ্গে, কী অমেয় অগাধ পরিচয়!

'একসময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।'

রবীন্দ্রনাথ ধরণীকে নারায়ণী বলেছেন। 'নারায়ণী এ ধরণী।' আর তাকেই ভালোবেসেছেন গভীর আত্মীয়স্নেহে।

ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে,
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে ভরেছে আমারি সাজি।

আবার লিখছেন: 'এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে

পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন-রাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব-শিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের এই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল' পরে নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের ঐ কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি—বহু সন্তানবতী মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে একরকম কেটে যাচ্ছে।'

মাটির পৃথিবীর প্রতি এই দুনিয়ার আসক্তি রবীন্দ্রনাথের মানবতা বোধকে বিশ্বব্যাপ্ত করে তুলেছে। ভেঙে ফেলেছে সঙ্কীর্ণতার পাষাণ-প্রাচীর, প্রসারিত করে দিয়েছে প্রান্ত থেকে প্রান্তভাগে, বিপুল মানব সংসারে। তাই বৃহৎ বসুন্ধরাই তাঁর জন্মভূমি, তাঁর অন্তরঙ্গ আত্মীয় নিবাস। মাতা মৃত্তিকা যে সর্বত্র বিস্তারিতা। ধূলিজালের মধ্যে জাতিভেদ কোথায়?

হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে; উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে, শৈবালে শাদ্বলে তৃণে

শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে—'

কিন্তু 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!' আবার জানার মাঝে অজানার আভাস ফুটে উঠেছে। ধরণী অক্ষমা, দরিদ্রা, তাই তার প্রতি এত স্নেহ এত আত্মীয়বাৎসল্য, সে স্বর্গ নাই বা হল, সে স্বর্গের ভূমিকা, এক মহা-অজানার দিকে চোখ মেলবার বাতায়ন! তাই তো তার বিষাদকোমল স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখখানি এত সুন্দর!

মানুষ যখন বুঝতে পারে, আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারিনে, অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অনাত্মীয় আমা-হীন—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং একরকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়। তখনই মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়।

কেন বিষাদ? কার জন্যে বিষাদ? কে সে, কোথায় সে বেদনার ধন?

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জীবন ধরে,
ভুবন ভরে আছে যেন
পাইনে জীবন ভরে।

জানিনে কেন, তবু বিষাদ যায় না, তবু বিষাদ লেগে থাকে।

অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাক্ষণ মুখে আবরণ টানি।

'কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম,' চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি-অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় একপ্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবী-মণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপথে প্রদক্ষিণ করে আসছে।

তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে। কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!'

সে আপনা-আপনি সাজেনি। নিশ্চয়ই কেউ তাকে সাজিয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ আছে, অনন্ত রঙ রস ও স্নেহ নিয়ে এক অসীম সুন্দর বসে বসে ছবি আঁকছে, তার যাদুস্পর্শে সমস্ত কিছু প্রাণ-পুলকিত হয়ে উঠেছে, কখনো বা সেই অনাদি কবি আনন্দিত ঔদাসীন্যে গান গেয়ে চলেছে, গান শুনিয়ে ধরণীকেও করে তুলছে উদাসীন।

অমর্ত লোকের কোন বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।

সেই পরম কথাটি শোনবার জন্যেই পৃথিবীর সঙ্গে এত আত্মীয়তা করা। পৃথিবীকে ভালোবেসে আমি আনন্দিত এই স্বীকারোক্তিতে কোন এক আনন্দময়কে অভিনন্দন জানানো। পৃথিবীকে প্রণাম জানিয়ে কোন এক পরিচিততমের পদপ্রান্তে প্রণতি জানানো, যে প্রণতি পৃথিবীর ধূলিতেই নির্মলীকৃত।

বিচিত্রবর্ণা পৃথিবী। কখনো ললিতা কখনো কঠিনা। কখনো সুহাসিনী কখনো সাট্টহাসা। কখনো শ্যামলী জীবপালিনী কখনো ভয়দা ছিন্নমস্তা। 'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী, গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যানমগ্না পৃথিবী নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী, অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ; 'জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে, তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে।'

সেই পরম প্রেমের তিলকটি ললাটে পরেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চক্ষুর উন্মীলন ঘটেছে।

পৃথিবী একটি অনুভবের প্রান্তরেখামাত্র, তার বাইরে আছে অসীম বহিরঙ্গন। অনেকদূর হেঁটে সেই প্রান্তরেখায় এসে পৌঁছুলেই বুঝি বহিরঙ্গনের বার্তা শোনা যাবে আর সেইটিই অমূর্তের বার্তা, অমর্তের বার্তা। পৃথিবীর বেড়া ধরে না দাঁড়ালে সে অমূর্তকে দেখা যাবে না। পৃথিবীই এই পরম দ্রষ্টব্যকে দেখিয়ে দেয় বলে পৃথিবী এত মনোহর এত আত্মীয় এত রুচিরমঞ্জুল। তারই জন্যে পৃথিবীর ঋণ শোধ করা যাবে না কোনোদিন। কত সে দেখাল কত সে চেনাল কত সে খুলে দিল দূরের বাতায়ন।

আমি যে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

মাটির প্রদীপটির সঙ্গে সন্ধ্যাতারকাকে মিলিয়ে নিতে হবে। মাটির ঘরে প্রদীপটি আছে বলেই তো সন্ধ্যাতারাকে দেখতে পেলাম। সন্ধ্যাতারাও মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল মাটির প্রদীপটি জ্বলছে কিনা। দুয়ের চোখোচোখিতে দীপ হল তারা আর তারা হল দীপ।

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটিব ঘরেব কোলে
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে বলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে॥

তাই মাঝে মাঝে বহিরঙ্গনদ্বারে এসে দাঁড়াও। যে সমস্ত গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে তারই জন্যে জীবনের চরম গানটি গেয়ে যাও। এই পরমের সুরে চরমের গানটি গাইবার জন্যেই তো পৃথিবীতে আসা, পৃথিবীকে ভালোবাসা, মর্তপ্রেমের প্রসার-সীমার প্রান্তে এসে দাঁড়ানো।

খনে খনে তার বহিরঙ্গনদ্বারে
পুলকে দাঁড়াই কত কী যে হয় বলা,
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।

রবীন্দ্রনাথেই তো ভরপুর বেজেছে এই গান। তিনিই তো গানের ওপারের লোককে এপারে নিয়ে এসেছেন। নিয়ে এসেছেন মাটির ধূলিতে।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি॥

নিয়ে এসেছেন ঘরে। 'হেথায় তিনি কোল পেতেছেন আমাদের এই ঘরে।' 'যতই ওঠে হাসি যতই বাজে বাঁশি, যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে, তোমায় ঘরে হয়নি আনা সেকথা রয় মনে।'

তারপর তাকে দেখেছেন। দেখা ছাড়া পাবার কোনো অর্থ নেই।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সেকথা রয় মনে।

ভিতর অঙ্গনে দেখেছেন, আবার দেখেছেন বহিরাঙ্গনে।

দেখিলাম যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

উড়িষ্যা থেকে ফিরেছে রবীন্দ্রনাথ। আবার শিলাইদা, আবার পদ্মা, পদ্মার উপরে নৌকো, নয়তো রাজসাহিতে, লোকেন পালিতের বাড়ি। কিন্তু শরীর যেখানেই থাকুক, মন সর্বদা নিরুদ্দেশের অভিসারী।

ঈশ্বর কখনো সুদূরের ধন, রবীন্দ্রনাথ সেই সুদূরের পিয়াসি। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি।' ঈশ্বর কখনো বা আত্মীয়তম অন্তরতম বন্ধু। 'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে।' আবার ঈশ্বর কখনো সমগ্র জগতের সত্তা, সমস্ত জীবজগৎ ঈশ্বরেই ওতপ্রোত। পৃথিবীর সামান্য ধূলিকণাটিও দিব্যচেতনায়আচ্ছন্ন।

'সকল গগন বসুন্ধরা, বন্ধুতে মোর আছে ভরা।'

ঈশ্বর কখনো নিরুদ্দিষ্ট, অনির্ণেয়, অগমপারের অধিবাসী। কখনো এই ব্রহ্মাণ্ডে, আব্রহ্মস্তম্বে। কখনো বা আমার মধ্যে, এই দেহভাণ্ডে। আমার মানসনিকেতনে।

তিনরূপেই রবীন্দ্রনাথ সেই মহান পুরুষের সাধন করেছেন। তাঁকে 'বিশ্ববিহীন বিজনে বসে বরণ' করেছেন, তাঁকে উপলব্ধি করেছেন চিন্মাত্ররূপে- নিজেও চলেছেন সেই চেতনার সমুদ্রতীর্থে।

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি-জ্যোতি
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যা-স্নান
যেথায় নক্ষত্র যত—মহাকায় বুদ্বুদের মত
উঠিতেছে, ফুটিতেছে,

সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্য-সাগর-তীর্থপথে।

কিন্তু সেই তীর্থ কোথায়? 'বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?' এখানেই যদি তা না থাকে, তবে সে কোথায়? 'কী আছে হেথায় চলেছি কাহার অন্বেষণে?'

প্রথম যাত্রা তো নিরুদ্দেশই। শুধু বাঁশি শুনে বেরিয়ে পড়া, কে ডেকেছে, কোত্থেকে ডেকেছে কিছুই জানিনা। শুধু 'হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।' ঠিকানা জানি এমন সাধ্য কী। 'হায় রে ওরে যায় না কি জানা। নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা।' 'কোন আনন্দে চলেছি যে ঠিকানা না পেয়ে।' তবু সেই নিরুদ্দেশের ডাকেই আমি বেরিয়ে পড়ব। ঠিকানা না জানি, তাকে চোখে না দেখি, কিছু এসে যায় না। শুধু তার ডাকে বেরিয়ে পড়াতেই আমার আনন্দ। এবং যত যাই যত এগোই তত আনন্দ। আমার পথে আনন্দ, প্রান্তে আনন্দ, প্রতি পদক্ষেপে আনন্দ। এ পাখির শাখায় আনন্দ, পাখায় আনন্দ, নীড় থেকে আকাশে উড়ে যাওয়াই তার তুরীয় সুখ। এই ব্রহ্মানন্দ, ভূমানন্দ। ইন্দ্রিয়ের পরপারে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি। অহং-এর কূল থেকে যাত্রা করে আত্মার অকূলে উত্তরণ।

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

কিন্তু তিনি আবার লোকে, লোকতীর্থে। 'সর্ব মানুষের মাঝে এক চিরমানবের আনন্দকিরণ—চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।' আবার তিনি আত্মস্বরূপে। 'আছি আমি একান্তই আছি, মহাকাল দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি, মহেন্দ্র মন্দিরে।'

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। সে কোথায়? সে যেমন আকাশে তেমনি আবার নীড়ে, সীমিত সংসারে। সে যেমন অনন্তে তেমনি আবার অন্তিকে। একেবারে অন্তরের মধ্যে। যেমন অদ্বৈতে তেমনি দ্বৈতে। তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্রহ্মানন্দী তেমনি আবার ভক্ত।

যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।

কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

সেই দূর আবার সন্নিহিততম হয়ে রয়েছে। দূরে 'পরশাতীতের হরষ' পেয়েছেন আবার নিকটে নিজের দৈহিক অস্তিত্বে পেয়েছেন সেই আধ্যাত্মিক রোমাঞ্চ।

পরশ যারে যায় না করা,
সকল দেহে দিলেন ধরা।

আবার সেই স্পর্শ সমস্ত জগৎ-পরিবেশে। 'খুঁজতে যারে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে, সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে,' চাই একটি সচল স্পর্শ, জাগ্রত স্পর্শ, শুধু বাণী নয়, একটি প্রাণতপ্ত প্রগাঢ় স্পর্শ।

তোমার হাতখানি বাড়িয়ে দাও, আমি তাকে ধরব, ভরে দেব। কী দিয়ে ভরে দেব? ভরে দেব আমারই স্পর্শে যা আমারই প্রাণের সুধা দিয়ে ভরা। 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি—হায় বুঝি তার খবর পেলে না।' আমার ঐ সুধাটুকু না পেলে তুমিও তো নিরর্থক। তুমিও তো এই ভালোবাসারই কাঙাল। 'কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ আরো কী তোমার চাই।' আমার যত ভালোবাসা ছিল সব তোমাকে পলকে সমর্পণ করেছি, তুমি যদি আরো চাও তবে তুমি আমাকে আরো ভালোবাসা দাও। এ সংসারে যদি কিছু অফুরন্ত থাকে, যা দিয়েও ফুরোয় না নিয়েও কুলোয় না, তা একমাত্র ভালোবাসা।

আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

তাই যার সন্ধানে চলেছি সেও আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। 'বলো দেখি মোরে শুধাই তোমারে অপরিচিতা' শেষে দেখি সে অপরিচিত নয়, সেই আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু।

'জানি বন্ধু জানি, তোমার আছে তো হাতখানি'।
'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে,
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে।'

জীবনে যেই আসুক বা চলে যাক, সব তোমারই কাছে আসা। কেউ

মধুরে ধ্বনিত হোক, কেউ বা নিষ্ঠুরে, সব তোমারই স্নেহের হাসি। সুখই পাই বা দুঃখই পাই, সব তোমারই ভালোবাসার স্পর্শ। যখন মৃত্যু এসে পরিচিতের কোল থেকে কেড়ে নেয় অন্ধকারে, তখন দেখি তোমার মুখই সবচেয়ে পরিচিত, সেই অজানা পারাবারে বুকে করে তুমিই পার করে দিচ্ছ।

তোমার মত আপন-হতে-আপন আর কে আছে ?

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
আমায় দাও সুধাময় সুর
আমার বাণী করো সুমধুর
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

'তুমি আমাব আপন, তুমি আমাব মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার। তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আনন্দস্বরূপ।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ—'ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে, 'পিতা নোঽসি' তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র—তুমি আমাদের পিতা।'

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্তজ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।'

দুখী জেনেই কাছে আসো
ছোটো জেনেই ভালোবাসো,
আমার ছোটো মুখে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

॥ ষোলো ॥

রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতিতে নামতে হল। তিনি কবি বলে সমসাময়িক ঘটনার বাইরে গিয়ে আলস্য ভোগ করেননি। ঘটনার সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি প্রতিধ্বনিত হয়েছেন। দেশাত্মবোধে জাগর-মুখর হয়েছেন। দেশাত্মবোধই তো তাঁর বিশ্বদেবের বন্দনা।

চৈতন্য লাইব্রেরীতে সভা হবে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ সে-সভায় প্রবন্ধ পড়বেন। প্রবন্ধের নাম 'ইংরেজ ও ভারতবাসী।'

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন। তোমার প্রবন্ধটা আগে একবার শোনাও।

কে জানে রাজদ্রোহ আছে কি না, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সতর্ক হওয়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে পড়ে শোনাল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করলেন। বললেন, আমিই সভাপতি হব।

রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ঘুচল।

লিখছেন প্রথম চৌধুরীকে, 'তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে আর তূণের মধ্যে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসাধ্য—আমি সেই রকম দুরদৃষ্টক্রমে পাবলিকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন আর আমার কোথাও শান্তি নেই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ।

এর আগেও একবার গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি উত্তেজক বক্তৃতা দিয়েছিলেন কলকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে। তাঁর প্রবন্ধের নাম হল 'মন্ত্রী-অভিষেক।' বড়লাটের মন্ত্রিসভায় কয়েকজন ভারতীয়কে নেওয়া যেতে পারে এ রকম একটি বদান্য মনোভাব প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। এখন কথা উঠেছে এই কটি ভারতীয়কে কে মনোনীত করবে, গভর্নমেণ্ট, না দেশবাসী জনসাধারণ ? রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ছিল, আমরা ভারতীয়রাই আমাদের মন্ত্রী নির্বাচন করব। যদি মুষ্টিভিক্ষাই দেবে মুষ্টিটাকে অন্তত শীর্ণ কোরো না।

পরে উনিশশো চল্লিশ সালে জাতীয় আন্দোলনের দিনে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : 'যখন মন্ত্রী-অভিষেক লিখেছিলুম, তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই সে লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দু কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচালুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিকয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলছি, দাঁড়ও নয় শিকলও নয়—পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ-রাঙানীর জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।'

রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে সরে থাকতে চাইলেও রাজনীতি তাঁর বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ সত্তাকে বারে বারে আকর্ষণ করে এনেছে।

পালিয়ে যান নি, পরিহার করেননি—নিরন্তর কর্মসমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছেন, আবার তারই মধ্যে অবিরল স্মরণে আহ্বান করেছেন ঈশ্বরকে।

হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময় এসো চিরসুন্দর।
দেখাও তব প্রেমমুখ পাসরি সর্বদুখ
বিরহকাতর তপ্ত চিত্ত মাঝে বিহরো॥

বিচিত্রের দূত রবীন্দ্রনাথ, তিনি নির্বিশেষের পূজারি। নির্বিশেষ রসস্বরূপই বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাত। মানবীয় চেতনা দেশকালের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু দেশকালের ঊর্ধ্বেও মানুষের আরেক চেতনা আছে, তার নাম দিব্য-চেতনা। রবীন্দ্রনাথ বারে বারে সেই চেতনায় দুর্গমের দিকে গোপনের দিকে গভীর গহনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আর সেই গভীর সত্তাতেই জীবন-দেবতার বাসা।

আমাকে তুমি প্রদীপ করে জ্বেলেছ, কিন্তু বলো সেই আলোতে আমি কোন দেবতার পূজা করব? রহস্যাবৃত অন্ধকার মন্দিরে কোন দেবতার সিংহাসন? কে সে যার জন্যে আমি নিশিদিন দগ্ধ হচ্ছি? কেন কলস-কলস চোখের জল ফেলেও সে দাহের নির্বাপণ হচ্ছে না? কে সে নির্দয় যার জন্যে আমি কাঁদছি, আমার কান্নার শেষ মিলছে না?

যে আমাকে কাঁদায় তারও আজও সন্ধান পেলাম না এ কেমন কৌতুক!

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে?

নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে।

আমি যে এত গান গাইছি কে গাওয়াচ্ছে, কোত্থেকে আসছে এই সঙ্গীত? এত যে লাবণ্যলালিত্য, এ কে ঢেলেছে? অন্তর-বিদারণ এত যে কান্না এই বা এতদিন কোথায় ছিল? যে ব্যাথা আগে কোনোদিন জানতাম না তাই এখন অনুভব করছি। যে কথা কোনোদিন ভাবিনি তাই অনিরুদ্ধ বলে চলেছি। কিন্তু কে শুনছে কান্না, কে বুঝছে কথা? আমাকে দিয়ে যদি তোমাকেই খোঁজাবে তবে তুমি গোপন হয়ে আছ কেন? দয়া করে বাইরে এসে দাঁড়াও।

বাহির হয়ে এস তুমি
যে আছ অন্তরে।

তোমার অর্থ কী তত্ত্ব কী আমাকে বলে দাও। তুমি কি শুধু আমাকে তোমার বীণাযন্ত্র করেই বাজিয়ে যাবে? তারই জন্যই কি এত যন্ত্রণার তার বাঁধা? আমার একার ব্যথায় কেন বিশ্ববেদনার স্বাদ আনো? আমার মধ্যে বিপুল বাসনা যখন জাগালে তখন কেন দিলে আবার দুস্তর বিরহ? অহরহ যদি বিরহই বিরাজ করবে তখন বাসনাকে নির্বাসনে পাঠালে না কেন? যখন তার ছিঁড়ে যাবে, গান থেমে যাবে, দীপ নিবে যাবে, তখন কী হবে? তখন কি তুমি আমাকে ফেলে তোমার রহস্যপুরীতে অন্তর্ধান করবে? তখনই কি প্রথম বুঝব আমি এখানে কেন এসেছিলাম, কেন জনতার মাঝখানে না রেখে আমাকে তুমি নিয়ে এলে অন্তরলোকে? অন্তরলোক থেকে তখনই কি তুমি বাইরে এসে দাঁড়াবে? তখনই কি তোমাকে আমি দেখতে পাব, আমার খোঁজার নিবৃত্তি হবে? তার আগে তোমাকে দেখতে পাব না?

নাহিকো অর্থ, নাহিকো তত্ত্ব
নাহিকো মিথ্যা, নাহিকো সত্য
আপনার মাঝে আপনি মত্ত—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি।
আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে
ফিরিতে হবে না খুঁজি॥

তার মানে শুধু মৃত্যুর পরেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে? তার আগে

নয়? কিন্তু আমি যে আবার জন্মাব। তুমি কি তবে আবার লুকোবে?

তবে তাই হোক। দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে॥

তোমার রূপেব অন্ত নেই আর আমার ভালোবাসারও অন্ত নেই। তাই তো এ লীলা একজন্মে ফুরিয়ে যাবার নয়। তোমাকে যে শুধু একটি বিগ্রহেই পূজা করে তৃপ্তি পাই না। আমার আগ্রহ যে অপরিমাণ, তাই তোমাব বিগ্রহও বিচিত্র।

ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমাবে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে-প্রান্তরে—
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার কাছে কাছে॥

তুমি তোমার সিংহাসনে একলা বসেছিলে। কী জানি কেন আমাকে তোমার ভালো লেগে গেল। তুমি আর তোমার বিজনবাসে থাকতে চাইলে না, একেবারে আমার অন্তরে এসে ঠাঁই করে নিলে।

ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব
সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?

নিষ্ঠুর পীডনে দলিত দ্রাক্ষার মত আমার বুক নিঙডে নিলে। কত বেডালে আমার যৌবনকাননে, তোমার ক্ষণিক খেলার জন্যে কত নয়নানন্দ মূর্তি গডলাম, কত মানসকুসুমের মালা দিলাম গলায় দুলিয়ে। কিন্তু তবুও তো এ সীমিত জীবনে তোমাকে শেষ তৃপ্তি এনে দিতে পারলাম না। কত পূজাহীন দিন চলে গেল, কত সেবাহীন রজনী। জমা হল কত স্খলন-পতন, কত ন্যূনতা-অল্পতা। তাই আবার তুমি আমার প্রতি উদাসীন হলে। আমার বাহুবন্ধনে আর বুঝি

উত্তাপ নেই। চুম্বন বুঝি মদিরাবিহীন। জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশির কি তবে অবসান হল ?

না, অবসান কোথায় ? এই সভা যদি ভেঙে যায় তবে নতুন করে আবার সভা বসাও। আমাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলো। তুমি তো নিত্য নূতন, তবে আমাকেই বা কেন তুমি পুরোনো হতে দেবে ? নতুন জীবনে আবার আমাদের নতুন বিয়ে হবে, নতুন মুখচন্দ্রিকা।

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নবরূপ, আনো নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।
তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণ,
ও মোর ভালোবাসার ধন।'

জন্মজন্মান্তরে সকল পরকালেই সেই পরমা প্রতিমা। মৃত্যুর পারেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। জীবনসিন্ধুর পরপারে গিয়েছেন কবি, নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণ-নির্মল অন্ধকার, সেখানেও সেই মায়াবিনীর সঙ্গে দেখা। সেই পরম-পরিচিত জীবন-দেবতা।

'এখানেও তুমি জীবন-দেবতা।'
'সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।'

আর ফাঁকি না দিয়ে তুমি কি একবার একাকী স্থির হয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে পার না ? কে সে অজ্ঞাত দেবতা যার জন্যে আমি অনন্ত তৃষ্ণার কাতর, নিত্য অনিদ্র, নিত্য উৎকণ্ঠিত ? কার জন্যে বাসনা-নদীর তীরে বসে আমি হৃদয় ভেঙে ভেঙে প্রতিমা গড়ছি ? বলো তুমিই কি সেই ত্রিলোকনন্দনমূর্তি, বিশ্ব-সোহাগিনী লক্ষ্মী ? আমাকে একবার দেখতে দাও, বুঝতে দাও, তোমার ঐ চিরস্থির আচ্ছাদন, ঐ নিশ্চল আকাশ, তুলে নাও খুলে ফেল, উড়িয়ে দাও মহাশূন্যে। তুমি অনাবৃত হও, উদঘাটিত হও, একবার সহস্রচক্ষু হয়ে দেখতে দাও আমাকে। 'তাই বসে একা, প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব-শেষ-দেখা।'

কোনো মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

আমার যে শুধু মর্ত্যেই নিবৃত্তি নেই, আমার যে আবার দিব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। শুধু দুঃখের অবসান নয়, সুখের উত্থান। আর সুখ কেবল বড়ো হওয়ায়, আরো হওয়ায়। সুখ শুধু বহুলতায়, বিপুলতায়, অসীমতায়, অমরতায়। আমাকে শুধু ভূমানন্দের ভাগী করো।

ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে, ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো। একরাত্রি তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মারা গেলেন। তারিখটা বাংলা তেরোশ সালের ছাব্বিশে চৈত্র। চৈতন্য লাইব্রেরীতে সভা ডাকা হল। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পড়বেন। কিন্তু সভাপতি কে হবে? নবীনচন্দ্র সেনকে লেখা হল, যদি আপনি সভাপতি হন।

নবীনচন্দ্র অস্বীকার করলেন। লিখলেন, 'সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায় আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। আমাদের শোক বড নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাশার জিনিষ করা আমি মহাপাতক মনে করি।'

রবীন্দ্রনাথ এ উক্তির উত্তরে লিখলেন: যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্ত করা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয় তেমনি পাব্লিকের হিতৈষী কোনো মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।'

অথচ নিজের মৃত্যুতে শোকসভা করতে বারণ করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন—

যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥

কার্মাটারে কিছুদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সিমলেয় গেলেন মেজদাদার কাছে,

তারপর কলকাতা হয়ে গেলেন পতিসর। পতিসর থেকে নদীপথে রাজসাহি, বন্ধু লোকেন পালিতের কাছে। এখানে হঠাৎ তিনি অনাথিনী দেশজননীর শূন্য-বিদীর্ণকরা কান্না শুনতে পেলেন, গর্বান্ধ ইংরেজ শাসনের লাঞ্ছনার কান্না। তখুনি রঙ্গময়ী কল্পনাকে বললেন,

এবার ফিরাও মোরে,
লয়ে যাও সংসারের তীরে,
ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

মধুরের অনেক সাহচর্য করেছি এবার কঠোরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। আর আরাম-রমণীয় কুঞ্জবন নয়, এবার কণ্টককঙ্করাকীর্ণ কর্মক্ষেত্র। রসসম্ভোগ নয়, রৌদ্রসম্ভোগ। সেই জীবনদেবতাই আবার ডেকেছে। এবার আর বাঁশিতে ডাকেনি, এবার ডেকেছে শঙ্খে। 'ওরে তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে?' যে প্রেমে সম্রাট করেছিল সংগ্রামে সে-ই মহীয়ান করবে।

সংগ্রামের ভূমিকায়ও রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকেই দেখলেন মহাসারথিরূপে। তার সারথ্যে যুদ্ধ করলে পর।জয়ও জয়, মৃত্যুও পরম পূর্ণতা।

যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।

যে তার ডাক শুনেছে আরামের অলসপঙ্কে সে আর বিশ্রাম করতে পারেনি, সংকটকুটিল আবর্তের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোনো নির্যাতনে সে বিচলিত হয়নি। মৃত্যুর গর্জন তো তার কাছে বংশীধ্বনি। তাকে আগুন দগ্ধ করেছে, শূল বিদ্ধ করেছে, কুঠার ছিন্ন করেছে, তবু সে ফেরেনি, প্রতিহত হয়নি। প্রেমের হোম-হুতাশন জেলে তার সমস্ত প্রিয়বস্তুকে ইন্ধন করে সেই বহ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। শেষে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে রক্তপদ্মের পূজার্ঘ্য করে তার পায়ে নিবেদন করে দিয়েছে।

কে সে ? জানি না কে ? চিনি নাই তারে—
শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে-পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—

কে সে ? সে এক মহা পথিক। নিজে তো চলেই, আবার কবিকেও ডাক দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে চলে। সে থামতে জানে না, কোথায় যে তার বাসা তাও তার জানা নেই। 'দেশ নহি, আমি যে উদ্দেশ, মোর নাহি শেষ।' দেশের জন্যে নয়, শুধু এক উদ্দেশের জন্যেই বেরিয়ে পড়া। তুমি তো উদ্দেশ কিন্তু কোন পথে যে যাব তার তো নির্দেশ নেই। পথের আবার নির্দেশ কী। পথ কেবলই পথ, আর পথ পাবার জন্যেই তো পথের বিস্তার।

সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।

কিন্তু পথ যতই দীর্ঘ হোক, আমার ভয় নেই, কেননা সে মহা-পথিকই তো আমার সহচর। আর সেই তো আমার জীবনদেবতা।

হে মহা পথিক
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম
নাইকো চরম পরিণাম।
তীর্থ তব পদে পদে
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে
আঁধারে আলোকে
সৃজনের পর্বে পর্বে প্রলয়ের পলকে পলকে।

সাধ্য নেই তোমার আহ্বানে নিঃসাড় হয়ে থাকি। তোমার আকর্ষণ যে

সকলের চেয়ে বেশি, সকলের চেয়ে প্রাণ-কাড়া।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে
তাকাই সবার মুখের পানে
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না॥

এই জীবনদেবতা কখনো দোসর, কখনো খেলার সাথি, কখনো কিশোরী প্রিয়া, কখনো বা লীলাসঙ্গিনী।

'দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে।
কোন শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।'
'জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো আমার খেলার সাথি,
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধ প্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি॥'

কোন খেলা যে খেলব কখন
ভাবি বসে সেই কথাটাই
আপন খেলার সাথি করে।
তাহলে আর ভাবনা তো নাই।
নিঠুর খেলা খেলবে যেদিন
বাজবে সেদিন ভীষণ ভেরী—
ঘনাবে মেঘ আঁধার হলে
কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি
সেদিন যেন তোমার ডাকে
ঘরের বাঁধন আর না থাকে
অকারণে পরাণটাকে
প্রলয় দোলায় দোলাতে চাই॥

কিশোরী প্রিয়া কৈশোরিকাই তো অসীমের দূতী, আর যে অসীমের দূতী

সেই তো বিচিত্ররূপিণী।

দেশের কালের অতীত যে মহাদূর
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে॥

সেই 'অনন্তের ধনকে' কিছুতেই ভুলতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। সেই কাদম্বরী দেবীর কথাই লিখলেন, 'মৃত্যুর পরে' কবিতায়, তার মৃত্যুর দশ বছর পরে। 'ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে, দেখো তারে সর্বদৃশ্যে, বৃহৎ করিয়া।'

উঠিতেছে চরাচরে
অনাদি অনন্ত স্বরে
সঙ্গীত উদার,
সে নিত্য গানের সনে
মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।

সেই তো 'বহুধৈকমূর্তি জীবনদেবতার আরেক প্রতিকৃতি।

লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যিনি 'আমি'-নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে লোক-লোকান্তর যুগ-যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যস্তভাবে সুখ দুঃখ অশ্রু হাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ—'চিত্রা' গ্রন্থে আমি তাহাকেই বিচিত্র-ভাবে বন্দনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই, যিনি বিশেষরূপে আমার, যিনি ছাড়া আর কেহ বা কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, চিত্রা-কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।'

হ্যাঁ, তারই কথা। শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিমার্ণব ঈশ্বর-নামটা ভীষণ পোশাকি, কবিতায় তাকে নিয়ে কে টানাটানি করে? কবিতায় তার অনেক রকম ডাক-নাম। দোসর, খেলায় সাথি, পথের সাথি, পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে। কখনো বা গুরু, খেলার গুরু, সুরের গুরু, কখনো বা আদি কবি, আদি গুরু। 'আমার কাছে কী চাও তুমি,' ওগো খেলার গুরু, কেমন খেলার ধারা,' আবার 'সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা,' শেষে 'তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে,.

মন্ত্র তোমার মন্ত্রিত সব ভুবনে।' কখনো বা শুধু 'গুণী'—'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' কিংবা 'শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে, গুণী মোর, ও ।' নয়তো শুধু বন্ধু, 'দুঃখ রাতের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।' নয়তো সখা, 'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না, সংহারগহনে নির্ভয় নির্ভর, নির্জন সজনে সঙ্গে রহো।' আরেক ভাবে অমূর্তরূপে বলা হোক, 'অরূপরতন' 'পরশরতন।' তারপর সেই কথাই তো আবার বলা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা, 'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ—' আর তাই তো 'চিত্রা'— 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী।'

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করছেন: 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী।'

সে বিচিত্রই আবার বিশেষ। নানাখানা একত্র হয়েই এক। টুকরো-গুলোকে মিলিয়ে নিলেই পরিপূর্ণ। উপনিষদ লোকজীবন বা জীবজগৎকে উপেক্ষা করে না, লোকজীবন ও জীবজগৎকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং ঔপনিষদিক মোহ নয়, ঔপনিষদিক স্বচ্ছতা।

'জয় তব বিচিত্র, আনন্দ হে কবি, জয় তোমার করুণা॥'

॥ সতেরো ॥

শূন্য সন্ধ্যাবেলা সঙ্গীহীন প্রবাসে একলা বসে বই পড়ছিলাম। সৌন্দর্যতত্ত্বের বই, বিশ্রুত কোনো পণ্ডিতের লেখা। পড়ছিলাম, পড়ে পড়ে শিখছিলাম কাকে সৌন্দর্য বলে। কোন কোন উপাদানে কবিত্বকলা লাবণ্যে বিকশিত হয়। সৌন্দর্যস্রষ্টা হিসাবে গেটে শেলি কোলরিজ—কে কোন শ্রেণীতে পড়ে, কার কেমন মূল্যায়ন। বহুক্ষণ ধরে পড়ে পড়ে মাথা গরম হয়ে উঠল, মনে হল এ সমস্তই বৃথা কথা,—সৌন্দর্য সুরুচি কবিত্ব কল্পনা সমস্তই লিপিবণিকদের শব্দের

কুয়াসা—শুধু অসার আলস্যে তর্কারণ্যে বিচরণ করে বেড়ানো।

তন্দ্রাতুর শ্রান্ত চোখে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম মধ্যরাত্রি। বই বন্ধ করে একপাশে রেখে দিলাম। বাতি নিবিয়ে দিলাম একফুঁয়ে।

তন্মুহূর্তেই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল।

যেমনি আলো নিবল, খোলা দরজা আর জানালা দিয়ে চারদিক থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আমার ঘরে এসে পড়ল, পড়ল আমার চোখে মুখে বুকে—সর্বাঙ্গে। সে এক ভুবনপ্লাবিনী সুধাবন্যা। চকিতে তোমাকে চিনলাম, অনন্তের অন্তরশায়িনী প্রেয়সীকে, সুন্দরীকে। মনে হল তুমি একটি মধুর পরিহাসে উদ্‌ঘাটিত হলে। কাকে বলে সৌন্দর্য, তারই একটি সরল-সবল ব্যাখ্যায় সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত আচ্ছন্ন করলে। সেই কখন থেকে অভিসারিকার বেশে দরজার কাছটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ বিশ্ব-ভরা বিস্তীর্ণ নীরবতা। আমি তো গৃহকোণে বসে তোমাকে খুঁজছিলাম, খুঁজছিলাম পুঁথির মধ্যে, তর্কজালবিজড়িত শব্দারণ্যে, শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ অক্ষরের সমাবেশে। বুঝতেই পারিনি, ক্ষণিক দীপের ক্ষুদ্র শিখাটুকু নিবিয়ে দিলেই তোমাকে দেখা যায়, পাওয়া যায়—তত্ত্বকথার ইতি হলেই তুমি তর্কাতীতরূপে প্রতীত হও।

কী জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে।
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটি কত বৃথা বাক্য উঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌনবাণী।

রবীন্দ্রনাথ মর্ত-চেতনা থেকে দিব্য-চেতনার উত্তীর্ণ হলেন। অহং-এর আলো-টুকু ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলেই আত্মার জ্যোৎস্নায়, দিক-দেশ ভরে গেল। অহং-এর শিখাই আত্মার বিশ্বব্যাপিনী আনন্দকান্তিকে আড়াল করে রেখেছে।

সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন চিঠিতে :

'রাত্রি অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে একফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেওয়ামাত্রই হঠাৎ চারদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মত

নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতি ক্ষুদ্র বিদ্রূপ হাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম তাহলেও সে আমার এই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই বিলীন হয়ে যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষ রাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মতো শুতে যেতুম তাহলেও সেই বাতির আলোরই জিত থেকে যেত, অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত— আপনাকে গোপন করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।'

ঈশ্বর তেমনি গোপন হয়েও প্রকাশিত, প্রকাশিত হয়েও গোপন, শুধু অহং-এর উদ্ধত শিখাটা নেবাতে পাচ্ছি না বলে তাঁকে দেখতেও পাচ্ছি না।

অহংকে আত্মাতে নিয়ে যাও।

ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করো। সেইটে অহং। কিন্তু আকর্ষণ করছ কেন? তীরকে দূর নিক্ষেপ করার জন্যে। ঐ দূর হচ্ছে আত্মা। অহংকে আত্মায় উৎসর্গ করো।

বনের ফুল সাজিভরে চয়ন করলে, সাজি অহং। নদীর জল ঘটভরে আহরণ করল, ঘট অহং। এবার অহংকে আত্মায় নিয়ে যাও। সাজির ফুলকে দেবতার পায়ে নিবেদন করো, বনের ফুলকে প্রসাদী ফুল করে তোলো। ঘটের জল দিয়ে পিপাসিতের তৃষ্ণা নিবারণ করো, ঘটের জলকে জীবনামৃত করে তোলো।

অহং বদ্ধতা আত্মা মুক্তি। অহং সঞ্চয়ের দ্বারা বদ্ধ আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত। ঈশ্বরকে দেখ। তিনি কোথাও বদ্ধ নন, তিনি সর্বত্র মুক্ত কেন না তিনি কিছুই নিচ্ছেন না, কেবলই দিচ্ছেন, দিয়ে যাচ্ছেন। তুমি তেমনি তোমার অহংকে আত্মার হাতে সমর্পণ করে দাও। যা নিচ্ছ ঈশ্বরের কাছ থেকে—ধন মান বিদ্যে, তোমার যা কিছু অহং-এর সম্ভার, তা দিয়ে শুধু ধনমান বিদ্যেকেই প্রকাশ কোরো না, তা দিয়ে আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রকাশিত করো।

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম
ওহে অন্ধকারের স্বামী,
সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম
ওগো মরুক না এই আমি॥

আয়রে পাগল, ভুলবি রে চল আপনাকে
তোর একটুখানির আপনাকে
তুই ফিরিসনে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে ॥

কী বলছেন রবীন্দ্রনাথ ? বলছেন, 'বড়োকে বড়ো বলিয়া জানায় একটি আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে আনন্দ। অহংকার আমাদের নিজের সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে, বাহিরে যে বৃহত্ত্ব যে মহত্ত্ব তাহা অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।'

আবার বলছেন, 'যাঁরা সাধুপুরুষ, তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলিনে, তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ, সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।'

রবীন্দ্রনাথও সেই এক প্রকাশিত আত্মা।

তুমি আমাকে কাজের পরে কাজের শৃঙ্খলে বেঁধেছ, সহস্র কাজে, অসংখ্য কাজে। প্রাচীরঘেরা সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছ, বিশীর্ণ করে রেখেছ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তায়। নানা সাজের আবরণে নানা আচারের আভরণে রেখেছ আড়ষ্ট করে। কিন্তু হে ভীষণ, আমি জানি তুমি ইচ্ছা করলে একনিমেষে এই স্তূপীকৃত জঞ্জাল উড়িয়ে নিতে পারো, আমার জীবনে প্রকাশিত করতে পারো তোমার উদার উপস্থিতির পূর্ণিমা।

এসো হে ওহে আকস্মিক ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক
মুক্তি পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন।
তাহার 'পরে প্রকাশ হোক
উদার তব সহাস চোখ
তব অভয় শান্তিময় স্বরূপ পুরাতন ॥

'কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়।' লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।'

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিঙ্কর, কী কাজে লাগিবি ?

যত অকাজের কাজ, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। অফুরন্ত আনন্দের আয়োজন। নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকব। এক কথায় আমি

কবিতা লিখব, গান গাইব, ছবি আঁকব, আমি বিশ্বহিতের জন্যে পলিটিক্স বা সম্পাদকি করতে পারব না। শিল্প রচনা করেও তোমার কাজ করা যাবে, হিতকার্য না করতে পারি যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করতে পারব।

এই আনন্দই তো তোমার আরতির দীপমালা।

সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবির আবেদন গ্রহণ করল।

আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি—বহু যন্ত্রী
কর্মযন্ত্রে রত—তুই থাক চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্মহীন।
রাজ্যসভা বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

আমি আমার কথা দিয়ে সুর দিয়ে রঙ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তোমার সেবা করে যাব। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাই আবার তোমাকে দিয়ে যেতে হবে।

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা
সব দিতে হবে।

সব দিবি কে, সব দিবি কে পায়—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এই ডাকই বেজে চলেছে অহর্নিশ। ওরে জেগে ওঠ, সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দে—মধুলগ্ন পার করে দিসনে। তার চলে যাবার পর জেগে উঠে কী করবি, তখন কাকে দিবি তোর ধনরত্ন? তাকেই যদি দিতে না পারলি তবে তোর ধনরত্ন দিয়ে কী হবে? সে বোঝা তখন তুই বইবি কী করে, কিসের আশ্বাসে?

চলে গেলে জাগবি যবে,
ধন রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে যে দায়।

তাই জেনেই তো বলছি, আমি সমস্ত দিয়ে দেব, আমার বলে কিছুই অবশিষ্ট রাখব না। ঢেলে দেব, বিলিয়ে দেব, নিঃশেষ করে দেব—'বাকি

আমি রাখব না, রাখব না কিছুই।' আমি আমার রঙ-রস হাসি-গান গন্ধ-ছন্দ—প্রাণের সমস্ত আনন্দ দিয়ে ঢেকে দেব তোমাকে। 'আমার সকল দেব অতিথিরে, আমি বনভূমি।' নিজেকে একেবারে দেব রে কাঙাল করে দিয়ে দেব।

কিন্তু বিনিময়ে পাব কী ? না, ফলের কোনো প্রত্যাশা রাখব না। যেখানে আমি তুমিময় সেখানে আবার বিনিময় কী। সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।' সবার শেষে তুমিই তো একমাত্র বাকি থাকবে, সেই বাকিই তো অনন্ত।

'কেন রে তোর দু হাত পাতা,
দান তো না চাই, চাই যে দাতা—
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি।'

চরম দেওয়ায় সব যে তোমাকে দিতে পেরেছি এই আমার পরম পাওয়া।

আমি তোমার বিনা বেতনের কিঙ্কর।

'আমি কেবল তোমার দাসী।
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।'

শুধু তোমার সেবা করে যাব। আর মানুষকে সেবাই তোমাকে সেবা।

'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।' আর 'যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো।'

পাবনায় সাহিত্য সম্মিলন হবে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের যাবার কথা। তিনি তখন আছেন শিলাইদহে; কলকাতা থেকে প্রমথ চৌধুরী এসে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে বজরা করে। শিলাইদহ থেকে পাবনা বেশিদূর নয়। একটু উজিয়ে গিয়ে পদ্মা পাড়ি দিলেই পাবনা।

ভোরবেলা শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌছুতেই প্রমথ দেখল মণিলাল গাঙ্গুলিও যাচ্ছে, সঙ্গে ঠাকুরবাবুদের আমলা গোপাল চাটুজ্যে।

কুষ্টিয়ার টিকিট কেটে ট্রেনে চাপল সকলে।

মণিলাল বললে, 'রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফ করেছেন।'

উৎসুক হয়ে তাকাল প্রমথ।

'খবর ভালো নয়।'

চিন্তিতমুখে প্রমথ প্রশ্ন করল : 'কেন, কী হল ?'

'শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে একজনের কলেরা হয়েছে। আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

মুহূর্তে প্রমথর হরিভক্তি উড়ে গেল। তখনকার দিনের কলেরা। শুনলেই বুকের জল শুকিয়ে যায়। পাংশুমুখে প্রমথ জিজ্ঞেস করল: 'লোকটা কে?'

'তা লেখেন নি। কুঠিবাড়ির কোনো কর্মচারী হবে হয়তো।'

ট্রেন ছাড়ল।

কথা বলার মত বিষয় থাকলেও কথা বলার মতো কারো সোয়াস্তি নেই। যে বাড়িতে কলেরা সে বাড়িতে কী ভরসায় গিয়ে ওঠে।

কুষ্টিয়ায় নেমে সকলে খেয়া নৌকোয় গড়াই নদী পার হল। সেখান থেকে পালকিতে করে শিলাইদা।

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

অতিথিদের দেখে উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার টেলিগ্রামে এখানকার খবর পাওনি?'

'পেয়েছিলুম, কিন্তু মাঝপথে। ফেরবার কথা ভাবতে পাইনি।' প্রমথ রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাল: 'কি, লোকটি আছে কেমন?'

'আজ সকালে মারা গেছে।'

ধাক্কা খেল প্রমথ। জিজ্ঞেস করল, 'লোকটি কে?'

'চিনি না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রমথ।

'পথচলতি একজন হিন্দুস্থানী। কলেরা হয়ে পড়েছিল রাস্তায়। আমি খবর পেয়ে রাস্তা থেকে তাকে তুলিয়ে এনে কুঠিবাড়িতে রেখেছিলুম।' বললেন রবীন্দ্রনাথ, 'দু দিন ধরে তার সেবাযত্ন করেছি, হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছি, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলুম না।'

কুঠিবাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজন করতে প্রমথর সেদিন কী ভয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? প্রমথ সেদিন আবিষ্কার করল রবীন্দ্রনাথ মনে-মনে মৃত্যুঞ্জয়।

নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে অজ্ঞাতকুলশীল একটি অসহায় মানুষকে নিজের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন। অভিজাত জমিদার, উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। এ ক্ষেত্রে সভ্যতম মানুষের ঔদাসীন্যই তো প্রশস্ত। লোকটি যখন করাল ব্যাধিতে আক্রান্ত। ধারেকাছে হাসপাতাল আছে কিনা, হাসপাতাল থাকলেও ডাক্তার আছে কিনা, ডাক্তার থাকলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা এ সব গবেষণার মধ্যে না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে দু' হাত বাড়িয়ে সেই দরিদ্র মানুষকে, দরিদ্র নারায়ণকে, ক্লিষ্ট আর্ত মুমূর্ষুকে নিজের সেবাযত্নমমতার

'মধ্যে আহ্বান করে নিলেন। তিনি জানেন এই আর্তমানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের আরাধনা।

দৈবযোগে ঝলি ওঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো।

এ রবীন্দ্রনাথই বলেন, বলতে পারেন। বিদ্যুতের আলো অর্থ ঈশ্বরের উদ্ভাসন। যে ঈশ্বরের উপর চোখ ফেলেছে সে সব চোখেই ঈশ্বরকে দেখে। তারই পক্ষে সমস্ত মানুষকে ভালোবাসা সম্ভব যে এক ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন—
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে,
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে।

তাই রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্তায় চিরন্তন আনন্দ। সমস্ত শোক দুঃখ আঘাত অপমানেরও উর্ধ্বে এই আনন্দের নিকেতন। 'খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন।' আর যে আনন্দিত সেই ভয়শূন্য। আনন্দই তো আনন্দময়ের উপাসনা।

তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের?
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

চৈতালীতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের জনতায় নেমে এলেন। নেমে এলেন পরিমিত জগতের পরিবেশে। কিন্তু সেই পরম মমতাময় দৃষ্টিতেও খুঁজে পেলেন মানুষের অধ্যাত্ম সত্তা। ক্ষুদ্র অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হয়েও মানুষ নিত্যকাল এক বৃহৎ পরিচয় বহন করছে, তার সংগ্রামের মধ্যেও এক আধ্যাত্মিক মহিমা, তার সমৃদ্ধতর হবার চেষ্টার মধ্যেও সেই এক আধ্যাত্মিক অন্বেষণ।

কিন্তু চির পুরাতন সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—

আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি
কোথা মোরে যেতে হবে কেন আমি আছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৌকোর জানলা থেকে দেখছেন একটি ছোট মেয়ে কী গম্ভীর মুখে ঘরের কাজ করছে, কেমন তৎপরতায় নদীর ঘাটে আসা-যাওয়া করছে—এতটুকুও চাপল্য নেই লঘুতা নেই। তাকে স্নেহচক্ষে দেখছেন রবীন্দ্রনাথ

আর অন্তরে সমস্ত মানুষের প্রতি প্রকৃতির প্রতি অপরিমেয় আত্মীয়-মমতা অনুভব করছেন। তবুও এ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যাকে চিনি না জানি না তার প্রতি এত মমতা আসে কী করে, কে দেয়? আর যদি মেয়েটিকে জানতাম, সে যদি আমার পরম আত্মীয়ও হত, তাহলেই বা তার কতটুকু জানা হত।

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।

ঐ ছোট মেয়েটির জীবনের ধারাও কোন পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে কোন পরিণামে অগ্রসর হবে কে বলবে। ইচ্ছে করে ওকে অনুসরণ করি, দিনের পর দিন ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকি, দেখি ওকে দূর থেকে। দেখি কবে কৈশোর থেকে ও যৌবনে উপনীত হয়, কোন অজানা গ্রামে ওর বিয়ে হয় একদিন, কবে শেষে ও মা হয়, কবে আবার জীবলীলা সাঙ্গ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। না, সাঙ্গ করা নেই, স্তব্ধ হওয়া নেই—কবে আবার কোন নতুন পথ ধরে, আবার কোন নতুন জগতে জন্ম কার নতুন উদ্ঘাটন।

দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি।
কোন অজানিত গ্রামে, কোন দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ—তারো পরে, হায়
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

জীবনকে শুধু জীবনের স্বরূপেই দেখা নয়, তার মহৎ পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতেও দেখা। অথচ জীবন কেবল তত্ত্ব নয়, জীবন রূপ রস রঙ গন্ধ—তার পরিপূর্ণ আস্বাদে তিনি জাগ্রত আবার তিনি জাগ্রত পরিণামের রহস্যে পরিণামের বিস্ময়বোধে। জীবন তো রহস্যেই মধুর, জগৎও এই রহস্যেই সুন্দর। রহস্যকে বাদ দিয়ে যেটা থাকে সেটাই ভাগ্যের পরিহাস।

যার খুশি রুদ্ধ চোখে করো বসি ধ্যান
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

দিনের আলোকে তো বটেই, প্রাণেরও আলোকে। আর এই প্রাণের আলোটিই তো ভালোবাসা।

'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া যায় এ মুখের পানে।'

জীবনের আদিম কথাটি কী, না বা সেইটিই অন্তিম কথা। সেইটিই একমাত্র কথা। সেটি কী? সেটি হচ্ছে—হে চির-সুন্দর, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার মধ্যে ভালোবাসা না থাকলে তোমাকে সুন্দর বলে কে দেখত, কে বলত, কে ছবি আঁকত। মৃত্যু দ্বারা বেষ্টিত জীবনের ক্ষণমিলনে যে ভঙ্গুর সুখটুকু, তাও তুমি সুন্দর বলে আস্বাদনীয়। নইলে ঐ ঠুনকো সুখ নিতে কে হাত বাড়াত? ভঙ্গুরতার মধ্যে ক্ষণিকতার মধ্যেও তোমার সৌন্দর্য। আর মৃত্যু? মৃত্যুর ডাক তো তোমারই ডাক।

'তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্বচরাচরে।'

প্রথম মিলন ভীতি ভেঙেছে বধূর
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুব।
সর্বত্র বিবাহ বাঁশি উঠিতেছে বাজি
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

জীবনকে নিঃশেষ কবে লাভ করব আবার জীবনেব অতীত যে সত্তা তাকেও আস্বাদ করব। জগৎকেও সর্বাঙ্গীণ স্বীকার করব আবাব জগদতীত বিপুল অস্তিত্বকেও প্রণাম করব।

যাহা কিছু হেরি চোখে তাহা তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যেও প্রেম, দেশ-কালেব গণ্ডির উর্ধ্বেও প্রেম। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক।

যেন এ জগৎ নাহি কিছু নাহি আর
যেন শুধু আছে এক মহাপারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তার মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।

নিত্যকাল মহাপ্রেমে বাস বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

আমার এই প্রেমও ঈশ্বরেরই করুণা।

আগে প্রেম দেন তারপরে তার টানে সমস্ত বিশ্ব অন্তরে প্রবেশ করে।

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে।
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

আর মানুষও তখন দূরে থাকে না।

কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের বাহির দ্বারে
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে।
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে-জনে॥

॥ আঠারো ॥

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো।
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

আমার পৃথিবীও আছে আকাশও আছে। স্বতন্ত্র হয়ে নেই, একাত্ম হয়ে আছে। গাছের মূলও আছে মাথাও আছে। মাটি না হলে গাছ বাঁচে না আকাশ না হলে গাছ বাড়ে না। ধূলির কণিকাটিকে যেমন আমার চাই তেমনি আবার চাই তারার মণিকাটিকে।

ধন্য রে আমি অনন্তকাল
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরণী।

যেমন চাই মানবচেতনা তেমনি চাই দিব্যচেতনা। আর মানুষই এই দুই চেতনায় বিভূতিমান। দুই সত্তায় অস্তিত্ববান। সে যেমন প্রেয়সীকে খোঁজে তেমনি আবার দেবীকেও খোঁজে।

'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।'

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী।
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।

সৌন্দর্যলোকের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মলোকে প্রবেশ। ইন্দ্রিয়ের তোরণ পেরিয়েই তবে সে জ্যোতির্লোকে উত্তরণ। কিছু পরিহার করে নয় সমস্ত পরিপাক করে। যেখানে যতটুকু বিষ সমস্তকে অমৃত করে তুলে।

জমিদারি পার্টিশান হয়ে গেল। সে সব রবীন্দ্রনাথকেই তদারক করতে হল। যেতে হল উড়িষ্যায়, সাজাদপুরে। দুটো পরগণাই পড়ল গগনেন্দ্রনাথদের হিস্যায়। সাজাদপুর ছেড়ে দিতে রবীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক কষ্ট হল। কত দিন-রাত্রির কত মমতা দিয়ে সাজাদপুরের জল মাটি আলো বাতাস তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, কত শব্দ কত স্তব্ধতা, কত আনন্দ কত বিষাদ—প্রকৃতির সঙ্গে কত মানসিক ঘরকন্না—তার বিচ্ছেদে কাতরতা স্বাভাবিক। বিষয় বণ্টন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন কাকে বলে স্বার্থ, ক্ষুদ্রতম কণার জন্যে কী উন্মত্ততম লালসা, কী নিদারুণ বিরোধ-বিদ্বেষ! যার যা পাবার নয় তাও নাও কাড়াকাড়ি করে, অতিরিক্ত নাও, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাতে রিক্ততা কোথায়? তাঁর কিসের অভাব, কিসের দারিদ্র্য? তাঁর কাব্য আছে গান আছে প্রেম আছে প্রকৃতি আছে—তাঁর ঈশ্বর আছে।

হে বিলাসী, অনেক ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছ, কিন্তু সে শুধু আছে তোমার নিজের উপভোগে, রুদ্ধদ্বার একাকী কক্ষে কিন্তু সেখানে তো নিখিলের আশীর্বাদ নেই, সেখানে সূর্যও ওঠে না চাঁদও ওঠে না, আর মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়ালেই তা মুহূর্তে পাংশু পাণ্ডু হয়ে যায়, কিছুই আর তার অবশিষ্ট থাকে না। আর আমার ঐশ্বর্য? আমার ঐশ্বর্য আমার গান—যে গান অফুরন্ত, কথা ফুরোলেও যার সুর ফুরোয় না, যে গান নিখিলের মর্মকথারই প্রতিধ্বনি। তাই অরণ্যের মর্মর, নদীর কলোচ্ছ্বাস বা শ্রাবণের ধারাপাত—সব কিছুর সঙ্গেই আমার গানের অন্তরঙ্গতা। তাই হে বিষয়ী, আমার ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুমি প্রতিযোগিতা করতে এস না। তোমার সম্পদকে ঘরের মধ্যেই পুরে রাখো, বাইরে বিশ্বের দরবারে তার স্থান নেই।

আমি কী নিলাম জানতে চাও? আমি নিলাম প্রেম, 'যার মুখে অনন্তের

বাণী অমৃতে-অশ্রুতে মাখা।' আর নিলাম—বিশ্বাস।

মোর তরে থাক
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক।

বিশ্বাসের কথা শুনে তোমরা পরিহাস করবে জানি। কিন্তু আমি উপলব্ধি করছি বিশ্বাসই আমার শক্তি, আমার শান্তিমন্ত্র—আর যে-শক্তিতে শান্তি তার চেয়ে আর বড় সম্পদ কী আছে?

কী বিশ্বাস? বিশ্বাস, আমার হৃদয়ে আমার অন্তরঙ্গতম বন্ধু, আমার জীবন-দেবতা বিরাজ করছে।

থাক মহাবিশ্ব, থাক হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।

আমি এই স্বার্থের বেচাকেনার হাট ছেড়ে কাল অন্যত্র চলে যাব, চলে যাব আমার নিজের কাজে, কিন্তু হে অন্তর্যামী, তুমি আমাকে ছেড়ো না, জনতা-পাথারে কর্মকোলাহলের মাঝে ফেলে রেখো না। ক্রূর স্বার্থের কী নির্লজ্জ বিকৃতি, তার একটি ধূলিকণা বুঝি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মুখ ঢেকে দিতে পারে, মিথ্যে করে দিতে পারে সমস্ত স্নেহসখ্য আত্মীয়তা। দুঃখে দৈন্যে দুর্দিনে যত আর্ত-ধ্বনিই উঠুক তোমার বীণায় যেন চিরদিন মঙ্গলের সুর বাজে। বিদ্বেষের বাণ বুক বিদ্ধ করে যদি রক্ত টেনে আনে তুমিই তাতে তোমার সুধাস্পর্শের সান্ত্বনা প্রলেপ বুলিয়ে দিও। বিরোধের ভুজঙ্গ যখন ফণা তুলে গর্জন করে উঠবে তোমার শান্তিমন্ত্র যেন তাকে বশীভূত করে রাখে।

শান্তিমন্ত্রটি কী? আর কিছু নয়, আর কিছু নেই, তুমিই আমার নিত্যসত্য।

স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—বোলো কানে-কানে—
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

কে আমার থেকে কী কেড়ে নিবে?

'কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন জনে করে বঞ্চিত?'

তোমার চরণকমলের রত্নরেণুই আমার পরম সম্পদ—সে সম্পদে আমার অন্তর ভরে আছে, কার সাধ্য তা কেড়ে নেয়? কত শেল-শূল মর্মে এসে বিদ্ধ হচ্ছে কিন্তু সমস্ত ক্ষতমুখে তোমার পীযূষস্পর্শ এসে লাগছে, মুহূর্তে নিরাময় হয়ে উঠছি। কে কাড়বে আমার আরোগ্যের সৌভাগ্য? তোমার করুণ করপল্লব যখন অবিচ্ছিন্ন সুধাসঞ্চার করছে তখন হে পরাণবল্লভ, আমার আর পিপাসা

কোথায়? কত আঘাতে অপমানে আমাকে নতশির করতে চেয়েছে, কিন্তু তখনি তুমি তোমার নিজের হাতে আমার কপালে তিলকরঞ্জন এঁকে দিয়েছ— আমার আর কোথায় অসম্মান? যার যা আছে তাই থাক, তাই নিয়ে তারা সুখী হোক, আমার শুধু তুমি থাকো, শুধু অনুভবে নয়, প্রত্যক্ষে থাকো। শুধু জীবনে নয়, চোখে চোখে থাকো, থাকো সকল দৃশ্যে, সকল মানুষে। আমার হৃদয়ের গোপনে রাখা এই বিত্ত কে অপহরণ করবে?

কিশোরী ভাইঝি অভিজ্ঞা মারা গেল। হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। এত সব বিরোধ-বিবাদের মধ্যে আবার মৃত্যুশোক। এই মৃত্যুই বুঝি এক স্থির উপস্থিতি। 'সর্বত্র তোমার ক্রোড।' সর্বত্র তোমারই বিরাট মূর্তি। এ অনন্ত বিশ্বে তাকে তুমি কোনখানে রাখলে? আমার এই নৌকোয় কলকণ্ঠে সে কত কথা কইত, একটি নির্ঝরের স্নেহের মত কত তার দৌরাত্ম্য ছিল আমার উপর, কখনো বা সজল মেঘের মত নিবিড় করুণায় ভরে উঠত তার চোখ দুটি, কখনো বা স্রোতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইত মৃদু-মৃদু—সে আজ আর কোথাও রইল না এই বাস্তবতাকে মানি কী করে? কিন্তু আজ বিশ্বের অনন্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে সেই বিশেষ কণ্ঠস্বরটি কোথায়?

সেই বিশেষের জন্যেই তৃষ্ণা। সেই বিগ্রহের জন্যে। সেই বিশেষই আবার অশেষের মাঝে কবিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জীবন যতটুকুই স্থায়ী হোক সে এক নিত্যপ্রবাহের তরঙ্গমাত্র। প্রবাহ ছাড়া তরঙ্গ নেই, তরঙ্গ ছাড়া প্রবাহ নেই।

তবু প্রাণ নিত্যধারা,
হাসে সূর্য চন্দ্র তারা।

তরঙ্গকে আঁকড়ে ধরে আসক্তের মত যতই কাঁদি না কেন নিরাসক্ত প্রবাহে ভাসতেই হবে। মৃত্যুই সেই প্রবহমানতার অভিজ্ঞা।

অনন্ত যেমন সত্য ক্ষণখণ্ডটুকুও তেমনি সত্য। ক্ষণকে অনন্তের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে তার অপরূপত্ব থাকে না। ক্ষণিকের করপুটেই তো অনন্তের প্রসাদ। ক্ষণিকের অতিথিই তো চিরকালের আত্মীয়।

কলকাতায় কংগ্রেস বসল। রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' গাইলেন। তাঁর সুধাস্যন্দী শক্তিমান কণ্ঠে দেশমাতার বন্দনা নবীন প্রেরণা বহন করে নিয়ে এল। নিয়ে এল তাঁর ভারতলক্ষ্মীকে।

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী।
জনক-জননী-জননী।'

তারপরেই নিদারুণ দুঃসময়ে সেই রবীন্দ্রনাথের অভয় মন্ত্র, অশোকমন্ত্র—

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

শুধু চলো, এগিয়ে চলো, বেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে চলো। অচিন্তনীয় অনন্তের দিকে চলো। নিতে-নিতে চলো, দিতে-দিতে চলো। ফুরিয়ে ফেলে চলো আবার ভরে উঠতে।

'চলো চলো চলো।' বলছেন কবি, 'ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মত চলো। চলো-চলো, চলো বোঝা ফেলতে-ফেলতে চলো মরতে-মরতে নিমেষে নিমেষে। থেমো না, থেমো না, পিছন ফিরে তাকিয়ো না, পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে।'

পেরিয়ে যাও অভ্যস্তকে, আবদ্ধকে, অহংকৃতকে।

জগতের সঙ্গে চলতে চলতেই জগদতীত সত্তার উপলব্ধিতে চলে এস, জীবনের সঙ্গে চলতে-চলতে চলে এস জীবনবল্লভের অন্তরঙ্গতায়।

আনন্দের শেষ নেই, প্রেমের শেষ নেই, বড হবার শেষ নেই। দেখার শেষ নেই, জানার শেষ নেই, রহস্যের শেষ নেই।

তীর নেই, নীড় নেই, আশ্রয়শাখা নেই, আশা নেই ভাষা নেই, নেই বিশ্রামশয্যা—তবু তোর সব আছে, যেহেতু তোর পাখা আছে স্পৃহা আছে আর আছে বিস্তীর্ণ আকাশ, মহামহিম ভবিষ্যৎ। আছে আছে, সব সময়েই আছে। যদি শূন্যতা বলো সেও আছে, যদি নাস্তিকতা বলো সেও আছে। হ্যাঁ, অন্ধকার হয়েই আছে, আছে আশঙ্কা হয়ে—মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—তবু তার মধ্যে দিয়েই চলে যা, তোর চিরন্তন চলাই মুক্তি, চিরন্তন আর্তনাদই জয়ধ্বনি।

কিন্তু এ কী, এ আবার কিসের ইঙ্গিত? সংশয়ের অন্ধকারে এ আবার কিসের প্রত্যয়-চিহ্ন? 'সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি, দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।' তবে কি মর্ত চেতনার পরে দিব্য চেতনার ইঙ্গিত আছে? 'ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি, ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে

চাহিয়া।' কিসের ইঙ্গিত? 'না' দিয়ে ঢাকা বিরাট অন্ধকারের মধ্যে এ কিসের বাণী—অমলা জ্যোতির্লেখা? অন্ধকারের পরপার থেকে আমি তাকে জানতে পেরেছি। যাকে জানলে আর কাউকে পর বলে দূরে রাখা যায় না, যাকে জানলে সমস্ত বিশ্বই একনীড় হয়ে ওঠে। যাকে জানলে সমস্ত খণ্ড সমগ্রের রূপ নেয়, যাকে জানলে সমস্ত বদ্ধতা অবারিততায় উন্মুক্ত হয়।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।

মর্ত চেতনা আর দিব্য চেতনা বিচ্ছিন্ন নয়, একধারা। একই দুই হয়েছে, আবার দুয়ে মিলে এক। দ্বৈতেই অদ্বৈতের লীলা। তাই মর্ত চেতনার মধ্যেই দিব্য চেতনার আভাস, আবার যদি সেই অতলস্পর্শ নিরঞ্জন অদ্বৈত আনন্দ স্পর্শ করতে পারো তাকে তোমার মর্তচেতনায় সঞ্চারিত করে দাও। নীড় হতে নভে গিয়েছিলে আবার নভ হতে নীড়ে ফিরে এস।

বিশ্ববিধাতার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমস্ত মানুষের কাছে এসে দাঁড়াও।

তিনি শুধু বিশ্বেই নেই, তিনি আমার ঘরে আছেন। তিনি আমার জলে আছেন, আগুনে আছেন, বাতাসে আছেন, বুকের প্রতিটি নিশ্বাসে আছেন। আমার সামনে যে বৃক্ষ এও তিনিই দাঁড়িয়ে। ফলে যে মধু এ তাঁরই মধু, ফুলে যে সৌরভ এ তাঁরই সৌরভ, জলে যে শান্তি এও তাঁরই শান্তি। ঘরের মধ্যেই নিত্যের নিকেতন। দেহের মধ্যেই অনিদ্র অন্তরাত্মা।

মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়
নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি
শুধু ব্যথা হতে গীতি
তরী হতে তীর—
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি
বাসনা হইতে শান্তি
নভ হতে নীড়।

একজীবনেই কত মৃত্যু ঘটছে, প্রতি মুহূর্তই মুহূর্তের মৃত্যু। ক্ষণান্তরেই রূপান্তর। বারেবারেই নীড়ে ফিরে আসা। এই সংসারে এই কর্মমন্দিরেই ধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটানো।

কর্ম যখন শুধু নিজের স্বার্থে নিয়োজিত, নিজের লোভের তৃপ্তিতে, তখনই সেটা বন্ধন আর যখন তা ঈশ্বরে, পরমমঙ্গলে নিবেদিত, তখনই সেটা ধর্ম—বিশুদ্ধ আনন্দসাধন।

যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন, দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে, সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে
ওই ধর্ম মোর।

'বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'দক্ষিণে বামে অধোতে ঊর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শ লাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো, নিজের তুচ্ছতা দ্বারা অগ্নি-জলকে তুচ্ছ করো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ। সর্বত্রই মাথা নত হোক, হৃদয় নম্র হোক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনামূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।'

আবার বলছেন: 'তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না। কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, বনস্পতিতে আছেন।'

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥
সমুখে আকাশে চরাচরলোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে
আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥

এই দর্শন-স্পর্শনের জন্যে, এই দিব্য চেতনায় স্পন্দিতনন্দিত হবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কোনো আশ্রমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়নি। তিনি ঈশ্বরেরই দেওয়া এই গৃহস্থ সংসারে বিচিত্রজটিল কর্মের মধ্যেই সেই পরম অনুভূতির আস্বাদ পেয়েছেন। 'সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে, সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।' আর সংসারে কত কঠিন দুঃখ পেয়েছেন, কত প্রচণ্ড আঘাত, কী অভাবনীয় বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন বারে বারে, তবু অনন্ত পথের সেই অদ্বিতীয় বন্ধুকে ছাড়েন নি। প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে, তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে, নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে, তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো। তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।'

আর তাঁর কাজেরও বৈচিত্র্য অদ্ভুত। 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনা করছেন, কিংবা সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আন্দোলন করছেন এ বেশ বোঝা যায় কিন্তু কবি হয়ে জমিদারি চালাচ্ছেন এ এক অভিনব কীর্তি। তাঁর দক্ষতার উপরেই মহর্ষির নিঃসীম বিশ্বাস। জমিদারির ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়েও কবির উপরেই ভার পড়ল। সেখানে কী সব ক্ষুদ্রতা ও হিংস্রতার উৎপাত।

'লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।'

কিন্তু ত্রাণ নেই। তিনি আবার ঠাকুর-কোম্পানির ব্যবসায় নামলেন।

কাচারীতে বসে প্রজাদের চেকমুড়ি দেখছেন, মেলাচ্ছেন তলববাকির সঙ্গে, বকেয়ার উপর সুদ কষছেন, কখনো বা নালিশের হুকুম দিচ্ছেন কখনো বা

নিষ্পত্তি করে নিচ্ছেন। কখনো বা একেবারে মকুব করে দিচ্ছেন, কখনো বা কড়া হাতে কড়া-ক্রান্তিটি অবধি কুড়িয়ে নিচ্ছেন। যেখানে রূঢ়তা দরকার দৃঢ় হচ্ছেন, যেখানে নম্রতা দরকার স্বার্থকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করছেন না। কেউ অভিশাপ দিচ্ছে কেউ বা আশীর্বাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু দিনের কাজ নিপুণ হাতে সাঙ্গ করে যেতে হবে। কর্তব্যের বোঝাকে আলস্য দিয়ে শৈথিল্য দিয়ে লঘু করা যাবে না কিছুতেই।

তারপর মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে। 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার, আমার এই মলিন অহঙ্কার।' দিনের কাজে তাতে অনেক ধূলো লেগেছে, এবার স্নান করে শুচিবসন পরতে হবে। প্রেমের বসনই শুচিবসন। এবার যে তিনি আসবেন। এখনই তো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।

প্রতিদিন তাঁর সামনে অন্তত একবারটি এসে দাঁড়াও। প্রভাতে চোখ মেলেই না হোক, দিনের কাজের সমাপনের শেষে, অন্তত একবার। অনুরাগ যদি না আনতে পারো অন্তত অভ্যাসটুকু নিষ্ঠাটুকুই নিয়ে এস। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটুকু দিয়ে যাও। হোক সেটা একটা শুধু অস্ফুট চেতনা—কিংবা তার চেয়েও কম, হোক তা শুষ্কতা রিক্ততা শূন্যতা, তাই, সেই সুগভীর দৈন্যই তাঁকে নিবেদন করে দাও। সেই নিবেদনের নম্রতার মধ্য দিয়েই তাঁর দয়া ও ক্ষমার স্পর্শটি অনুভব করতে পারবে। ঐ যে প্রত্যহ অল্প করে তোমার হৃদয়ের বাতায়নটি খুলছ সেই ফাঁকটুকু দিয়েই তুমি তাঁর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাসিটি দেখতে পাবে।

তারপর সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত হবে। তখন আর ঘরেও তাঁকে ধরবে না, তিনি ঘর ছাপিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়বেন। তুমি তখন অপার আকাশের নিচে একটি বিশ্বব্যাপী প্রণাম নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াবে।

> প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
> দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে
> করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
> দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
> তোমার অপার আকাশের তলে
> বিজনে বিরলে
> নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
> দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে॥

তারপর আবার রাজনীতির ধূলো আছে। নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করবেন সত্যেন ঠাকুর। তখনকার দিনে আন্দোলন শুধু আবেদনেই আবদ্ধ ছিল আর যেহেতু আবেদন ইংরেজের কাছে, সম্মিলনের সরকারি ভাষাও তাই ইংরিজি ছিল। সভাপতির অভিভাষণ তাই ইংরেজিতেই লেখা হল। রবীন্দ্রনাথের সেটা ভালো লাগল না, তিনি সেটার বাংলা তর্জমা করে সভায় পড়ে শোনালেন।

ইংরেজি অভিভাষণ ঠিক ছিল, তার আবার বাংলা অনুবাদ কেন? বাংলায় কথা বললে কি আর সভার সম্ভ্রম থাকে? স্বদেশী ইংরেজনবিশের দল রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় শতমুখ হয়ে উঠল। প্রথম বলা হল এ অনুবাদের ভাষা কি গ্রাম্য চাষাভূষোদের বোধগম্য হবে? শোনো কথা। অনুবাদের ভাষা বোধগম্য হবে না, হবে ইংরেজি! দ্বিতীয় কথাটাই কঠিন। বলা হল, কী করবে রবি ঠাকুর, বাংলা ছাড়া যে তার উপায় নেই, সে যে ইংরেজি জানে না!

বাঙালি হয়ে বাংলা না জানলে না বুঝলে কিছু আসে যায় না, ইংরেজি না জানলেই অসম্মান।

যদি নিজের ভাষা নিয়ে গৌরবান্বিত হতে না পারি তবে যিনি আমার মুখে এই ভাষা দিয়েছেন সেই জনক-জননী-জননীরই অগৌরব।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে
কে বৃথা আশা ভরে চাহিছে মুখ'পরে
সে যে আমার জননীরে।

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়
সে যে আমার জননীরে।

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন-সন্তান করিছে অপমান
সে যে আমার জননীরে।

আমি যদি আমার মুখের ভাষাকেই মুখ্য না করি তবে যে আমার সমস্ত রচনা সাধনা বন্দনা প্রার্থনা অনান্তরিকতার দোষে অগ্রাহ্য হবে।

'হে অন্তরতর, আমাকে বড়ো করে জানবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সবদিক থেকে ঘুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও। আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধূলায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে।'

শুষ্ক গর্ব নিয়ে আত্মার ক্ষুধা মেটে না। আত্মার ক্ষুধার খাদ্য তৃষ্ণার পানীয় হচ্ছে প্রেম।

সে প্রেম আমার ভাষায় আমার দেশে আমার ঈশ্বরে।

॥ উনিশ ॥

রবীন্দ্রনাথের জীবনে আবার মৃত্যু দেখা দিল। তেরোশ ছয় সালের ভাদ্রে তাঁর চতুর্থ দাদা বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র ছেলে বলেন্দ্রনাথ মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মারা গেল। মৃত্যুটা আরো বেশি করুণ, মোটে চার বছর আগে সে বিয়ে করেছিল।

মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর,
সকলেই চলে যাবে পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।

এই বলেন্দ্রনাথ ও আরেক ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে, রবীন্দ্রনাথকে ব্যবসায় নামিয়েছিল। কোম্পানির নাম ঠাকুর-কোম্পানি। প্রথমে রঙিন কল্পনা, শেষকালে লাল বাতি। সত্তর হাজার টাকার ঋণ রবীন্দ্রনাথের কাঁধে ফেলে সেই ব্যবসা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

জমিদারি, জমিদারি-পার্টিশন, ব্যবসা, ব্যবসা-ফেল, ঋণের গন্ধমাদন। চারদিক থেকে বিপর্যয়ের তাণ্ডব। তার উপর আবার রোষরক্ত ইংরেজের অত্যাচার। সিডিশন-বিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণ। তার উপর আবার

মাসিক-পত্র ভারতীর সম্পাদনা, সন্তানদের লেখাপড়ার সমস্যা।

তবু এত সব ঝড়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হলেও তাঁর চিরন্তন আশ্রয় থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হন নি। সংসার যতই বিরুদ্ধ হোক, নিঃশব্দ-বধির হোক, ঈশ্বরের আপন হাতের ছাড়চিঠি সব সময়েই রয়েছে তাঁর অন্তরে।

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না
তোর মারে মরম মরবে না॥
তাঁর আপন হাতের ছাড়চিঠি সেই যে
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে
তোদের ধরা আমায় ধরবে না॥

'হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।'

'এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।'

ঢাকায় গেলেন প্রাদেশিক সভার অধিবেশনে। সেবারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি। তাঁর অভিভাষণের সারমর্ম বাংলায় আবার পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথ। মাতৃভূমির নিজের মুখে নিজের ভাষায় আহ্বান না পেলে জাগবে না জনগণ।

রাজনৈতিক সমস্যার পরে আছে আবার পারিবারিক সমস্যা। দেখা দিয়েছে কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ, বিচারে-বিবেচনায় অসাম্য, হৃদয়দৌর্বল্যের ক্ষুদ্রতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন :

আজ ঢাকা থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। তুমি অনর্থক মনকে পীড়িত কোরো না। শান্তস্থির সন্তুষ্টচিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বরণ করে নেবার চেষ্টা

কর। এই একমাত্র চেষ্টা আমি সর্বদাই মনে বহন করি এবং জীবনে পরিণত করবার সাধনা করি। সব সময়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারিনে—কিন্তু তোমরাও যদি মনের এই শান্তিটি রক্ষা করতে পারতে, তাহলে বোধহয় পরস্পরের চেষ্টায় সবল হয়ে আমিও সন্তোষের শান্তি লাভ করতে পারতুম। জীবনও বেশিদিনের নয় এবং সুখদুঃখ নিত্যপরিবর্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা—এ সব জিনিষকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদি দিনের পর দিন অসন্তোষে অশান্তিতে অবস্থার ছোট-ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ সঙ্ঘর্ষেই জীবন কাটিয়ে দিই—তা হলে জীবন একেবারেই ব্যর্থ। বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম—এই হল জীবনের সফলতা। যদি তুমি আপনাতে আপনি শান্তি পাও এবং চারদিককে সান্ত্বনা দান করতে পার, তাহলে তোমার জীবন সম্রাজ্ঞীর চেয়ে সার্থক।'

শান্তিই পরম শক্তি। পরম স্থিতি। পরম নিশ্বাস। 'সুখ-দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার।' 'আরাম হতে ছিন্ন করে সেই গভীরে লও গো মোরে, অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান।'

পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন হল। রবীন্দ্রনাথ সংকল্প করলেন স্ত্রী-পুত্রকে জোড়াসাঁকো থেকে শিলাইদহে নিয়ে আসবেন। কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে স্থানচ্যুত করে বসাবেন এনে নিভৃত পল্লীগ্রামে, যেখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয়, ছোটখাট বিষয়ের খোঁচায় জীবনের উদার উদ্দেশ্য সহস্রভাবে খণ্ডীকৃত হয় না।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই।
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি চলেছ,
কী কাতর গান গাই।

ওরে তারে তোরা কেউ চিনলি নারে, সে যে দীনহীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে। কেন ফিরছে? তার কি কোনো অভাব আছে? অভাব নয়, এ তার স্বভাব। সব নিয়েও সে আরো চায়। সে আরো কী? সে আরোর নাম ভালোবাসা। আমার ভুবন একে শূন্য করে দিয়েছি, তবুও তার আশা মিটছে না। তার করপুট ভরে দিয়েছি আমার প্রাণ মন যৌবন, আমার সর্বস্ব, তবু সে আরো চাইছে। সে যা চাইছে তাও যে তারই দেওয়া।

ভালোবাসাও তো তারই রুচি, তারই রচনা। কিন্তু আমার ভাণ্ডারে কতটুকুই বা ভালোবাসা আছে, কতটুকুই বা তাকে দিতে পারি? সে যদি আরো পেতে চায় তবে সে আমাকে আরো দিক—আরো আলো, আরো প্রাণ, আরো ভালোবাসা।

আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও
ফিরে আমি দিব তাই।
কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই।

ধ্যানলোকে ও মর্তলোকে দুই লোকেই রবীন্দ্রনাথের অবাধ যাতায়াত। একবার সুদূর-সুগভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, আবার কঠোরবাস্তব জীবন-জগতের স্বীকৃতি। দুইকে নিয়েই পরম পরিণত অস্তিত্ব। শুধু অতিক্রম করা, অস্বীকার করা নয়। কিন্তু সেই 'মহাসুন্দব শেষ' যে কী তার ইঙ্গিত যেন অস্পষ্ট নয়।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে।
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত বে
শান্তিসমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।

এ কিসের বিশ্রাম? হে জীবনদেবতা, তুমি আছ, তুমিই আমাকে নিয়ে এসেছ, তুমিই আবার আমাকে নিয়ে চলেছ, এই উপলব্ধিতেই বিশ্রাম। তুমি আমাকে ডেকেছ তোমার সেবা কবতে, বারে-বারে ডেকেছ, তোমার জন্যেই আমি, এই গর্বে বুক ভবে আমি আমার কাজ করে গেছি এই উদযাপনেই বিশ্রাম। তোমার ডাক কখন আসে তারই জন্যে আর ঘুম যাইনি। কত ছলনাময়ী রাত্রি এসেছে কিন্তু আমি তার স্তম্ভিত অন্ধকার থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি অভ্রান্ত ব্রহ্মমন্ত্র।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।

আত্মচেতনা থেকে আবার বিশ্বচেতনায় সম্প্রসার। অল্পে, ক্ষণিকে, অধীরে, কবির আকর্ষণ প্রচুর, কিন্তু তার পরিপূর্ণ বিশ্রাম বিশ্বে, নির্বাক নক্ষত্রলোকে, উদার বৈরাগ্যময় বিশাল ব্যাপ্তিতে; অনন্ত অনবচ্ছিন্নতায়।

জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি ॥

আর বিশ্রাম বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসে যে, যে আমার সবচেয়ে আপনার তাকে আমি চিনেছি, আর এও জেনেছি যে সে আমার আপনার মানুষ বলেই আমাকে সে ফেলে দেবে না।

'সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে।'

সুখ সংসারের, আনন্দ ঈশ্বরের। সুখ ক্ষুদ্রের আনন্দ অসীমের। আমি সুখের কাঙাল নই, আমি আনন্দের পিপাসু।

'সুখে আমায় রাখবে কেন,
রাখো তোমার কোলে,
যাক না গো সুখ জ্বলে।'

তোমার কোলেই আমার আনন্দনিবাস।

কী বলছেন রবীন্দ্রনাথ? বলছেন, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরে কোথাও পাছে ধূলো লাগে বলে সংকুচিত, আনন্দ ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দেয়, এই জন্যে সুখের পক্ষে ধূলো হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলো-ভূষণ। সুখ পাছে কিছু হারায় বলে ভীত, আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করে পরিতৃপ্ত; এই জন্যে সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ সুধাটুকুর জন্যে তাকিয়ে থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করে ফেলে। এই জন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালো-মন্দ দুইই সমান।

সংসারে থেকে সুখী হওয়া যায় হয়তো কিন্তু আনন্দিত হতে হলে ঈশ্বরের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে।

সে আনন্দ এই বিশ্বাসে যে তিনি নিজের থেকেই একদিন আমাকে তুলে নেবেন। আর এই বিশ্বাসেই নিস্তুল ও নিস্তরঙ্গ বিশ্রাম।

জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে—

এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে।

তারপরে 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ আবার প্রাণলোকে নেমে এলেন, ক্ষণালোকের প্রাণলোকে। প্রতিটি ক্ষণখণ্ডের মধ্যেই আনন্দের আলিম্পন। প্রতিটি পলকপাতেই আশ্চর্যের সাক্ষাৎকার। যে অধ্যাত্মলোকের অদ্বৈতভূমি স্পর্শ করেছে সেই শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গেয়ে উঠতে পারে। সেই তো তখন অব্যর্থকালত্বের মালিক, সার্বভৌমত্বের অধিকার তো তখন তারই হাতের মুঠোয়। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু তার কাছে আদরের ধন, সময়ের প্রতিটি স্পন্দন তার কাছে অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া।

সেই তো তখন সহজ হতে পারে। যে তুচ্ছকে অসামান্যের ছদ্মবেশ বলে ধরতে পারে সেই তো আবার আত্মীয়তার প্রশ্রয়ে অসামান্যকে তুচ্ছ করতে পারে, গম্ভীরকে লঘু করতে পারে, অনির্বচনীয়কে করতে পারে ঘরের মানুষ।

যে শাশ্বতকে মেনেছে তারই তো সত্যিকারের ক্ষণ-প্রেম। ক্ষণই তো শাশ্বতের সারবিন্দু। প্রতিটি মায়াই তো সত্যের প্রতিচ্ছায়া। প্রতিটি মানুষই তো কোন এক অপরূপের প্রতিভূ। যে সেই সত্যকে জানে, অপরূপকে মানে, সে তো সমস্ত সংসারকে সমস্ত মানবলোককে আত্মীয়দৃষ্টিতে দেখবে, আত্মীয় ভাষায় সম্ভাষণ করবে। সেই তো বলবে, 'মনেরে আজ কহ যে, ভালোমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।'

সত্য যে দারুণ সহজ, দারুণ রসিক, ভীষণ সুন্দর। শূন্য হলেও সুন্দর পূর্ণ হলেও সুন্দর। সব অবস্থাই সহজ অবস্থা। সহজই একমাত্র উপভোগ্য।

ভাগ্য যদি কৃপণয় হয়, বন্ধুরা বিমুখ হয়, ঘর বন্ধ করে বসে থাকো। আবার যদি কপাল ফেরে, শরৎ মেঘের ত্বরিত বর্ষায় যদি শুষ্ক নদী ভরে ওঠে, বন্ধ দরজায় করাঘাত বাজে, দরজা খুলে দাও, তার হাতের সঙ্গে হাত মেলাও।

অনেক তো পথে-পথে চলেছি এবার একটু বিপদে-বিপথে গেলে ক্ষতি কী। পথ-হারানোর মধ্যেই তো আবার পথ পাওয়া। অনেক তো পাঁজিপুঁথি দেখে যাত্রা করেছি, একবার অশ্লেষাতে যাত্রা করে দেখি না। হিসাব-কিতাব তো অনেক হল, একবার বেহিসেবী হয়ে দেখি না অঙ্ক কোথায় গিয়ে মেলে।' 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।' সংসারী সেজে তো অনেক নিয়মকানুন দেখলাম, এবার একবার লক্ষ্মীছাড়া হই না, দেখি না লক্ষ্মীকে পাই কি না। কে জানে লক্ষ্মী যেমন বৈকুণ্ঠে আছে তেমনি হয়তো পাতালেও আছে।

মাতাল না হলে পাতালে প্রবেশ করি কী করে? এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেই তো এক পাগল আছে, যা কিছু অভাবনীয়, তাই অকারণে ঘটাচ্ছেন, নিয়মের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীকে। স্রষ্টাই তো সব চেয়ে বেশি সৃষ্টিছাড়া। আমারও তবে পাগল হতে দোষ কী। তারই মত আমিও না হয় পাগল হলাম, মাতাল হলাম, বিপথের পথিক হলাম। দেখি না রসাতলটা কতদূর। তিনি যদি অতল রসে আছেন, রসাতলেও আছেন।

ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

যাকে খুঁজছি সে শুধু শ্রীমদ্ভাগবতেই নেই, সে গীত-গোবিন্দেও আছে। সে শুধু অতীতে নেই, ভবিষ্যতে নেই, সে আছে এই ক্ষণখণ্ডের ক্ষুদ্র অমরাবতীতে। কী হারিয়েছে তার জন্যে বিলাপ করবার সময় কই, যা এসেছে, যা আছে, তাকে নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গেলেও তো সময় চলে যাবে। যে চলে যায় সেই শুধু আপন নয়, যে আবার আসে সেও আপন। তবে আর বিলাপ কিসের? 'কখন তবে বিলাপ করি, সময় যে নেই, সময় যে নেই।'

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল রে ধেয়ে
কালের পিছু-পিছু।

শুধু দুটি দিনের ছুটি মিলেছে, প্রাণ ভরে ভালোবেসে যাই। তত্ত্বকথা না বলে কটা না হয় মিথ্যেকথাই বললাম। জ্ঞান-চক্ষু ঢেকে রেখে না হয় মায়াচ্ছন্ন চক্ষুতেই দেখলাম। বললাম, তুমি সুন্দর, তোমাকে ভালোবাসি। এ যদি আমাব ভুল হয়, সে ভুলটুকুই সুন্দর, আর ভুলকে ভালোবাসাও ভালোবাসাই।

'চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই বলব নাকো সত্যকথা।'
'জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে যায় যদি যাক খুলি।'
মর্তে যেন না ভেঙে যায় মিথ্যে মায়াগুলি।'

কিন্তু কিছুই মিথ্যে নয়, কিছুই হারিয়ে যাবার নয়। যা যায় তাও যে পাঠায় তারই কাছে যায়, অপচয় আবার কোথায় উপচয় হয়ে ওঠে। বেলায়

ফেটে যাওয়াটি রঙিন হয়েই দেখা দেয় আকাশে। 'আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।' চলে যাওয়া আর ফিরে আসা একই সুতোয় গাঁথা। সমস্ত ছন্দে-স্পন্দে রঙ্গে-ভঙ্গে যতিতে-বিরতিতে একই পদস্পর্শ।

যা কিছু পেয়েছি যাহা কিছু গেল চুকে
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে
যে মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে॥

অনন্তের থেকে কিছু বাদ পড়লেও সেও অনন্তই থাকে। তিরোভাবের শূন্য আবার আবির্ভাবে ভরে ওঠে। শোক শ্লোক হয়ে যায়। অশ্রুজলে মনকমল ফুটে ওঠে।

যাহার লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর,
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভবন মস্ত ডাগর।

কিন্তু কে সে যে হঠাৎ প্রাণের দুয়ারের শিকল নেড়ে দিল? তুমি কি প্রস্তুত নও, এখনো কি তুমি তোমার গৃহকাজ শেষ করতে পারোনি? তুমি বাইরে অভিসারে যেতে পারবে না বলেই তো সে নিজের থেকে তোমার দুয়ারে এসেছে।

শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে,
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে?

সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনো তোমার সাজ হয়নি, প্রদীপ জ্বালাওনি, পূজারতির ডালা এখনো শূন্য পড়ে আছে? কখন ডাক আসে ঠিক নেই বলে সব সময়েই তো প্রস্তুত হয়ে থাকবার কথা, তোমার কেন এই অমনোযোগ? তবু তাকে তুমি দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখ না, তার জন্যে দরজা খুলে দাও। যে প্রতিনিয়ত তোমাকে পথে টানে সেই ঘরে ধরা দিতে এসেছে। ঘর যেমন পথে বার করে, পথ আবার তেমনি ঘরে এসে বিশ্রাম খোঁজে।

না, এ বাতাসের শব্দ নয়, এ সে এক অতিথির জানান দেওয়া। সে অতিথির নাম কী? কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। সে এক অজানা অতিথি, দিনক্ষণ না মেনে হঠাৎ তার আবির্ভাব। সমস্ত যুক্তিবুদ্ধির

বাইরে সে এক আকস্মিকের ডাক।

আমি কহিলাম—কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী,
সে কহিল—আমি যারে চাই
নাম না কহিতে পারি।

তাকে চেনবার দরকার নেই তবু জীবনের এ লগ্ন তুমি ব্যর্থ হতে দিও না, নিঃসঙ্কোচে খুলে দাও দরজা। তোমার কাজ রেখে দাও, সাজগোজেরও দরকার নেই, নাই বা তার সঙ্গে কথা কইলে, তবু এ আহ্বানে তুমি অবগুণ্ঠিত থেকো না। নাম নাই জানলে, তবু এ তো সেই লোক যার চরণ পড়লে জীবন-তরী সোনা হয়ে যায়। শুধু একবারের মত এক মুহূর্তের জন্যে যদি তার পায়ের ধুলা তোমার ঘরে পড়ে, তা হলে যে তোমার জন্মমৃত্যুও সোনা হয়ে যাবে।

ভেবেছিলাম ঘাটে ঘাটে করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে নৌকো হবে সোনা।
এতবারের পারাপারে এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দুটি চরণ দেয়নি পরশ কি রে ?
যদি চরণ পড়ে থাকে কোনো একটি বারে
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে সোনার মৃত্যু-পারে॥

ক্ষণ-রত্ন-মালার মধ্যেও একটি শেষ হিসাব আছে। যাক সমস্ত ঝরে-খসে, নিবে যাক সমস্ত ক্ষণ-প্রদীপের আলো, জীবনখাতার শেষ পাতায় একটি মহাশূন্য বিরাজ করুক, বিফল সুখের বিরাট দুঃখ চেয়ে থাক মুখের দিকে, তবুও সার্থকতার অন্ত নেই। সে একলা থাকার সার্থকতা। সেই একাকিত্ব নির্বাসন নয়, সেই একাকিত্ব আরেক একাকীকে নিয়ে পরিপূর্ণ। সমস্ত ক্ষণের পর সেই তো পরমক্ষণ।

আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা
তুমি একা জগৎমাঝে
প্রাণের মাঝে আরেক একা।

সকল শূন্যতা বাইরে, অন্তরে এক পরম পরিপূর্ণতা।

শেষ বাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে
বলে যাব, পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বার বার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।

॥ কুড়ি ॥

স্ত্রী পুত্র কন্যাকে শিলাইদহে রেখে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছেন মহর্ষির আদেশে, পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরে ভাষণ দিতে। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে সংসারে, শিলাইদহে।

স্ত্রীকে লিখছেন: 'আজ তো পয়লা—এখনো ৭ই পৌষের লেখায় হাত দিতে পারি নি বলে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কাল যেমন করে হোক লিখতে বসতে হবে।'

দু'দিন পরে ফের লিখছেন: 'কাল রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার উপরে রাগ করে আছ এবং কি সব নিয়ে আমাকে বকচ। যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখলেই হয়—সংসারে জাগ্রৎ অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে—আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তা হলে তো আর পারা যায় না। সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালেও মনটা কি রকম খারাপ হয়েছিল। তার উপরে আজ সমস্ত সকাল ধরে লোক-সমাগম হয়েছিল—ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখব তা আর লিখতে দিলে না। সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখতে পেরেছিলুম।'

ক্ষণিকার পর রবীন্দ্রনাথ তখন চলে এসেছেন নৈবেদ্যে। চকিত শিহরণের জগৎ থেকে একটি দৃঢ় ও প্রশান্ত স্থিরতায়—ঈশ্বরবিশ্বাসে আর ঈশ্বরসমর্পণে। আর শুধু ক্ষণে-ক্ষণে মনে করিয়ে দেওয়া নয়, এবার এক অনবচ্ছিন্ন অনুভূতিতে অন্তর্ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া।

> তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে
>
> বাজে যেন সদা বাজে গো।
>
> তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
>
> রাজে যেন সদা রাজে গো॥
>
> 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
>
> দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।'

নৈবেদ্যের এইটিই প্রথম কবিতা বা গান আর এইটিই রবীন্দ্র-সত্তার মূল ব্রহ্মমন্ত্র। কিছু বলব না, কিছু চাইব না, না, কোন নালিশ নয়, জবাবদিহি নয়—শুধু তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। কর্ম পারাবার এই সংসারে থেকেই তাকাব তোমার দিকে। জগতের জনতার মধ্যে থেকেও একটি নির্জনতা

কুড়িয়ে নেব, কোলাহলের মধ্যে থেকেও কুড়িয়ে নেব একটি গভীর নৈঃশব্দ্য, শুধু তোমার সামনে দাঁড়াবার জন্যে। দাঁড়ালে কী হবে? দাঁড়ালে ক্ষালিত হব, কালিমামুক্ত হব। সাধনার সামগ্রী যদি কিছু থাকে তা পবিত্রতা। আর ঐ পবিত্রতা ঈশ্বর-সামীপ্যে। সুতরাং দিনের আরম্ভে কর্মের আরম্ভে কোলাহলের আরম্ভে একবার তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াও। স্তব্ধ হয়ে একবার পবিত্রতাকে উপলব্ধি করো।

'আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম, আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজ-ভাবে তার পরিচয় বহন করব।'

তাহলেই প্রতিটি দিন সেই পরশরতনের স্পর্শে সোনা হয়ে উঠবে। মুখের কথা মনের চিন্তা সংসারের কর্ম সমস্তই সোনা। 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।' তা হলেই যা তুচ্ছ তাই দামি হয়ে উঠবে, যা নিষ্ফল বলে ফেলে দিতে গিয়েছিলুম তাই দেখব ফলে ফুলে ভরে উঠেছে। ফেলে দেবার কিছু নেই, শুধুই দিয়ে দেবার। আপনাকেই দিয়ে দেবার।

'প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা, আমাদের কাজকর্ম, আমাদের বিষয়-আশয়, যা কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমস্ত বড় হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।'

শুধু তাঁর সামনে দাঁড়াও, তাঁর সামনে বোসো। এই তো উপাসনা। উপাসনা শুধু হৃদয়ের অনুভব নয়, উপাসনা চরিত্রের সম্বল।

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর—
তুমি দেহো মোরে কথা তুমি দেহো মোরে সুর।
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর,
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর॥

একদিনও ভুলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে। উপাসনায় যে মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু, তবু নিষ্ঠা হারাব ন', অভ্যাস হারাব না। দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব, দ্বার খুলুক আর নাই খুলুক। যদি এখানে আসতে কষ্টবোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায়, তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে একপাশে ঠেলে রেখেই আসব। যাকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাকে রাজা করে বসিয়ে রাখার কথা, তার কাছে শুধু একবারটি এসে বসা, তার সামনে একবারটি নত হয়ে শুধু দাঁড়ানো।

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে॥

নৈবেদ্যের দ্বিতীয় কবিতায় কবি প্রার্থনা করছেন,—

'আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।'

আমি নিজেব হাতে যত দীপ জ্বালি, তাতে শুধুই কালি, শুধুই জ্বালা। তোমার পরশমণিব প্রদীপ, তার জ্যোতি অচপল, সে আমার সমস্ত কলঙ্ককালিমা পলকে সোনা করে দেবে—তুমি আমার ঘরের দুয়ারে, আমার সংসারের শিয়রে সেই আলোটি জ্বেলে দিয়ে যাও।

আমি অহং তুমি আত্মা। আত্মা দেয় অহং সংগ্রহ করে। কিন্তু সংগ্রহ করবে নিজের ভোগের জন্যে নয়, সেই আত্মাকেই প্রকাশ করবার জন্যে। আত্মা অহং বৃক্ষে ফল ফলাক কিন্তু সে ফল যেন অহংই না আত্মসাৎ করে, সে ফল যেন আবার আত্মায়ই উৎসর্গ করে দিতে পরি।

'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।'

কিন্তু যা যায় আর যা থাকে সব যদি ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দিতে পারি তাহলে আর কিছুই হারায় না, কণামাত্র না। তা হলে পূর্ণের থেকে পূর্ণ বাদ দিলেও সেই পূর্ণই থাকে।

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে

তবে নাহি ক্ষয় সব জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।
তোমার রয়েছে কত শশী ভানু
হারায় না কভু অণু পরমাণু
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে নাকি তব পায়॥

অবশেষে ৭ই পৌষের লেখা শেষ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখছেন মৃণালিনী দেবীকে: 'আজ বোলপুর যেতে হবে। বাবামশায়কে আমার লেখা শোনালুম, তিনি দু-একটা জায়গা বাড়াতে বললেন—এখনি তাই বসতে হবে—আর ঘণ্টাখানেক মাত্র সময় আছে—'

সেই লেখাই 'ব্রহ্মমন্ত্র'।

ব্রহ্মমন্ত্রই সংসারধর্মের মূলমন্ত্র। সেটি কী? কর্ম আর ব্রহ্ম, জীবনে দুয়ের সামঞ্জস্যসাধন। কর্মের দ্বারা আমরা অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করব আর সেই মন্দির পরিপূর্ণ করে ব্রহ্ম বিরাজ করবেন। ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার, আবার কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। শুধু কর্মের দ্বারাই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করবে, লোভের দ্বারা অন্যকে পীড়িত করবে না—সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করে ভোগ করো, ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করে কর্ম করো। যারা শুধু সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তার চেয়েও গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যারা শুধু ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য ও অবলম্বনীয়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসারও সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি ও আশ্রয় করি, সংসারও তেমনি আমাদের প্রতিপদে বর্জনীয় ও গ্রহণীয়। পথ নেই বলে চোখ বুজে পথপ্রান্তে বসে স্বপ্ন দেখলে গৃহলাভ হয় না, আবার পথকেই শেষ লক্ষ্য ভেবে বসে থাকলে ঘরে পৌঁছুনো যায় না। গম্যস্থানকে যে ভালোবাসে সে পথকেও ভালোবাসে—পথ গন্তব্যেরই অঙ্গ, অংশ ও আরম্ভ। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করতে পারে না, সংসারকে সে ভালোবাসে আর সংসারের কর্মকে ব্রহ্মের কর্ম বলেই জানে।

যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য আছে কী। যে পালাতে চায় সে ভীরু, সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বলতে হবে, এই যে তাঁকে পাচ্ছি, এই যে এখনই, এই যে এখানেই। বারবার বলতে হবে, আমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকেও পাচ্ছি। আমার কর্মে যে আনন্দ সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—সেই পূর্ণতা সেই মুক্তি সেই স্বর্গ—তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।

সংসারে শত সহস্র কাজে লিপ্ত আছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সুন্দরের থেকে ঈশ্বরের থেকে কখনো বিযুক্ত হন নি। দুরূহ কাজে যত দক্ষতা, গভীরতর চিত্তে তত আত্মসমর্পণ। জমিদারি চালাচ্ছেন, কুষ্টিয়ার ব্যবসার তদারকি করছেন, জগদীশ বোস-এর গবেষণার সুবিধের জন্যে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, মহারাজার অভ্যর্থনার উপলক্ষে 'বিসর্জন' অভিনয়ের আয়োজন করছেন—তার উপর 'ভারতী'কে প্রতিমাসে লেখা জোগাতে হচ্ছে—তবু সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও মন ঈশ্বরে শুধু লগ্ন নয়, ঈশ্বরে নিমগ্ন হয়ে আছে। সমস্ত কর্মই পূজা, সমস্ত মানুষ-সঙ্গই আরাধনা।

'সবার সঙ্গ পারে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন জাগিবে হৃদয়খানিতে।'

কত লোকই তো কাছে আছে, কাছাকাছি হয়ে আছে, কিন্তু কেউ কি জানে তুমি সকলের চেয়েও নিকট, সকলের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হয়ে আছ? চারদিকে কত কোলাহল কত মুখরতা কিন্তু কেউ কি জানে আমার হৃদয় শুধু তোমার না-বলা কথাতেই ভরপুর? কেউ কি জানে দ্বার রুদ্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেও তুমি ফিরে যাও না, বজ্রবেদনায় আমাকে জাগিয়ে দিয়ে দ্বার ভেঙে তুমি ভিতরে প্রবেশ করো? যদি দেখ সিংহাসনে কেউ বসে আছে, তুমি অভিমানে সরে যাও না, সেই তোমাকে দেখে সরে পড়ে। তুমি যে প্রথম। আর যিনি প্রথম তিনি চিরকালেই প্রথম আছেন। এই প্রথমকেই যেন

আমি পরম বলে বিশ্বাস করতে পারি। আমার যেন না কোনদিন দ্বিতীয় অভিনিবেশ হয়।

হ্যাঁ, বিশ্বাস। 'শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে, এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।'

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

কিছুই বুঝি না, অথচ তোমাকে বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। তুমি যে নিশ্বাসের মত সহজ। অর্থের শেষ পাই না, তবু তোমার বাণী ঠিক এসে পৌঁছয়। চেতনায় বেদনায় ভাবনায় প্রেরণায় নিত্য নতুন তোমার সংবাদ পাই। লোকে-লোকে তোমারই যে রাজত্ব এ আমি বুঝতেই পারতাম না যদি না আমি টের পেতাম তুমি আমারই হৃদয়ে রাজধানী স্থাপন করেছ। বিপরীত দিক থেকে পড়তে গিয়েই বিপরীত অর্থ করে বসি।

বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু তাই,
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই॥

আমিত্ববোধের থেকে সুরু করতে গিয়ে জগৎ ও জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এবার তোমার থেকে যাত্রা সুরু করে পৌঁচেছি এসে নিজের অস্তিত্বে, হৃদয়ের নিভৃতলোকে, আর অমনি কিছু না বুঝেও নিমেষে বুঝে ফেলেছি তুমিই সমস্ত।

তুমি না থাকলে আমি থাকি কী করে ?

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয় স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভরে। 'আছি আর আছে।'
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর।

সংসারে যেমন কুসুম আছে তেমনি কণ্টকও বহু, যেমন আরাম আছে তেমনি সংগ্রামও দুর্নিবার। প্রাচুর্যের পাশেই রয়েছে আবার চিত্তের দীনতা,

প্রাপ্তির পরেও আকাঙ্ক্ষা, পূর্তির পরেও আবার অভিযোগ। তারপরে যেমন আছে স্তবস্তুতি তেমনি আছে আবার দারুণ অপমান। কদর্য লোকনিন্দা। সম্পদের যেমন মধু আছে তেমনি আছে আবার বিষয়ের বিষ।

এত দুর্যোগের মধ্যেও কোথাও আছে সেই অক্ষুণ্ণ নীলাকাশ।

সংসার পথে শত সংকট
ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে,
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমর তরুচ্ছায়ে।

তখন আর নিন্দাও নেই ক্ষতিও নেই, তখন বিষবাণও অমৃতের ধারা। তখনই দেখি অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে রাজা বসে আছেন। 'স্থির যোগাসনে চির আনন্দ অক্ষয় অবিনাশ।' তখন সেই রাজার রাজত্বে দুঃখও নেই বিচ্ছেদও নেই, মৃত্যুও জীবনেরই আরেক নাম। তখন সংসারভার আর ভার নয়, অন্তরগ্লানি অবাস্তব। তখন শুধু অমৃতের লহরী।

'তখন ভিতর-বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ: 'তখন জয় নয়, তখন আনন্দ, তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা, তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয়, তখন সব। তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তৎশুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা-পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকার-বিহীন প্রেম। তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।'

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জন।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত।
মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ॥

'সংসার সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়।' তাই যে সংসারে যে ঘরে আমাকে রেখেছ আমি সেই সংসারে সেই ঘরেই থাকব, সমস্ত দুঃখ ভুলে, কোনো অভিযোগ না করে—যেহেতু তুমিও সেই সংসারে সেই ঘরেই আমার কাছে থাকবে। তুমি যদি কাছে থাকো, সঙ্গে থাকো, তবে আর দুঃখ কী, তবে আর নালিশ কাকে? সংসার যদি দুঃখ দেয় সে তো তোমারই স্বাক্ষর, যদি রুক্ষভাষে কথা বলে সে তো তোমারই সম্ভাষণ। মৃত্যুও যদি আসে সে তো তোমারই আহ্বান। আমাকে শুধু তোমাকে ভালোবাসতে দাও। আমাকে

যদি সেই ভক্তি দাও তবে দুঃখ তো আমার মাথার মাণিক হয়ে থাকবে। মৃত্যু তো হবে তোমার সঙ্গেই সাক্ষাৎকার।

'সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম!' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তাহলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম, সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলই মেঘের মত সরে যাচ্ছে, কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্ছে বলেই যিনি সরে যাচ্ছেন না—মিলিয়ে যাচ্ছেন না—তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

এ সংসার কি ঈশ্বরের রচনা নয়, এত সব উপভোগের দ্রব্য কি ঈশ্বরের দান নয়? মৃত্তিকার পাত্রে কি অমৃত ধরে না? শুধু মুগ্ধতায় কি দর্শন হয় না? শুধু মানবীয় সত্তায় জাগে না কি অনন্তের পিপাসা?

শুধু জানো। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসার আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাহলে সংসার মুখ্য হয়ে ওঠে না, ঈশ্বরে পৌঁছুবার সোপান হয়ে ওঠে। বিষয় তখন বিষ না হয়ে বিষয়াতীতের সঙ্গ লাভের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। আমার বলে কোনো আসক্তি নয়, তোমার বলে আনন্দ। যে কর্মে আমাকে স্থাপিত করেছেন সে ঈশ্বরের কর্ম। সেই বোধে কর্মই তখন আমার ঈশ্বরের উপাসনা। স্বাদ গন্ধ রঙ গান—সবই তো ঈশ্বরের স্পর্শ। ইন্দ্রিয়ানুভূতিও তো ঈশ্বরানুভূতি। শুধু আসক্তির ভস্ম থেকে প্রেমের বহ্নিটুকুকে মুক্ত করো। তাহলেই আনন্দের জাগরণ। সেই জাগরণই মুক্তি। তখন যে বাজনা অন্তরীক্ষে, চন্দ্রে-সূর্যে গ্রহ-নক্ষত্রে, তাই আবার তোমার বেণুধ্বনিতে, আমার সংসার-অঙ্গনে।

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে।
খেলা মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে-থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎ সংগীত সাথে চন্দ্র-সূর্য মাঝে॥

বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ে হল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে মজঃফরপুরের উকিল শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। সে উপলক্ষে শিলাইদহ ছেড়ে সবাই কলকাতা চলে এলেন। মৃণালিনী দেবী আর সেই নির্জনবাসে ফিরে যেতে চাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ একাই ফিরলেন। চিঠি লিখলেন স্ত্রীকে :

'কাল বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে—আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। যদি অনেক রাত্রে এই ছাদের জ্যোৎস্নায় তুমি বসতে তাহলে বোধহয় আবার তোমার মন ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসত। আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়—আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখ-দুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে—তা ছাড়া অনন্ত নক্ষত্রলোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্তলোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়সার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দেখতেও পাওয়া যায় না।'

মাধুরীলতার বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকার বিয়ে হয়ে গেল—ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। আর তার প্রায় পনেরো মাস পরে মৃণালিনী দেবী মহাপ্রয়াণ করলেন।

আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ।

সকল অভ্যাস ছাড়া
সর্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো॥

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সংসার আমার কিছুই নেয়নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয়নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয়নি—একটি অণু না একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন—এমন আনন্দ আর কিছু নেই, এমন অভয় আর কী হতে পারে।'

শোকের সমুদ্র পার হয়েই তো আনন্দময়ের আরোগ্যনিবাস।

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী॥

॥ একুশ ॥

কত চিকিৎসা কত সেবা কত প্রার্থনা—তবু মৃণালিনীকে ধরে রাখা গেল না। রবীন্দ্রনাথের হাতের পাখা স্তব্ধ হল। গৃহলক্ষ্মী বিশ্বলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হল।

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে ॥

সে সব দিনে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সমস্তক্ষণ মৃণালিনীকে হাত-পাখায় হাওয়া করছেন, সেবা করছেন আপ্রাণ। কিন্তু যে দুটি চোখ কবির বিক্ষিপ্ত চিত্তকে জীবনের জটিল জাল থেকে মুক্ত করে সন্ধ্যাদীপজ্বালা গৃহকোণটিতে বারেবারে ফিরিয়ে আনত, মৃত্যুর নিশ্বাসে ধীরে ধীরে নিবে গেল। যে হাসিটি কবিকর্মের স্তূপাকার উদ্যোগের পিছনে ছিল একটি নিরলস প্রেরণা, একটি স্থির শান্ত উদার সম্মতি, তা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

প্রশ্ন হল, কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে? উত্তর হল, তা হলে যে আলোও চিনবে না, অন্ধকারও চিনবে না।

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো।' অন্ধকারের ঝরনা থেকেই জীবনের অভিষেক, অন্ধকারের স্তব্ধতার মধ্যেই মৃত্যুর উদ্‌ঘাটন। অন্ধকারেই তো ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতা।

'অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দূর।'

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আলো
গভীর অন্ধকারে ॥

অন্ধকার আলোকের অনুপস্থিতি নয়, অন্ধকার আলোকাতীত আবির্ভাব।

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।—
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোক ভাণ্ডার।

কাদম্বরীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা অস্থির আর্ত জিজ্ঞাসা জেগেছিল, এ মৃত্যু কী, এ মৃত্যু কেন, কী আছে এর নেপথ্যলোকে সে কি আগাগোড়াই

একটা অন্ধ 'না' একটা অনর্থক শূন্যতা? 'সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে একনিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না. এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।'

সুদৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসে এই মিল খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথ, 'নৈবেদ্য'ই প্রথম স্পষ্ট কণ্ঠে তা উচ্চারণ করলেন। মৃত্যু শেষ নয়, অবসান নয়, বিলোপ নয়, বিচ্ছেদ নয়, মৃত্যু এক জীবন থেকে আরেক জীবনে উত্তরণের সেতু। মর্ত জন্মের শেষ আছে, প্রাণের শেষ নেই, প্রবাহের শেষ নেই। মৃত্যু তাই অমৃতময়ের দূত। মৃত্যু দিয়ে সেই অমৃতময়ের পূজা।

পাঠাইলে আজ মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে—
আজিও রজনী তিমির-আঁধার,
ভয় ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে।
পূজিব তাহারে জোড়-কর করি
ব্যাকুল নয়ন জলে,
পূজিব তাহারে পরাণের ধন
সঁপিয়া চরণতলে।
আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি
শূন্য ভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।

মৃত্যুই নতুন তীর্থে যাবার নিশ্চিত তোরণ। সকলের জন্যেই তা উন্মুক্ত। সকলেই যে সেই তীর্থান্তরের যাত্রী।

এখন মন্দিরে তব এসেছি হে নাথ
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তারপর
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর॥

মৃত্যু সম্পর্কে এই নির্ভয় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন বলেই স্ত্রীর

মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ শান্ত-স্থির অমত্ত-গম্ভীর থাকতে পেরেছেন। বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে তিনি সম্মত নন। সংসার-ভবনদ্বারের মঙ্গলকলস আজ শান্তিরসের স্নিগ্ধসুধায় ভরা। সেই সুধারই তো আরেক নাম ভক্তি। যে ভক্তি সমস্ত হরণকে পূরণ করবে, সমস্ত ছেদকে ছন্দিত করবে, সমস্ত ব্যর্থতাকেই করে তুলবে ফলান্বিত। ভক্তি একবার হৃদয়ে প্রবেশ করলে আর ভয় নেই, শোক নেই, ক্ষয়ক্ষতি নেই—তখন কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ তখন আঘাত করলেও ভক্তি-মধু ঝরাবে।

যেখানে ভয় সেখানে দুঃখ। যেখানে অভয় সেখানে অমৃত।

মৃত্যুভয়

কী লাগিয়া হে অমৃত? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখন কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য, প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?

আয়ুর শিখাটুকু নিবে যায় কিন্তু প্রাণের শিখা অনির্বাণ। সে লোকে-লোকান্তরে দীপে-দীপান্তরে জ্বলতে থাকে। পাশের লোকটি সরে গেলে জায়গাটা শূন্য হয়েও শূন্য থাকে না, ঈশ্বরই নিজে এসে সে শূন্যতা ভরে তোলেন।

দীপ্ত দীপাবলী

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
দাও নিবাইয়া; তারপরে অর্ধরাতে
যে নির্মল মৃত্যুশয্যা পাতো নিজ হাতে
সে বিশ্বভূবনহীন নিঃশেষ আসনে
একা তুমি বসো আসি পরম নির্জনে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো রক্তমাংসের গৃহস্থ মানুষ, প্রিয়তম স্বামী—সেই মানবীয় চেতনায় তাঁর পত্নী-বিচ্ছেদের শোক তো ব্যক্তিগতভাবে নিদারুণ আন্তরিক, কিন্তু এইখানেই রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার বৈশিষ্ট্য যে তিনি সেই মানবীয় চেতনাকে ভাগবত বা অধ্যাত্মচেতনায় সফলীকৃত করেছেন। মৃত্যুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সেই স্পর্শমণি যা তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনকে পূর্ণ হতে পূর্ণতর করে তুলেছে। স্ত্রীকে সম্বোধন করে লিখছেন:

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব

মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।

সে ছোঁয়ায় বিচ্ছেদেও মিলনের পূর্ণিমা।

'মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা সনে,
এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে।'

এ উপলব্ধি সম্ভব হল যখন কবি বিশ্বাস করলেন,

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে,
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।'

যখন ক্ষণিকের সুখ-দুঃখ নিয়ে খেলাঘর বেঁধে দুজনে সংসাব করেছেন তখন সেখানেও এককোণে বিশ্বের দেবতা তাঁর আসন পেতে বসেছেন, কত মুহূর্তের পাখায় এঁকে দিয়েছেন তাঁর অসীমের স্বাক্ষর। 'কত মুহূর্তের পরে অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ।' খেলাঘরের খেলায় মত্ত হয়ে বারে বারে মনে হয়েছে এ তো সংসার-অঙ্গনের খেলা নয়, এ সেই বিশ্বদেবতার বিরাট প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণের খেলা।

চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়ালো নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে। কিন্তু স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ কোথাও নেই। ঈশ্বর বলেছেন মানুষকে, তোমাকে সেই স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কোথায় তৈরি করব? যেখানে তুমি আছ, সেই সংসারে। কেমন করে করব? শুধু তোমার সংসারে আমাকে নিয়ে চলো, তাহলেই তোমার সংসার স্বর্গ হতে সুরু করবে।

এতদিন মানুষ এ কোন শূন্যতার ধ্যান করেছে? বলছেন রবীন্দ্রনাথ: সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে-দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার-বিচারের মধ্যে এ কোন স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর-ভরা শিশু, তার মা-বাপ ভাই-বন্ধু আত্মীয়-প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে

স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না, তিনি বলেছেন, তোমাতে-আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এত বড়ো একটা চরম সৃষ্টি হতে পারে নি।

এ কথা স্মরণে রাখা কেন গো কঠিন
তুমি আছ সব চেয়ে, আছ নিশিদিন,
আছ প্রতি ক্ষণে—আছ দূরে, আছ কাছে,
যাহা কিছু আছে তুমি আছ বলে আছে।

কিন্তু মৃত্যু যদি এসে সংসারের সে খেলাঘর ভেঙে দিতে চায় তা হলে কী হবে? ঘর ভেঙে যেতে পারে কিন্তু খেলা ভাঙে না। শুধু মৃত্যুই মরে, জগতের সুধাপাত্র যেমন পরিপূর্ণ তেমনি পরিপূর্ণ থাকে। প্রাণ যেমন অবিরাম তেমনি অবিরাম বয়ে চলে। প্রাণের মালাকর মৃত্যুর সুতোয় জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে তোলেন। তাই কবির প্রেয়সীও মরে না, মৃত্যুর সাজঘর থেকে নতুন সাজে সেজে হৃদয়-মন্দিরে এসে দেখা দেয়।

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধুর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণ পাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নবরূপখানি
ল'ভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধ মুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্বাক দাঁড়ালে আসি। মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি প্রিয়া।

নইলে ব্যক্তিগত দুঃখ কি আর কম? স্ত্রী মারা যাবার পর রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। সারাদিন খান না, কোনোদিন একচামচ হবিষ্যি, কোনোদিন আবার তাও না। মাথায় যে সুন্দর চুল ছিল কদম ছাঁট করে কেটে ফেললেন। শিলাইদায় এসে কুঠিবাড়িতে আর উঠলেন না, নৌকোতেই বাস করতে লাগলেন। নিজের ব্যক্তিগত, একান্ত একলার যে দুঃখ তা বাইরে শতখানা করে প্রচার করতে গেলেন না, তাকে একটি বিশ্বজনীন বেদনায় নৈবেদ্য করে বিশ্বদেবতার পায়ে উৎসর্গ করে দিলেন।

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই—
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম—
হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে
চাহিলাম তোমা-পানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষ্ণা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো।—
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

যে কল্যাণী একদিন নববধূবেশে কবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হাতে হাত এনে রেখেছিল, সে কি শুধু এক মুহূর্তের কোনো আকস্মিক ঘটনা, শুধু অদৃষ্টের খামখেয়াল? না, তার পিছনে 'অনাদি কালের মন্ত্রণা' ছিল, দুজনের মিলনে দুজনেই পরিপূর্ণ হবে। সেই মন্ত্রণায় কত দুজনের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া হয়েছে, কত আশা, কত প্রতিশ্রুতি। অকস্মাৎ মৃত্যু এসে কি সমস্ত স্বপ্নের উচ্ছেদ ঘটাল না? না, এ মৃত্যুও অনাদি কালের মন্ত্রণা। মৃত্যু তো জীবনেরই আরেক পৃষ্ঠা, একই গ্রন্থকারের রচনা। মৃত্যুর পরে প্রেয়সী তাই 'মৃত্যুহীন নারী' হয়ে কবির জীবনে মৃত্যুর মঙ্গলমাধুরী মিশিয়ে দিলেন।

মৃত্যু-মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন।
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।

'নাস্তিত্ব নয়, মৃত্যুও অস্তিত্ব।' স্ত্রীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারও আমি কঠিন সমস্যায়

পড়েছিলাম কিন্তু এখন আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।'

স্ত্রীর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখছেন: 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন, তাহা যদি নিরর্থক হয়, তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপনার জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণকর্মের নিত্যসহায় হইয়া বলদান করিবে।'

জীবন-বাণিজ্যে দুঃখই তো একমাত্র সম্পদ যা দিয়ে ঈশ্বরের সামীপ্য পাওয়া যায়। সেই সবচেয়ে দুঃখী যে দুঃখের বর্ষায় চোখের জল ঢালতে পারল না, চোখের জল ঢালতে না পারলে বন্ধুর আসার পথ যে প্রশস্ত হয় না। দুঃখের অন্ধকার ঘনিয়ে না এলে মঙ্গলের বর্তিকাটি জলে কই? দুঃখ তো ভয়ের নয়, দুঃখের মধ্যেই দুঃখের ত্রাণ আছে, যেহেতু দুঃখ এমন একজনকে কাছে ডেকে আনে যার চেয়ে আকাঙ্ক্ষণীয় আরামরমণীয় আর কেউ হতে পারে না।

দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে॥

'মানুষ সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারা পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ: 'তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের, কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে, তাহাই দুঃখ, সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা; সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি ঈশ্বর।'

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে

আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

মানুষ তো রূপান্তর-বিধাতা। শোককে সে শ্লোক করে তুলতে পারে, দুঃখকে আনন্দ, মৃত্যুকে বিশ্বমহোৎসব।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান।
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

আমার কিসের অভাব, কিসের বিনষ্টি? আমি যে নিত্যের নিকেতনে মৃত্যুকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে এক পরম বন্ধুর সঙ্গে বসবাস করছি।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তখন যেন দেখতে পাই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে, সুখের দিন হোক, দুঃখের দিন হোক, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন প্রেম না থাকে, তখনই শান্তির জন্যে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারি নে। কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে দুঃখ যে অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তি-কেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না। আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে, অশান্তি-রূপেও আসবে, সুখ হয়ে আসবে, দুঃখ হয়েও আসবে—সে যে-কোনো বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি, তোমাকে চিনেছি বন্ধু, চিনেছি।

তোমার কাছে শান্তি চাব না
থাক না আমার দুঃখ-ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার 'পরে বোসো বোসো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা॥

যতদিন প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই, ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকালবেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিও না।

চোখের জলের সরোবরেই ঈশ্বর প্রস্ফুটিত শতদল।

শত শোক-দুঃখ আসুক, কোনো কর্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচ্যুতি নেই। তাঁকে কর্তব্যরত দেখে কে বুঝবে তাঁর অন্তরে কী গভীর শোকের সমুদ্র স্তব্ধ

হয়ে আছে। বরং সবাই দেখে আশ্বস্ত হচ্ছে সেই যন্ত্রণাকে মন্থন করে তিনি কী অমেয় প্রসন্নতা আহরণ করে এনেছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁর সমস্ত কর্মে, কাব্যে, উৎসবে, উপাসনায়। বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করছেন, চোখের বালি শেষ করে নৌকাডুবি সুরু করেছেন, শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমের বহু সমস্যার সামঞ্জস্য করতে হচ্ছে, জমিদারির চিন্তাও বা কোন না আছে, তবু সমস্ত প্রাণ ঈশ্বরেরই নিশ্বাস এই বিশ্বাসে সমাহিত থেকে যাবতীয় কর্তব্য সুচারুরূপে উদ-যাপন করে যাচ্ছেন। দুঃখই তো সর্বক্ষণ ঈশ্বরের স্বাক্ষরটি মর্মের মাঝখানে উজ্জ্বল করে রাখছে। এর মতো আনন্দ আর আছে কী!

দুঃখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে।

ঈশ্বরের সেই লিখন-স্বাক্ষরটিই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্বে, কল্পনার সমস্ত রূপায়ণে।

সংসারে আমাকে যে ঘরে রেখেছ সেই ঘরেই আমি সকল দুঃখ ভুলে থাকব যদি সেখানে তোমার আসবার জন্য একটি নিভৃত দুয়ার খুলে রাখো। সে দুয়ার দিয়ে তুমি যেমন আমার কাছে আসবে, আমিও তেমনি বেরিয়ে গিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হব। আর কোনো সুখ পাই বা না পাই, শুধু আমার এই সুখটুকু যেন থাকে যে আমি তোমার, তুমি আমার।

সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে।
কত দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে।

আর সব বিশ্বাস ভেঙে গেলেও আমার শুধু এই বিশ্বাস যেন থাকে যে অনলশিখাই আমার বুকে জ্বলুক না কেন, সে শুধু তোমার নামটিই গভীর করে জেগে দেবার জন্যে।

কোনো মান তুমি রাখ নি আমার
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো।
পাথেয় যে-কটি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি

শুধু নিজ বল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

কিন্তু দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা বা রাণীর যে নিদারুণ অসুখ, ডাক্তারেরা বলছে হাওয়া বদল দরকার। রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে নিয়ে চললেন হাজারিবাগ।

'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।'

সে পতাকা যত গুরুভারই হোক, ভয় নেই, তুমি আবার দুর্বহকে বহন করবার শক্তি জোগাবে। তুমি যে ভয়েরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ।

ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ হে ভীষণ।
কঠিন করে চরণ-পরে প্রণত করো মন।

দুঃখ দিতে চাও, দাও আরো আরো দুঃখ, কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই তো দুঃখের ত্রাণ আছে, যদি সে তোমারই হাতের দান হয়। তোমার প্রেমই তো দুঃখের আস্বাদের মধ্যে ধরা দেবে!

'দুখ হবে মোর মাথার মাণিক সাথে যদি দাও ভকতি।'

সব নিয়েও নিঃসংশয়ে তুমি যদি থাকো তাহলে আর দুঃখ কী।

দুঃখরাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।

॥ বাইশ ॥

'তব চরণের আশা ওগো মহারাজ, ছাড়ি নাই।'

ভক্ত রবীন্দ্রনাথ বলছেন ভগবানকে। যতই কেন না দীনহীন হই, অপাঙক্তেয় আর অশ্রদ্ধেয়, জানি তোমার ইন্দ্রজালে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যেতে পারে। তোমার শক্তির তোমার কৃপার কোথাও তো সীমারেখা নেই। তাই আশা ছাড়ি নি এখনো।

'এত যে দীনতা, এত লাজ, তবু ছাড়ি নাই আশা।'

তৃণদল যত নীচ যত তুচ্ছই হোক, আশা ছাড়ে নি। তুমি যখন আসবে তখন তাদের বুকে পা ফেলেই আসবে, সেই আশাতেই তারা রোমাঞ্চমুখর হয়ে আছে।

'কার পদ-পরশন-আশা, তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—'

তাই সংসারে যতই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যক্ত হই, তোমার শেষ করুণার স্পর্শ মৃত্যুর মমতা থেকে তো বঞ্চিত করবে না। যতই পিছে থাকি নিচে থাকি, তোমার দয়ায় মৃত্যু তো একদিন আসবে, আর সেই মৃত্যুতে অন্তত একবারের মত আমি তো সকলের সমান হব, সতীর্থ হব।

সবাই যাহারে ভালোবেসেছিল তারে তুমি কোল দিলে,
কারো ভালোবাসা পায় নি যেজন তুমি তারে পরশিলে।
ইহ সংসারে ভিখারির মতো
বঞ্চিত ছিল যেজন সতত
করুণ হাতের মরণে তাহারে বরণ করিয়া নিলে।
শিরে দিলে তার শীতল হস্ত ঘুচিল সকল জ্বালা
তাপিত বক্ষে পরালে তাহার জীবন-জুড়ানো মালা।
রাজা মহারাজ যেথা ছিল যারা
নদী গিরিবন রবি শশী তারা
সকলের সাথে সমান করিয়া নিলে তারে এ নিখিলে।

তাই তুমি আমাকে ফেলতে চেয়েও ফেলে দিতে পারবে না। অন্তত একবার, অন্তত অন্তিমতম মুহূর্তে, মরণ-করুণায় তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে। যদি মৃত্যু বলে কিছু না থাকত! যদি আমার দুঃখ-দারিদ্র্য আঘাত-অপমান দিনের পর দিন অন্তহীন হয়ে থাকত! যদি কিছুতেই না ফুরোত আমার ফুরিয়ে যাওয়া, আমার নৈষ্ফল্যের ভস্মস্তূপ। জীবন যতই নিষ্ঠুর হোক, নিঃস্বের জন্যেও তোমার দয়া আছে। সেই দয়ারই আরেক নাম মৃত্যু।

মরে যা অপর্ণা, সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু।

মরণের মুখে রেখে তুমি দূরে সরে যাও—

'তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে—'

এ সরে-যাওয়াও তো তোমার কৃপা। এ আমাকে ফের টেনে নেবে বলেই ফিরিয়ে দেওয়া।

'আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে বলে।' যদি তুমি ফের না-ও টেনে নাও, আমার জন্যে তোমার যদি আর ব্যথা না-ও লাগে, তবু আমার মৃত্যুকে, আমার আনন্দকে না পাঠিয়ে পারবে না।

'মৃত্যু, লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ।'

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকাকে নিয়ে পড়লেন। তার অসুখ ক্রমশই বাড়তে লাগল। আবার কর্তব্য ডাক দিল, আপ্রাণ চেষ্টা করে মেয়েকে আরোগ্যের পথে নিয়ে আসতে হবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরেছিলেন, মাস তিনেক থাকবার পর রেণুকাকে নিয়ে আবার ছাড়লেন শান্তিনিকেতন। ডাক্তারেরা বলেছে হাওয়া-বদল দরকার, ঠিক হল হাজারিবাগ যাবেন। কষ্টকর পথ, তবু ক্লান্ত হলে চলবে না। কত উদ্বেগব্যাকুলতা, কত দুঃখের দুর্যোগ, তবু কবিতায় চিত্তকে সরস রাখতে হবে। সেই সরসতাই তো ঈশ্বরের পরম আত্মীয়তা। সংসারে সেই তো আমার উৎসর্গ।

হাজারিবাগে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গের পরিচ্ছেদে উত্তীর্ণ হলেন। নৈবেদ্য উৎসর্গীকৃত হল। নৈবেদ্য স্থির, উৎসর্গ লীলায়িত। নৈবেদ্য স্পষ্ট, উৎসর্গ স্বপ্নময়। নৈবেদ্যে অস্তিত্বের প্রতীতি, উৎসর্গে অপ্রাপ্তির বেদনা। যদি বুঝি সে ঠিকই আছে, সমস্ত অন্ধকার সত্ত্বেও অসংশয় উপস্থিতি, তবে তার জন্যে বেদনাও সান্ত্বনা, শূন্যতাও অনন্ত অমৃত।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বলো তো
কেমনে বলি,
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও
খনে খনে যাও ছলি।
জ্যোৎস্নানিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে।

গিরিডি পর্যন্ত ট্রেন, তারপরে সেখান থেকে পুসপুস বা মানুষে-ঠেলা পালকি-গাড়িতে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে হাজারিবাগ। মাতৃহারা রুগ্না কন্যাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন আরোগ্যের সন্ধানে। কখনো আশা কখনো নিরাশা, কখনো বুঝছেন হৃদয়ে চরণের স্পর্শ এসে লাগছে, কখনো, 'আবার এ যে

হারাই শ্রীচরণ।' আবার ভাবছেন, আমার এ কঠিন হৃদয় কি চরণ রাখবার উপযুক্ত স্থান ?

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়
তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না ?

কিন্তু কর্তব্য করে যেতে হবে। কবি হয়ে ভক্ত হয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না, চলবে না বিরূপ-বিমুখ উদাসীন থেকে। কে জানে সাহিত্যসাধনাও কর্তব্যকর্ম। তাই সুদিনে-দুর্দিনে প্রিয়ে-অপ্রিয়ে সমস্ত অবস্থায়ই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম অব্যাহত থেকেছে। সাহিত্যসাধনাই তাঁর ঈশ্বরসাধনা। আর তাঁর সাধনা-লব্ধ যে প্রতিভা তাই তো ঈশ্বরের বিভূতি।

কেবলি তোমার স্তবে নয়
শুধু সংগীতরবে নয়,
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে,
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

হাজারিবাগে রেণুকার অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। এখন রবীন্দ্রনাথ কি করেন ? তিনি কলকাতা ফিরলেন ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে। ডাক্তাররা বললে হাজারিবাগে যখন উন্নতি হচ্ছে না তখন আলমোড়ায় নিয়ে চলুন। রবীন্দ্রনাথ আবার হাজারিবাগে ফিরে এলেন।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত
কোথা গো স্বপনবিহারী।

ঈশ্বর শুধু সংসারেই নেই, সমগ্র বহির্বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আবার বহির্বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে থেকেও বিশ্বের অতীত হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ধরা দিয়েও আবার থাকছেন আশাতীত হয়ে, সুদূর দেশের অভাবনীয় হয়ে।

সকলের কাছে তিনি অজানা, তিনি বিদেশী, কিন্তু আমার সংসারে আছেন অতি-পরিচিত হয়ে, অতি আদরের অতি আরাধনার জিনিস হয়ে, স্নেহের সেবার বাৎসল্যের কাঙাল হয়ে, কিন্তু আবার চেয়ে দেখ তিনি তোমার ঘরে নেই, সংসারে নেই, বাইরে কোথায় চলে গিয়েছেন।

'নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।'

দেবতা কি একেবারেই ঘরে নেই? কোনোকালে ছিলেন না? না, তিনি ঘরেও আছেন বাইরেও আছেন। সংসারে আছেন স্বপ্নেও আছেন। যখন ঘর ছেড়ে চলে যাবার ভঙ্গি করেন, সে শুধু বাইরেও তাঁকে দেখবার জন্যে, তাঁর সাথে মেলবার জন্যে, তাঁর বিশ্বের পথে বেরিয়ে পড়বার জন্যে। যখন সংসার-জাল-জঞ্জাল চারদিক থেকে বেঁধে জড়িয়ে অন্ধ করে ফেলে তখন আবার স্বপ্ন হয়ে হাতছানি দেন, বলেন আমি আছি—যেমন সত্যে আছি তেমনি স্বপ্নে আছি—আছি তোমার স্বপন-বিহারী, জীবন-মরণ-বিহারী হয়ে।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা
মম শূন্য গগনবিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগনবিহারী॥

রুগ্ন কন্যাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়া রওনা হলেন। আবার সেই ঠেলাগাড়ি করে পৌঁছুলেন গিরিডি। ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি গাড়ি পাবেন। কিন্তু, না, অত সহজে কিছু হবার নয়। রুগ্ন মেয়ের জন্যে রিজার্ভেশান পেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা না করে উপায় কী। অপেক্ষা করাও তো সংগ্রাম করা।

নাই বা ডাক রইব তোমার দ্বারে
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে।
জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বালো
বসে রব সেথায় অন্ধকারে॥

ডাকবাংলোয় তিনদিন অপেক্ষা করার পর রিজার্ভেশান পাওয়া গেল, কিন্তু যে গাড়িতে পাওয়া গেল তা মেল ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন। দ্বিরুক্তি করলেও

শোনে কে, ওভাবে কষ্টের বোঝা বয়েই যেতে হবে। পথ কোমল কুসুমাস্তীর্ণ হবে এ আমি আশা করি না, অ মি শুধু জানি পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। পথে বেরিয়ে পড়াই আমার একমাত্র কাজ। তারপর তিনি জানেন।

যতদিন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ না করব ততদিন আমার হারজিত আমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত আমাকে নিতে হবে। যখন আমার পালে ঈশ্বরের হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে, কিন্তু আমি সহজ বেগে চলে যাব। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের জলতরঙ্গ হয়ে উঠবে। তখন বুঝব এ আমার ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের ঢেউ। যে ঢেউয়ে উত্থান-পতন বলে কিছু নেই, শুধু গতির শান্তি, গতির নির্মলতা।

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির-রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে
অশোক আজি ফুটেছে
না যদি উঠে না যদি ফুটে
তবুও আমি চলিব ছুটে
তোমার মুখে চাহিয়া।

তোমার সস্মিত মুখের সম্মতিটি চোখের সামনে রাখতে পারলে আমার নিষ্ফলতাও নিষ্ফল হবে না।

বারো ঘণ্টা দেরিতে বেরিলিতে গাড়ি এল। সেখানে বিশ্রাম করার অবকাশ মিলল না, তখুনিই কাঠগোদামের গাড়ি ধরতে হল। কাঠগোদামে পৌঁছে না মিলল থাকবার জায়গা, না জুটল আলমোড়া যাবার কুলি। ভরদুপুরে একায় চড়ে মেয়েকে নিয়ে আসতে হল রাণীবাগ। সেখানে এক ডাকবাংলোয় আশ্রয় মিলল। সব ক্লেশ সার্থক হবে যদি রেণুকা সেরে ওঠে!

আলমোড়া বেশ পছন্দ হল, আলো ভালো বাতাস ভালো, চারদিক থেকেই যেন আরোগ্যের আশ্বাস বেজে উঠল। প্রান্তর ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ পর্বতের মহিমার রাজ্যে চলে এলেন। দেখলেন গিরিশিরে কেমন মনোহরণ মেঘ করেছে। বলে উঠলেন, হে স্নিগ্ধ ঘনবরণ, তুমি দাঁড়াও, তোমাকে দেখি। তুমি আমার সন্নিহিত হও, নিবিড় ধারা-জলে আমাকে প্লাবিত করে আমাকে তোমার

মাঝে নিরুদ্দেশ করে দাও। তুমি জানো না তোমাকে পাবার জন্যে তোমাকে ধরবার জন্যে আমিও আকাশ হয়ে উঠেছি, আমারও প্রাণে বহ্নিময় বিদ্যুৎরেখা কেঁপে-কেঁপে উঠছে, বলাকার দল উড়ে চলেছে কোন সে সমুদ্র-পারে, কোন সে পথহীন অন্ধকারের অন্তরালে। তুমি এস, আমাকে নিয়ে চলো।

ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী
তোমার সাথে যাব অকূল 'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিত হাসি
লাগবে আমার সর্বদেহে আসি
তরাস সাথে হরষ দেবে দোলা॥

এ তো সেই সুদূরের পিপাসা, বিপুলের ব্যাকুলতা। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' কিন্তু তুমি যত দূরেই টানো, তুমিই যখন টানছ তখন আর ভয় কী! আমাকে যে তুমি দুঃখ দাও সে তো তোমার রঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। আমার দুঃখে তুমি যদি হাসতে পারো তবে আমিও হাসতে পারব।

আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

আলমোড়ায় একমাসে রেণুকার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হল। চতুর্দিকে বিপর্যয়, একটু গুছিয়ে নেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে রেখে কলকাতায় ফিরলেন। কিন্তু কদিন পরেই আলমোড়া থেকে টেলিগ্রাম এল রেণুকার অবস্থা খারাপের দিকে। রবীন্দ্রনাথ তক্ষুনি আবার ছুটলেন আলমোড়া। ততদিনে রেণুকার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ এসে পড়েছে, বিপদের প্রথম ধাক্কাটা পার হওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ আবার সাহিত্যসাধনায় মন দিলেন, আবার অনন্তের ব্যাকুলতা তাঁকে পেয়ে বসল।

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা ॥

পাওয়া আর কিছুই পাওয়া নয়, দেখা পাওয়া। সেই অরূপ-অপরূপকে দেখে যেতে হবে। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে দেখা কি আমাদের হয়েছে? মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার কি এখনো অনেক বাকি নেই? আমরা কি দুঃখে-শোকেও তাঁর দক্ষিণ মুখ, পরম সুন্দর প্রসন্ন মুখ দেখতে পাচ্ছি? সকালবেলায় যে আলোতে আমাদের ঘর ভরে যাচ্ছে তার মাঝে কি তাঁর অমল-অম্লান আনন্দটুকুই আমাদের নয়নগোচর হচ্ছে? না কি শুধু এক অর্থহীন পুনরাবৃত্তি দেখছি? দেখছি প্রাণহীন অভ্যাসেরই আরেক পৃষ্ঠা?

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে,
সকালবেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে
নয়ন মেলে চাই,
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে
দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে,
সকালবেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে ॥

রেণুকার অবস্থা আবার জটিল হয়ে উঠল। কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে সে বায়না ধরল। মেয়ের অনুনয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ পরাস্ত হলেন। হয়তো বুঝলেন এই তাঁর রেণুকার অন্তিম প্রার্থনা—আত্মীয় পরিবেশেই সে তার শেষ নিশ্বাসটি রেখে যাবে।

সকন্যা রবীন্দ্রনাথ ফিরলেন কলকাতা। আর ফেরবার কয়েকদিনের মধ্যেই রেণুকা, তাঁর রাণী, চলে গেল।

স্ত্রীর মৃত্যুর নয় মাসের মধ্যে কন্যার মৃত্যু।

ওগো পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো লহো নমস্কার॥
ওগো বিদায় ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের বাতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি ওগো চিরদিনের গতি
নব আশার লহো নমস্কার॥

'হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ। হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়, তুমিই ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং।

'হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্তনেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না। তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে, সে যে পরম দুঃখেরই পথ।'

ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে,
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে।
আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

তাই কিছু হারিয়েও হারায় না, ফুরিয়েও ফুরোয় না—শুধু যাওয়া আর আসা—আসা আর যাওয়া—যা ছিল তা তেমনি সব থেকে যায়, শুধু ভালোবাসারই ক্ষয় নেই।

আছে তো তেমন যা ছিল,
হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।

আছে সেই আলো আছে সেই গান
আছে সেই ভালোবাসা,
এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

তাই আমিও আমার বাঁশিটি তুলে নিই। হে রাজন, তুমি তোমার সিংহ-দুয়ারের প্রান্তে আমাকে যে বাঁশি বাজাবার ভার দিয়েছ তা যেন কখনো না ভুলি।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার,
বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই,
প্রাণের কান্না-হাসি।

তাই, 'হে রাজন, তুমি আমারে—রেখো চিরদিন বিরাম-বিহীন তোমার সিংহদুয়ারে।' তোমার দরজায় আরো যারা সব ভিড় করে আছে, তাদের ভিক্ষা তুমি আগে চুকিয়ে দাও, আমার নিবেদন তোমার নিভৃতে, বিরলে, নিবিড় নিঃসঙ্গে। কী নিবেদন? শুধু তোমাকে আমার বাজনা শোনাব, কখনো বাঁশি, কখনো বীণা। আবার কখনো শোনাব আমার মুক্তকণ্ঠের গান।

কিছুতেই মেনে নেব না স্তব্ধতা। পরাভূত হব না।

ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবস রাত্র!

'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো, ওগো ঘুম ভাঙানিয়া। বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো, ওগো দুখ-জাগানিয়া।'

তাই চমক দিয়ে যখন আবার ডেকেছ তখন শোনো আবার আমার নতুন ভাষায় চির নতুনের গান। সেই তো 'নব প্রভাত জ্যোতি'—চিরন্তন শিশু। রবীন্দ্রনাথ শিশুর প্রাণলীলার অনাবিষ্কৃত সাম্রাজ্যে চলে এলেন।

ছুটোছুটি লাগল না আর ভালে
ঘণ্টা বেজে গেল কখন অনেক হল বেলা
তোমায় মনে পড়ে গেল, ফেলে এলেম খেলা॥

॥ তেইশ ॥

সংসারে শিশুই কোন এক আনন্দময়ের ঠিকানা। কোন এক স্নেহময়ের স্বাক্ষর। শিশু শুধু সন্তান নয়, অপত্য নয়, বংশধর নয়, শিশু বুঝি ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি।

বিশ্বনাথও তো নিত্যশিশু।

এ কি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে?

শিশুর ধূলোখেলা দেখলেই তো বিধাতার সৃষ্টিলীলার অর্থ বুঝি। শিশু তো মানবক নয়, শিশু ভোলানাথ। ভোলানাথের খেলা যেমন জীবন-মরণ, শিশুর খেলাও তেমনি গড়ে-তোলা আর ভেঙে-ফেলা।

বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে
শিশু বোঝে মোরে।
বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুসি সৃষ্টি করে তাই
এই আছে এই তাহা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙা-গড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে—

ঈশ্বরের মতই শিশু নিরন্ত নবীন। যেমন এক ঈশ্বর তেমনি এক শিশু। মানুষ যেভাবে যে মন্ত্রেই ডাকুক সেই এক ঈশ্বরকেই ডাকছে, তেমনি যেখানেই জন্মাক, আত্মীয়ের ঘরে বা অনাত্মীয়ের ঘরে, পর্ণকুটিরে বা রাজপ্রাসাদে, সেই একটি শিশুই জন্মাচ্ছে। যেমন সূর্যোদয় পুরোনো হয় না, তেমনি শিশুও পুরোনো হয় না। শিশুর মুখের হাসিটি তো আকাশে আলোর আলিম্পন।

'শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ।'

তাই যখন শিশুর রাঙা হাতে রঙিন খেলনা তুলে দিই তখনই বুঝি বিধাতার সৃষ্টিতে কেন এত রঙ লেগেছে। কেন মেঘে এত রঙ, জলে এত রঙ, ফুলে-ফলে

কেন এত রস-সুবাস ? সংসারের রঙ-মহলের একমাত্র মালিক তো এই শিশুই। যেমন পাখির কাকলি, পাতার মর্মর, নদীর কলস্বর, তেমনি এই শিশুর মুখের অব্যক্ত শব্দ। যখন লোলুপ হাতে নবনী তুলে দিই আর হাতে-মুখে ননী মেখে যখন ঘুরে বেড়ায় তখনই বুঝতে পারি নদীর জল কেন এত সুস্বাদু, ফল কেন এত রসময়! আর যখন আদরে বিহ্বল করে হাসাই তখন বুঝি আকাশ কেন এত উজ্জ্বল, বাতাস কেন এত মধুক্ষরা!

এই তো তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।

শিশুস্নেহ কেন এত মধুর ? কারণ শিশুই হচ্ছে মধুরের অধিপতি আর তাকে স্নেহ অর্থই হচ্ছে সেই অধিপতির উপাসনা। স্নেহ উপাসনা ছাড়া আর কী!

'যাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই', লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। যখন দেখেছে মা সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে-মুহূর্তে ভাঁজে-ভাঁজে খুলেও ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে শেষ করতে পারে না, তখন সে আপন সন্তানের মধ্যে আপন ঈশ্বরকেই উপাসনা করেছে।'

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।

কোন সে জন যে সবার হয়েও আবার আমার হয় ? বিশ্বের হয়েও আবার চিত্তে বিহার করতে আসে ? সেই তো আমার প্রভু, আমার প্রিয়, আমার পরমধন। সেই তো আমার প্রেমের নিত্যধামে আমারই পরম পতি।

ওগো সবার, ওগো আমার,
বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।
প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে॥

'নিজের শিশুকে যখন ভালো লাগে তখন সে বিশ্বের মূল রহস্য মূল সৌন্দর্যের অন্তর্বর্তী রয়ে পড়ে—এবং স্নেহ-উচ্ছ্বাস উপাসকের মতো হয়ে আসে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'আমার বিশ্বাস আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসামাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব—যে আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্রমিক উপলব্ধি।'

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়
প্রভাতে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজাব সিংহাসনে
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি॥

ভালোবাসাই সুন্দরকে সৃষ্টি করে, মধুরের আবির্ভাব ঘটায়। সুন্দর বলে ভালোবাসি না, ভালোবাসি বলেই সুন্দর। আর এই ভালোবাসা যে ভালোবাসে তাকেও সুন্দর করে। আর সৌন্দর্যের সহচরীই মাধুরী।

'ভালোবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোন অর্থ ই থাকে না। মধুব হওয়া, মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ, ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'খাদ্য আমাদের কাছে মধুর না হয়েও ক্ষুধার জবরদস্তিতে খাদ্য হতে পারত—শব্দ আমাদের কাছে সঙ্গীত না হয়েও নিজের গায়ের জোরেই শব্দ হতে পারত—কিন্তু যার এত জোর আছে সে তার সমস্ত জোর লুকিয়ে মধুব হতে চায় কেন? ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপন রেখে এমন কোমল এমন অপরূপভাবে ফুল হয়ে উঠছে কেন? আমরা যখন নিজে ভালোবেসে মধুর হই, মাধুরী দিই, মাধুরী লাভ করি তখন তার তাৎপর্য বুঝতে পারি।'

তাৎপর্য কী? তাৎপর্য খুব সংক্ষিপ্ত। সে হচ্ছে ভালোবাসাই পূজা। ভালোবাসাই ভগবান। আর ভগবানই নিত্যশিশু।

কে গো আছে ভুবন-মাঝে
নিত্য শিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্ব-খেলায়
খেলাঘরের জোগান দিতে।

বলো, তোমার কটি-তটের ধটি কে রাঙিয়ে দিল, তোমার গায়ে কে পরালো রঙিন আঙিয়া ! কী খেলাচ্ছলে আমার আঙিনায় তুমি ছুটোছুটি করছ, টলে-টলে পড়ছ বারে-বারে। কী সুখে মায়ের তালির সঙ্গে নাচছ তালে-তালে। রাখালবেশে হাতে বেণুর পাঁচনি ধরেছ! কী ধন তুমি পেতে চাও মার কাছে, কী সে অমের অমিয়, যা দিয়ে তোমার খিদে মিটবে! হে চিরভিক্ষুক, কিসের জন্যে তোমার এই অতৃপ্য লালসা! ইচ্ছে করে আকাশ থেকে সমস্ত বিশ্বভুবন উপড়ে এনে তোমার ললিত মুঠি দুটি ভরে দিই, তবু কি তোমার চাওয়ার শেষ হবে? মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসার কি কখনো শেষ হয়? তোমার যে সেই অশেষের পিপাসা। যত পাও তত আনন্দিত হও। ততই তুমি নূপুর বাজিয়ে নৃত্য করো। সমস্ত নিখিল আকুল মনে শোনে তোমার নূপুরধ্বনি।

এ কি তবে সেই কবলিত-নবনীত বালকৃষ্ণ?

'গোরা' উপন্যাসে হরিমোহিনী বলছে: ও আমার গোপীবল্লভ, আমার জীবননাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি। বাবা, তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, এ দুটিকে—রাধারাণী আর সতীশকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পূজো আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখনি কঠিন পাথর হয়ে যাবে।'

শিশুর বিশ্বাস, শিশুর শরণাগতি। শিশুর সর্বসমর্পণ।

শিশু

দু'দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে. ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মার মুখ চেয়ে।

আর তার উত্তরে মাতৃস্নেহ। 'মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন।' একটি ছেলে এসে মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করে দেয়। আকাশে দু'হাতে উজাড় করে যে প্রেম ঢেলে দিচ্ছে ছেলেরা তাই মায়ের বুকে কুড়িয়ে পেল, মায়েরাও তা দেখে নিল ছেলের মুখে। এই মা আর ছেলে মঠে-মন্দিরে নেই, আছে সংসারে।

'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।'

সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসেছিল নত নেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে।

এই মায়ের প্রাণেই জগন্মাতা জেগে রয়েছে।

মায়ের প্রাণে তোমার লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণরূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি ওঠে চুপে চুপে॥

মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। তাঁর স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ করলেন, 'শিশু'র কবিতাগুলি সবই খোকাকে নিয়ে কেন, খুকিরা কী দোষ করল?

তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে—তার একটি প্রধান কারণ এই, যে ব্যক্তি লিখছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকি ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল—খুকির চিত্ত তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে—খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকি ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেই জন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।'

মাতৃশয্যার সিংহাসনে এই চক্রবর্তী সম্রাট শমীন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে। মায়ের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে অগ্রহায়ণ মাসে মুঙ্গেরে তেরো বছর বয়সে শমীন্দ্রের মৃত্যু হল।

তবে আমি যাই গো তবে যাই
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে

বলব আমি, নাই সে খোকা নাই।
মা গো, যাই॥

কিন্তু খোকা যে যাবার নয়। সে যে হাওয়া হয়ে মায়ের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। স্নানের বেলা জলের মধ্যে ঢেউ হয়ে খেলবে মায়ের সঙ্গে। বাদলা রাতে মাকে ঝরঝরানি গান গেয়ে শোনাবে। বিদ্যুতের ঝলক হয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মাকে দেখে যাবে। তারপর যখন ফের চাঁদনি রাত আসবে, জ্যোৎস্না হয়ে ঘরে ঢুকে মায়ের চোখে চুমু খেয়ে যাবে। মায়ের ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে ঢুকে পড়বে, মা জেগে উঠে তাঁর পাশটিতে মিথ্যে আশায় হাত বুলোবেন, খোকা কোথায়? কী মজা, খোকা আবার কোথায় কে জানে লুকিয়ে পড়বে। পুজোর সময় কত ছেলে উঠোনে খেলে বেড়াবে, বলবে, খোকা ঘরে নেই, কিন্তু মা ঠিক বুঝবেন খোকা ঘরে-বাইরে তাঁর সকল কাজে সাথে সাথে ফিরছে। খোকা তো হারাবার নয়, খোকা যে মায়ের চোখের তারায় মিশে আছে, মিশে আছে বুকের নিশ্বাসে। আগেও যেমন খোকার মায়ের প্রাণ ভরা ছিল এখনও খোকা মায়ের প্রাণ ভরে রেখেছে।

কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি॥

মৃত্যু তো সমাপ্তি নয়, মৃত্যু তো শুধু পৃষ্ঠা-ওল্টানো। শুধু রূপ হতে রূপে প্রাণ হতে প্রাণে দৃশ্যান্তরিত হওয়া।

সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।

আসলে যে কিছুই হারায় না, কিছুই ফুরোয় না, 'তোমাতে রয়েছে কত শশী-ভানু, কভু না হারায় অণু-পরমাণু,' এখানকার ঝরা মুকুল আবার কোথায় গিয়ে পরিপূর্ণ সাফল্যে ফুটে ওঠে, মরুপথে হারানো নদী কোথায় গিয়ে পায় তার সমুদ্রকে।

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে

জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।
শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে॥

শেষ কোথায়? শেষ যে অশেষেরই দৃষ্টিপাত। অশেষেরই হৃৎস্পন্দন। বন্ধন শেষ হয়, স্পন্দন শেষ হয় না। সীমার অহঙ্কার চলে যায়, অসীমের অলঙ্কার হয়ে দেখা দেয়।

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ?
কী মহিমা
জ্যোতিহীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি
গড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার
হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহঙ্কার।

শমীর আসন্ন মৃত্যু কি রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নেই অনুভব করতে পেরেছিলেন? আরো শোক, আরো দুঃখ, আরো আঘাত?

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝংকারো।

নইলে ১৩১৪-র শ্রাবণে তিনি 'দুর্দিন' লিখলেন কেন? শমীর মৃত্যু তো ঐ বছরের অগ্রহায়ণে। এ শুধু ঈশ্বরকে জানিয়ে রাখা যে শত দুঃখ-শোক এলেও কবি হার মানবেন না, কিছুতেই ছাড়বেন না ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যতই আগুন জ্বালুন, কবি আলোকিত হয়ে আলোকিত করে তুলবেন, যতই প্রহার করুন, ঈশ্বর যেন আর্তনাদ শোনবার প্রত্যাশা না করেন, কবির কণ্ঠে যেন শুনে নেন মৃত্যুঞ্জয় উৎসবের গান। ঈশ্বর বুঝি চেয়েছিলেন দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে কবিকে একেবারে নমিত-দমিত করে ফেলবেন কিন্তু ঈশ্বর দেখলেন কবি ঈশ্বরেই প্রকাশিত হয়ে উঠেছেন। কবির জীবনে মৃত্যুরই মৃত্যু ঘটল। এ যেন কবির কাছে বিধাতার পরাজয়। কবির ভয় করে না, বিশ্বাস টলে না, ঘনীভূত অন্ধকারেও পথ চিনে ঠিক দুয়ারে এসে পৌঁছয়।

ঐ আকাশ-'পরে আঁধার মেলে কী খেলা আজ খেলতে এলে
তোমার মনে কি আছে তা জানবো না।
আমি তবুও হার মানবো না, হার মানবো না।

তোমার সিংহ-ভীষণ রবে
তোমার সংহার-উৎসবে
তোমার দুর্যোগ-দুর্দিনে
তোমার তড়িৎশিখায় বজ্রলিখায় তোমায় লবো চিনে—
কোনো শঙ্কা মনে আনবো না গো আনবো না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে কিম্বা পড়ি মাটীর 'পরে
তবুও হার মানবো না, হার মানবো না॥

আমার বীণার তার ছিঁড়ে যায় তো যাবে কিন্তু দেখবে যখনই তোমার কথা বলতে সুরু করব, ছেঁড়া তারে জোড়া লাগবে, সমস্ত বেসুরো সুর সুন্দর হয়ে উঠবে। যতই যন্ত্রণা দাও, তোমার অভিমুখে যখন তা পাঠাব তখন সেই যন্ত্রণা নামঝংকার হয়ে উঠবে।

রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবাণীর তার,
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝংকার।

দেখবে ফুল ছিঁড়ে গেলেও ফুল তার মূল্য হারায় নি। তোমার গলায় তাকে মালা করতে না পারি, তোমার পায়ে তাকে অঞ্জলি করে দিতে পারব। তোমাকে দেখিয়ে দেব কী 'করে তোমার প্রহারকেও প্রসাদ করে তোলা যায়।

এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি জানে না যে
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়॥

ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে যখন আছি তখন আমার জীবন আরামে-বিলাসেই কেটে যাবে, দুধে-মধুতে ভরে থাকবে, দুঃখের নিশ্বাসটুকুও আমার গায়ে লাগবে না, সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটিয়ে দেব, কিন্তু কে জানত তোমাকে ভালোবাসা মানে ভীষণকেই ভালোবাসা, তোমার ডাকে বেরিয়ে পড়া মানে ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়া। তাই হোক, তবু ঝড়কে সাথি করেই আমি চলব, যে দুঃখই দাও তাকে জানব তোমারই ভালোবাসা, বলব, আর যার থেকেই বঞ্চনা করো, দুঃখ থেকে বঞ্চনা করো না।

তবে এস হে মোর সুহৃ:সহ ছিন্ন করে জীবন লহো।
বাজিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা ঝড়ের ঝঞ্চনা।
আমায় দুঃখ হতে কোরো না বঞ্চনা।
আমার বুকের পাঁজর টুটে
উঠুক পূজার পদ্ম ফুটে
যেন প্রলয় বায়ুবেগে
আমার মর্মকোষের গন্ধ ছুটে বিশ্ব ওঠে জেগে।
ওরে আয়রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জনা॥

যে রাত্রে শমী চলে গেল তার পরের রাত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরছিলেন, দেখতে পেলেন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে।

কী আশ্চর্য, এখনো জ্যোৎস্না, এখনো আকাশভরা আনন্দের জোয়ার। এই দারুণ শোকের প্রতি কারুর এতটুকু সমবেদনা নেই, কোথাও ম্লানিমার এতটুকু একটা চিহ্নও পড়ে নি। জীবনে এত বড় শূন্যতা আর প্রকৃতিতে কি না এতটুকু ফাঁক নেই। এ কী ঔদাসীন্য! এর অর্থ কী?

অর্থ শুধু একটাই। অর্থ এই, শোক নেই, শূন্যতা নেই, নেই কোনো অন্তর্ধান। শুধু চিরন্তন আবির্ভাব দিয়ে ভরা। সমস্ত শোকের উত্তরে এই জ্যোৎস্না, এই প্রসাদলাবণ্য। সমস্ত শূন্যতার উত্তরে এই পরিপূর্ণতা, ঈশ্বরসৌহার্দ্যের সুধারস।

কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ:

'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে-আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়ে নি,—সমস্তর মধ্যেই সব রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।'

নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম,' লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বিরাট বিশ্বসত্তার মাঝে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে।'

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।

'হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা, হঠাৎ যখন অর্ধরাতে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া ওঠে—তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন তোমাকে চাহি না—এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি —সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়— যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।'

কে বলে আমি মৃত্যুতে একাকী ? জীবনে তোমার সাহচর্য যদি নাও পাই, মৃত্যুতে পাব। আমার মৃত্যুই আমাকে তোমার সহযাত্রী করবে।

যবে মরণ আসে নিশীথ গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥

॥ চব্বিশ ॥

বিশুদ্ধ যে কবি তারও একজন ঈশ্বর আছে, নিয়ন্তা আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তারই নাম রেখেছেন জীবনদেবতা। এই সম্পর্কে বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনকে যা লিখলেন তার মর্ম এই :

আমার নিগূঢ় অস্তিত্বের মধ্যে আরেক আমি আছে, সে যেমন বৃহৎ তেমনি পুরাতন। সে অতিজগতে বাস করেও আমাকে জগতের মধ্যে সঞ্চালিত করছে। সুখে-দুঃখে অনুকূলে-প্রতিকূলে আমাকে সার্থক হতে সার্থকতর করে তোলবারই

তার নিরন্তর চেষ্টা। সে সফল হয়েও আমার সঙ্গে আছে, বিফল হয়েও আমার সঙ্গে আছে। কদাচ সে আমাকে ত্যাগ করছে না। তারই মধ্যস্থতায় বিশ্বের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যোগ। ঈশ্বরের সংবাদ, ঈশ্বরের আদেশ ঈশ্বরের আনন্দ সেই আমার মধ্যে বয়ে আনছে, আমার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখছে। তার অহরহ চেষ্টা কী করে আমার পাপকে দাহন করে আমার পুণ্যকে উজ্জ্বল করে তুলবে। আমাকে নির্মাণ করে তুলতে পারলেই তো তার সম্পূর্ণতা। তারই শক্তিতে আমি নিরন্তর মঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছি। সে আমার ব্যহ্যচেতনার অন্তরালে বসে গৃহিণীর মত আপন গোপন ভাণ্ডারে ক্রমাগতই গ্রহণ-বর্জন করে চলেছে। তার সঙ্গে প্রেমের আনন্দে যুক্ত হয়ে পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারলে তবেই অতিজগতের সঙ্গে জগতের নিত্যপ্রেমের সম্বন্ধ নিজের মধ্যেই বুঝতে পারব— তখন ঈশ্বর আমার থেকে কোনো অবস্থাতেই ব্যবহিত থাকবেন না।

সে গোপনবাসী নিগূঢ়চারী ব্যক্তিটিই জীবনদেবতা। সে কখনো গৃহিণী, কখনো সহচর, কখনো চিরবন্ধু, চিরসঙ্গী, চিরসখা।

আরো বলছেন :

'আমাদের প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার সহিত আমাদের মিলন-সাধনের চেষ্টা করিতেছে—নানা ঘটনা নানা সুখদুঃখসূত্রে সে সেই মিলনপাশ বয়ন করিতেছে—মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায়, আবার সে জোড়া দেয়, মাঝে মাঝে জটা পড়িয়া যায়, আবার সে ধীরে ধীরে মোচন করিতে থাকে। আমার সেই চিরসহিষ্ণু চিরন্তন সহচরটির সহিত—এই সূর্যালোকে, এই সমীরণে, এই আকাশের নীলিমা ও ধরাতলের শ্যামলতার মাঝখানে, এই জনতাপূর্ণ বিচিত্র কলরবমুখর মানবসভা ও প্রাঙ্গণে এই জীবনেই যেন আমার শুভ পরিণয় সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়া যায়। আমি যেন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি ও তাহার দক্ষিণ করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করি—সে আমাকে যেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে সেখানে নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে যেন যাই—তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া আমাদের মহাযাত্রাকে যেন ব্যাঘাতদুঃখে নিয়ত পীড়িত না করিয়া তুলি।'

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন
মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন ,

ধৌত করো মম মুগ্ধলোচন
তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ॥

আরো বিশদ হলেন কবি :

'আমার মধ্যে আমার এই চিরসঙ্গীর ছদ্মলীলাই আমার কবিতায় নানা সুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তখন তাহা কিছুই জানিতাম না, এখন তাহা ক্রমে-ক্রমে বুঝিতেছি। সেই চিরসঙ্গীই আমার অত্যন্ত অপরিণত বয়সেও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমার দীর্ঘকালের একান্ত আত্মীয়তার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং চিরসঙ্গীই সমস্ত সুখ দুঃখ বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে এই পরিণত বয়সে পরমাত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সে আছে, সে আমাকে ভালোবাসে, তাহার ভালোবাসা দ্বারাই ঈশ্বরের ভালোবাসা আমি লাভ করিতেছি। জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি, তাহারা যেমন জগতের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণসূত্রে বাঁধিতেছে, তেমনি আমার জীবনের দেবতা, আমার অতিজগতের সহচর. একটি অপূর্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে।'

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা ॥

তুমি আমাকে চিরন্তন পথের পথিক করেছ, শুধু তোমাকেই প্রতি পদক্ষেপে বন্ধু বলে জানব বলে—অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু—তোমাকেই দেখব বলে, ধরব বলে, তোমার সঙ্গে মিলব বলে। 'পথের পথিক ক'রেছ আমায় সেই ভালো ওগো সেই ভালো।' পথের শুধু শ্রান্তিই আছে, অন্ত নেই। আর এই পথ শুধু এই জন্মে এই জগতেই সমাপ্ত নয়, এই পথ জন্মে জন্মে গ্রহে-গ্রহে, লোকে-লোকান্তরে। এই মর্তবাস তো কয়েকটি ক্ষণখণ্ডের বিনিময়ে পান্থশালায়

বিশ্রাম নেবার মত। তারপরে আবার যাত্রা। আবার বিশ্রাম। আবার নবতর জীবনের অভীপ্সা। মৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে-পেরিয়ে নবতর উত্তরণ। আমরা আজন্ম প্রবাসী। আর আমরা পথেই বেরুই বা ঘরেই ফিরোই, আমরা লোকলোকেশ্বরের সঙ্গে প্রেমের বাঁধনেই বাঁধা পড়ে আছি। যদি প্রেম না থাকত তবে কেই বা বাসা বাঁধে, কেই বা পথে বেরোয়।

'এসেছিনু প্রবাসীর মত এই ভবে, যে প্রবাসে রাখো সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে।' 'নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে, নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।'

কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুকালে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে॥

'বড শক্ত বুঝা। যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।'

নীরব আমার পূজা তাই
স্তবগান নাই।
আর্দ্রস্বরে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে নাহি ডাকে
স্তব্ধ হয়ে থাকে।

শুধু প্রাণের পালে প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে ভেসে পড়া। তাই যেখানেই যাই, যাই হয়ে উঠি, পরাৎপরকে দেখব, পূর্ণাৎপূর্ণকেই পেতে থাকব।

হই যদি মাটি হই যদি জল
হই যদি তৃণ হই ফুলফল
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা॥

কিন্তু যে সংসারে আছি, সেও তো ঈশ্বরেরই প্রশ্রয়ে। প্রত্যক্ষের মধ্যেই তো পাচ্ছি সেই গুহাহিতের স্পর্শ। রূপের মধ্যে অপরূপের সাক্ষাৎ। পার্থিব প্রেমের মধ্যেই ভূমানন্দের চেতনা। ভঙ্গুর দেহের ভাণ্ডে অন্তহীন অমৃতের উৎসার।

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।

বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যেও খুঁজে পাচ্ছি সেই ঐক্যের সুর। সমস্ত বৈষম্য-বিশৃঙ্খলার উর্ধ্বে একটি অখণ্ড সুষমা।

তার পরে কত দয়া, কত ক্ষমা, কত সস্নেহ সম্মান। কত অহেতুক উপশম। যা চাই তা পাই না বটে কিন্তু যা পেয়েছি তারও তো কোনো যোগ্যতা ছিল না। না চাইতেও যে এত পেলাম তার মধ্যেই বা যুক্তি কী।

না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনুমন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহাদানেরই যোগ্য করে।
অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়ে মোরে।

কী মূল্য দিয়েছি, কী তপস্যা করেছি যার জন্যে পেলাম মমতার ভাণ্ডার মাতা-পিতাকে, আনন্দের ভাণ্ডার গৃহলক্ষ্মীকে, সৌজন্যের ভাণ্ডার আত্মীয়-বন্ধুকে। শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহ। একটি নিশ্বাসেও তো বিশ্বাস নেই। তবুও প্রতি মুহূর্তে আমাদের ক্ষোভ, আমাদের নালিশ আমাদের দোষদর্শন। অনেক পুরস্কার পাইনি তা ঠিক কিন্তু কত শাস্তিও তো পাই নি। শুধু ঈশ্বরের প্রশ্রয়েই বেঁচে আছি। তাঁরই আশ্রয়ে তাঁরই প্রশ্রয়ে বেঁচে থাকা।

দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে করুণানিলয়
হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্রয়।
ফিরেছি আপন মনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে নানা ব্যর্থ কাজে—তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর প্রভু।
আজ তাহা জানি। যে অলস চিন্তা-লতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা
হৃদয়ে বেষ্টিয়াছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিঞ্চন করি। দিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
দিয়ে দণ্ড-পুরস্কার সুখ-দুঃখ-ভয়
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রশ্রয়।

তুমি শুধু আনন্দই নও তুমি আবার ভয়ও। যেমন তোমার আনন্দ হতেই

সব কিছু জন্মাচ্ছে তেমনি আবার তোমার ভয়েই আগুন জ্বলছে, সূর্য তাপ দিচ্ছে। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। তুমি তো কেবল লালন-পালন নও তুমি আবার শাসন-ত্রাসন। তুমি তো কেবল সান্ত্বনা-শুশ্রূষা নও, তুমি আবার নিয়ম-শৃঙ্খল। তুমিই আবার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। তুমিই আবার আঘাত-সংঘাত।

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

হ্যাঁ, দণ্ড দাও, দুঃখ দাও, দুঃখই তো আমার অঞ্চলের নিধি, বুকের রত্নহার, মাথার মাণিক-মুকুট। বিরাট দুঃখের মধ্যেই তো আমাদের ধর্মবোধের জন্ম। ধর্ম আর কী! এক কথায়, ঈশ্বরকে ভালোবাসার নামই ধর্ম। আর যে ভালোবাসতে পেরেছে তার আবার ভয় কী। আমি তো মুখ দেখেছি, মুখোসে আমার কী ভয়। ভয় তো মুখোসমাত্র।

যত বার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

না, আর পরাজিত হব না। আমি যে দেখেছি, আম যে জেনেছি, সর্বত্র তিনিই আনন্দিত, তিনিই আলোকিত। আর যদি তাঁর আনন্দকেই সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে আর ভয় কোথায়?

আনন্দং ব্রহ্মণ্যো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।

যে উদ্যত বজ্র মহৎ-ভয়, তাকে যে জানে ঈশ্বরেরই বদান্য হাতের উপহার বলে, তার আবার মৃত্যুভয় কোনখানে?

অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে

দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

মাতৃস্নেহ পেলব, পিতৃস্নেহ প্রবল। মা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন, তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, রোগে সেবা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাব নিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করে। পিতার দৃষ্টি সন্তানের জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রে। তার জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তাঁর কামনা। এই জন্যই সন্তানের আরাম আর সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এই জন্য সন্তানকে তিনি দুঃখ দেন শাসন করেন বাধা দেন বঞ্চিত করেন। নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। পিতার মধ্যেও মাতার স্নেহ আছে কিন্তু তা সীমায় আবদ্ধ নয়, তা বৃহৎ মঙ্গলে প্রসারিত। শুধু সুখকর হয়েই তার ছুটি নেই, সে স্নেহ মঙ্গলকর। আর দুঃখ-দণ্ড তো সেই কল্যাণেরই ফুল-ফল।

জীবনের মর্মভেদী রোদনের মধ্যে একটিমাত্র মাভৈঃ বাণী—পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ, তুমিই আছ। আর যে তবে হতাশার লেশমাত্র রইল না। যদি মর্মের মাঝখান থেকে এই সত্যমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারি তা হলেই তো সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, সমস্ত ভয় ভয়ে মুখ লুকোল।

আমি আছি—এই কথাই তো উচ্চনাদে বলতে চেয়েছি প্রাণপণে। কিন্তু আমি কোথায়? সর্বত্রই তো তুমি, তোমার রচনা। তুমি আছ বলেই তো আমি আছি। আমার সমস্ত জীবন আর জগৎ তো শুধু তোমাকে দিয়েই ওতপ্রোত। আমি না থাকলে কিছু যায় আসে না, কিন্তু তুমি না থাকলে তো সব যায়। তাই আমার যেটুকু থাকা সবটুকুই তোমার মধ্যে থাকা। তুমি আমার পিতা, তুমি আমার আপন, আমার আপন হতেও আপন।

তুমি আমার আপন তুমি আছ আমার কাছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও,
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা

আমার হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।
দুঃখী জেনেই কাছে আস
ছোটো বলেই ভালোবাস
আমার ছোটো মুখে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও॥

যখন রাণী চলে যায় তখন সে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল, 'সব অন্ধকার হয়ে আসছে, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। বাবা, তুমি পিতা নোঽসি মন্ত্র পড়ে শোনাও।'

পিতা নোঽসি—পিতা তুমি আছ, তুমি আছ, এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র হোক। কিন্তু শুধু মুখে আওড়ে বা মনে মনে জেনে রেখেই তো রেহাই পাব না। তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে। তা যদি না পাই তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলাম, কেনই বা এতদিন নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালাম, শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল!

উনিশ শো পাঁচ সালের পৌষ মাস। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে, খবর পৌছুল মহর্ষি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চলে এলেন কলকাতায়।

জোড়াসাঁকোর বিশাল বাড়ি ছেড়ে মহর্ষি পার্ক স্ট্রীটের এক দোতলা ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন। যথাসম্ভব নির্জনে থাকবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু একদিন হঠাৎ বাড়ির ইহুদী মালিক কি-একটা অসদ্ব্যবহার করে বসল, মহর্ষি ঠিক করলেন তক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে দেবেন। জোড়াসাঁকোয় খবর আসতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল। বহু বছর পরে স্ববাসে ফিরে আসছেন, সমারোহ করেই তাঁকে আনা দরকার। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগ করে তাঁর জুড়িগাড়িতে মহর্ষিকে নিয়ে এলেন, পিছনে সারবন্দী অন্য গাড়ির ভিড়। সে কী অভিনব শোভাযাত্রা। বিয়ে করতে বর এল নাকি? না, মহর্ষি তাঁর পৈত্রিক বাসভবনে ফিরে এলেন।

কিন্তু এর পর যে এল সে সেই পরিচিত অতিথি—মৃত্যু। অদম্য সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও মহর্ষির শারীরিক যন্ত্রণার উপশম হল না। সাহেব ডাক্তার এসে অপারেশন করে গেল—তবুও না। অসুস্থ অবস্থাতেই সমস্ত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা

করে সকালবেলা দক্ষিণের বারান্দায় উঠে গিয়ে উপাসনা করছেন আর উপাসনার পর বসছেন ধ্যানে-চিন্তনে। ছয়ুই মাঘ আর উঠতে পারলেন না, বিছানায়ই শুয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথকে কাছে ডাকলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাশে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন: অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। সেই একটানা মন্ত্রধ্বনি শুনতে শুনতে দুপুরবেলায় মহর্ষি শেষবারের মত চোখ বুজলেন।

মহর্ষির মৃত্যু নতুন করে নিদারুণ আঘাত হানল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো অবসন্ন হবার মানুষ নন, তিনি নবতর ভাগবতী চেতনায় উদ্বোধিত হলেন।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে
হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

'সেই জন্যেই আমাদেব প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে—পিতা নো বোধি।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। আমার প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাস তার বোধ নিয়ে আমার সর্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শচেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক। পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত কবে দিক। পিতা নো বোধি। আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক, আমাব জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক। আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাকে— নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে, আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে—প্রসারিত হতে থাক—প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।'

মহর্ষি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর কাছে আগে ধর্ম পরে ধন। দুঃসহ দুঃসময়েও শান্ত সংযত শৌর্য তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। ঘোর বিপত্তিতেও তিনি অকম্পিত বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পেরেছেন যেহেতু সর্বসময় তাঁর অন্তর্যামী তাঁর চোখের সম্মুখে স্বপ্রকাশ ছিলেন। বিষয়ের মধ্যে থেকেও তিনি বিষয়াতীতকেই সন্ধান করেছেন। বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঈশ্বরের সেবাকে—মানুষের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। গৃহে ও সমাজে সবত্র একটি ধর্মজিজ্ঞাসাকে প্রজ্বলিত করে দিয়েছেন।

আর কে না স্বীকার করবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-প্রদীপ তার প্রথম শিখাটি আহরণ করেছিল মহর্ষির কাছ থেকে।

'আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব। আমি তো আর-কারও নই, আর-কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটিমাত্র সত্য।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে-ঘিরে অন্তরে-বাহিরে যা-কিছু আছে এ সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়—এই জল-স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখ-দুঃখের সংসারলীলা, এ সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরছে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা 'পিতা' বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে থাক, আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে। তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল—তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না—পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে—কিন্তু, তোমার এই এতবড়ো আকাশ-ভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্ছি নে, গ্রহণ করতেই পারছি নে—কিসের জন্যে? ওই এতটুকু একটুখানি 'আমি'র জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে, 'আমি'। 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জানছ। তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক। তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেছ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ করো।'

তারই জন্যে তো 'খেয়া'। আমিত্বের এ পার হতে অসীমত্বের দিকে যাত্রা, শুধু অকূলে পাড়ি জমানো। কিন্তু কিছুই কি জানি সত্যিই কোথায় গিয়ে পৌঁছুব, কেই বা সেই খেয়ার নেয়ে! কিন্তু এটুকু তো জানি এই মানবজীবনই

খেয়ার নৌকো, আর যে এই নৌকোর মাঝি সেই আমার জীবনদেবতা। তবে আর কথা কী, সংসার-বন্দর থেকে আসক্তির নোঙর তুলে নাও, উড়িয়ে দাও ঘর-ভাঙা ঝড়ের উদ্ধত বিজয়ধ্বজা—হাল ধরতে যেও না, দাঁড় টানতে যেও না, ছেড়ে দাও, নির্ভর করে থাকো, দেখ না কী কাণ্ড ঘটে।

শুধু শিকল দিলেম খুলে
শুধু নিশান দিলেম তুলে
টানিনি দাঁড়, ধরিনি হাল
ভেসে গেলেম স্রোতের মুখে।

এই স্রোতই তো পরম পতির দিকে নিয়ে যাবার পরম গতি।

আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।

আমি যদি উদ্যোগ করে হাল ধরতে যাই সব বানচাল হয়ে যাবে। যদি দাঁড় টানতে যাই টানাটানিতে ঘূর্ণিপাকে পড়ে যাব। তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই শান্তি।

আমি হাল ছাড়লে তবে তুমি হাল ধরবে জানি,
যা হবার আপনি হবে, মিছে এই টানাটানি।

দুলুক তরী ঢেউয়ের পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ
গাও রে আজি নিশীথ রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দগান।
যাক না মুছে তটের রেখা
নাই বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক-না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে
লও রে বুকে দু'হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

কিন্তু সত্যিই কি সে অজানা? আর সে দেশ কি সত্যিই নির্জনতার দেশ? 'হে বিশ্ববিধাতঃ আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—

মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃত-লোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের নিয়ত উত্থান-পতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাব-তিরোভাবের মধ্যে তোমার 'আনন্দরূপমমৃতম' প্রকাশ করো। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল-প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে 'মধু বাতা ঋতায়তে,' বায়ু মধু বহন করিতেছে, 'মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ', সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্যের কোনো ক্ষয় নাই, তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক।'

॥ পঁচিশ ॥

উনিশ শো পাঁচ সালে বাংলা দেশ ইংরেজের ছুরিতে দু-ভাগ হয়ে গেল। সমস্ত দেশ ক্রোধে ও যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন থাকতে পারলেন না। প্রকাশ্যে অবতীর্ণ না হয়েও নেপথ্যে উপস্থিত থেকে আন্দোলনে আহার্য জোগালেন। সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবীদের হাতে বোমা, বাক্সে বিবেকানন্দের বই, মুখে রবীন্দ্রনাথের বাণী—

'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।'

ফাঁসির হুকুম হবার পর কাঠগড়া থেকে উল্লাসকর দত্ত চেঁচিয়ে উঠল—

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

বিচারকক্ষের সমস্ত নিস্তব্ধতা প্রতিধ্বনি করে উঠল—

'সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে।'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমও ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। সে শুধু সাময়িকতার আকস্মিক উত্তেজনা নয়, সে সর্বস্বাধীন বিশ্বপ্রণেতার পূজা। বিশ্বদেবতাই স্বদেশের মূর্তিতে তাঁর সামনে প্রকাশিত। বিশ্বের কল্যাণের জন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে,

দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

তাঁর স্বদেশপ্রেম বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত বলে বিশুদ্ধ জাতীয়তায় বা নীরন্ধ্র স্বাদেশিকতায় আবদ্ধ থাকতে পারল না। জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে আর কোনো ধর্ম নেই, নীতি নেই, ন্যায়-বোধ নেই—এ তিনি মানতে প্রস্তুত নন। বিদেশী বর্জনেই শক্তিকে নিঃশেষিত না করে স্বদেশী অর্জনের দিকেও তাকে প্রসারিত করা দরকার। ইংরেজকে আগে তাড়াই, পরে তড়ি-ঘড়ি ঘর গুছিয়ে নেব—এটা কোনো কাজের কথা নয়। যদি বেসামাল বুঝে ইংরেজ নিজের থেকেই সরে পড়ে তবে আমাদের কোন দুরপনেয় পাঁকের মধ্যে ফেলে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে বাঙালি ও ভারতবাসীকে ভারত-বর্ষীয় হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবারও ডাক দিয়েছেন। পথ দেখিয়েছেন গঠনের দিকে, সংস্কারের দিকে, বিচিত্র উদ্যম ও উদ্‌যাপনের দিকে। উত্তেজনার মোহে দেশের লোক তাঁকে ভুল বুঝল। অথচ এই উত্তেজনার মহান পুরোহিতই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্ত্র ছিল দুটো: রাজশক্তির কাছে নত হয়ো না, আর গ্রামে-গ্রামে অন্তরে-অন্তরে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করো। দেশের লোক প্রথম মন্ত্রটা নিল, দ্বিতীয়টা নিল না। পরে—অনেক পরে বুঝল, রবীন্দ্রনাথই সত্যদ্রষ্টা, অনধিকারীকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করলেই কাজ ফুরায় না, গৃহকে বসবাসের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়, ভিত্তি ঠিক করে উঁচু করে তুলতে হয় তার আরাধনের চূড়া, আলো-হাওয়া-খাওয়া বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দিতে হয় তার আবাহনের আয়তন। দেশের নেতা হলেই তো চলবে না, শের প্রণেতা হওয়া চাই।

অথচ কী সে সার্থক উত্তেজনা। ভাবের আতসবাজি নয়, প্রাণের আদিম শঙ্খধ্বনি।

'দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার উর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো, এই সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো; ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে।

তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরম শক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন-গর্জন, এই-সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই-সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র। ইহারা যদি-বা তোমাকে পীড়া দেয়, তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ার গৌরব, যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। ..হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে তখন, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানেব কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ-মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং তোমাব চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুব পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না। তুমি আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জানো। এবং উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধার-শাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিবা এইরূপ বলিয়া থাকেন।'

এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী
তোমার স্থিব অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো
সঙ্কটে দুর্দিনে হে
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

স্বাধীনতার যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু যুদ্ধ নয়, ধর্ম-যুদ্ধ। এ যুদ্ধের আহ্বান ধর্মের আহ্বান।

ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ।

এই যুদ্ধের সারথি স্বয়ং ভগবান, বিপ্লবের নির্ঘোষের মধ্যে তাঁরই উদার শঙ্খনাদ।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখত্রাতা
জনগনপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।

স্বদেশপ্রেম শুধু ভাববিলাসিতায় কালহরণ নয়, নয় বা শুধু শত্রুতাবুদ্ধির বিষবাষ্পের মধ্যে বাস করা। জাগ্রত ভগবানকে মাথার উপর রেখে এমন একটি মানবিক মিলনক্ষেত্র রচনা করা যেখানে সকল মানুষ নির্বিরোধে 'আমি ভারতবর্ষীয়' এই উদার মৈত্রীতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। সেই মন্দিরে এমন এক দেবতার প্রতিষ্ঠা করা যাঁর দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কখনো অবরুদ্ধ নয়। যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি তাই সার্বভৌমিক মানবপ্রীতি। আর তাঁর ভগবানে অটল বিশ্বাস আছে বলে মানুষেও অগাধ বিশ্বাস। তাঁর ভগবৎপ্রীতি সত্য বলে তাঁর মানবপ্রীতিও সত্য। যে ভগবানকে স্পর্শ করেছে সেই তো তাঁর প্রতিভূ মানুষকে স্পর্শ করে পবিত্র হবার কথা বলতে পারে। মানুষকে দেখতে পারে ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া বলে।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে তাই শত্রুবিদ্বেষের চেয়ে মানবমিত্রবুদ্ধিই বেশি প্রবল। তাঁর 'দুর্জনেরে হানো'-র চেয়ে 'দুর্বলেরে রক্ষা করো'-র নীতিই বলবত্তর। এই দুর্বলকে রক্ষা করতে গিয়ে তুমি বলিষ্ঠ হও, অজস্র হও, বিস্তীর্ণ হও, বদান্য হও।

'শক্রতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঐ পরের দিক হইতে ভ্রুকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানা-দিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো ; কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এতোদূর বিস্তৃত করো যে দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু-মুসলমান ও খৃস্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।'

শুধু হট্টগোলের কাঁধে চড়ে সিদ্ধিলোকে পৌঁছুনো যাবে না। শুধু মস্ত-বড়ো লোভেই মস্ত-বড়ো লাভ হয় না। নেশার জোরেই হয় না স্বপ্নের রূপায়ণ। ধৈর্যই শক্তি, নিষ্ঠাই শক্তি, অধ্যবসায়ই পরম উপায়। সৃষ্টিকর্তার ধন জাদুকরের ঝুলির মধ্যে লুকোনো নেই। প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, আর তাই মানুষের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানুষের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস।

ধর্ম ? হাঁ, স্বাধীনতার পরাণ-পণ যুদ্ধের মধ্যেও ধর্ম। দেশপ্রেম সেই ধর্মেরই প্রতিফলন।

'ধর্মের মূল মাটির মধ্যে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোক-ব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী এক বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।'

তাই ভগবানে প্রভূত বিশ্বাস রেখে নিজের কাজ নির্বিচল নিষ্ঠায় নির্বাহ করো। তোমার প্রিয়তম দেশকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাও। কারু সাধ্য নেই বিধির বিধান লঙ্ঘন করে। এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষকে পদানত রাখবে এ কখনোই বিধির বিধান হতে পারে না। এমন বাহুবল কারু নেই যে ভগবানের ইচ্ছাকে প্রতিহত করে।

শাসনে যতই ঘের' আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান॥

আকস্মিক অপমানের আঘাতে দেশপ্রেম চতুর্দিকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে—

তা উঠুক, কিন্তু সেটা শুধু বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সেটা ঠিক নয়। সেই আবেগকে নিভৃত অবস্থায় সংহত করে বিস্তীর্ণ মঙ্গলসৃষ্টির কাজে চালিত করতে হবে। তবু আবেগটাকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ।

বাহির যদি হলি পথে ফিরিসনে তুই কোনোমতে
থেকে থেকে পিছনপানে চাসনে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে
অভয় চরণ শরণ করে বাহির হয়ে যা রে॥

রবীন্দ্রনাথ সকলকে অভয়ের মধ্যে আহ্বান করে আনলেন। জড়ত্বের দেশে নিয়ে এলেন প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস, স্রোতহীন বন্দী নদীর মধ্যে নিয়ে এলেন সমুদ্রের পরিণাম। দুঃখের কণ্টককিরীটেই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্মান, আনলেন সেই নতুন মূল্যবোধ। আর এই স্বাধীনতার বন্দরে পৌঁছেও যে যাত্রার শান্তি নেই, যেতে হবে অমৃতলোকের সন্ধানে, লিখে রাখলেন সেই ইতিহাসের ভূমিকা।

নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান
দুঃখেই হোক তব বিত্ত মহান।
চলো যাত্রী চলো দিনরাত্রি—
করো অমৃতলোক-পথ-অনুসন্ধান।
জড়তামস হও উত্তীর্ণ
ক্লান্তিজাল করো দীর্ণ-বিদীর্ণ—
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে করো স্নান॥

শুধু প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকো, শুধু কর্ষণ করে যাও, দৈবধন না মিলুক ভাণ্ডার-ভরা শস্য মিলবেই মিলবে।

নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।

উদ্দেশ্য সুদূর হোক, আমার উপায়ও সুদীর্ঘ—এবং আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু ভগবান আমার সঙ্গে আছেন বলে ধৈর্যে আমার ক্লান্তি নেই, শ্রমে আমার ঔদাস্য নেই, ত্যাগে আমার ক্ষতি নেই, বিঘ্নে আমার আতঙ্ক নেই। ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্র থেকে আমি বিচ্যুত হই নি।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না ॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না ॥

আমার সমস্ত কাজ যদি ঈশ্বরেরই জয়ধ্বনি হয়, তাহলে আর আমার ভয় কোথায়? যদি মরণই আমার একমাত্র দোসর হয় তাকে বরণ করে নিতে কুণ্ঠা কিসের? মালার বদলে তুমি যদি আমাকে তরবারি দিয়ে থাকো সে-তো আমার বন্ধন কাটাবার জন্যে।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয় ॥

তেরোশ' বারো সালের তিরিশে আশ্বিন বাংলা দেশ দ্বিধাকৃত হল। রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের উৎসব সৃষ্টি করলেন। বাঙালি—হিন্দু হোক মুসলমান হোক খৃস্টান হোক বৌদ্ধ হোক—সব এক পরিবার, তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নেই, সবাই ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভূগোলে-ইতিহাসে কিছুতেই তারা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। সেদিন কলকাতায় রাখিবন্ধনের যে বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তার অগ্রণী ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কত লোককে যে তিনি সেদিন নিজের হাতে রাখি পরিয়েছিলেন তা গণনাতীত।

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর
হৃদয় মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখির ডোর।

কিন্তু রাখি তো শুধু মানুষকে পরালেই চলবে না, ঈশ্বরকেও পরাতে হবে।

তাঁকে বাঁধতে পারলেই তো সকলে বাঁধা পড়বে—তিনিই তো নতুনের মধ্যে চির-পুরাতন, তিনিই তো পুরাতনের মধ্যে চিরনবীন। তাঁকে আনন্দিত না করলে বিশ্বসংসারে কারু যে কোথাও আনন্দ নেই।

প্রভু, তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি।
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখি।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি।

'শিবাজী' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে ভারতবর্ষীয়ের ভারত। জননীরূপে সে ভুবনমনোমোহিনী—'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন, জাহ্নবীযমুনা বিগলিতকরুণা পুণ্যপীযুষস্তন্যবাহিনী।' কিন্তু ভারতের অখণ্ড সত্তা স্বীকার করে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিকেই প্রত্যক্ষ-বাস্তবে ভালোবেসেছিলেন। কী সে অতলস্পর্শ আন্তরিকতা!

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষি।
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে·
আমি পরের ঘরে কিনব না আর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

বাংলাদেশও কবির মাতা—আর, 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।' শুধু মাতা নয়, বিশ্বময়ী বিশ্বমাতা। 'জনকজননীজননী'—আবার 'তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।'

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

পূজার ভাব মনে না আনতে পারলে বুঝি আত্মোৎসর্গেও তেজ আসে না। দেশ শুধু মাটি নয়, ভাব নয়, মোহ নয়—দেশ দেবতা, তার জন্যে ফাঁসি যাবার অর্থও মায়ের পূজার অর্ঘ্য হয়ে যাওয়া।

ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে
খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই
কোথায় পূজার অর্ঘ্য।
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে
সাজা পূজার থালার 'পরে
আত্মদানের উৎসধারায়
মঙ্গলঘট ভর গো।...
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে,
মরতে হয় তো মর গো।

দেশের এই মূর্তি দেবতার মূর্তি ছাড়া আর কী! এই অপরূপ রূপে মায়ের উদ্বোধন না হলে আত্মবলিদানের প্রেরণা আসবে কী করে?

আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।...
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাটনেত্র আগুনবরন।...
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, হৃদয়হরণী॥

বঙ্গচ্ছেদ ঘটবার পর শীতকালে ইংরেজ রাজশক্তি যুবরাজকে ভারতবর্ষে নিয়ে এল এই স্থূল তথ্যটাই প্রমাণ করবার জন্যে যে বিদেশী রাজা ভারতীয় প্রজার কী নির্মম শত্রু! তার মধ্যে কুশলসাধনের তন্তুমাত্র আন্তরিকতা নেই, প্রচ্ছন্নে ও প্রকাশ্যে তার একমাত্র কাজ শোষণ আর পীড়ন, একমাত্র উল্লাস দুর্বলীকরণ। ভারতবর্ষ ভক্তির দেশ, রাজাকেও সে ভক্তি করতে জানে যদি সে রাজার হৃদয় থাকে, যদি সে রাজার অভিধানে প্রজামঙ্গল বলে কথা থাকে, যদি সে মাত্র তামাসার রাজা না হয়!

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই সে দৈব-সম্বন্ধ বলে মনে করে, কিন্তু হে ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক রাজা, তুমি যে দেবশক্তিতে সজীব নও—তোমার যে শুধু নির্বিবেক বর্বরতা—তোমাকে অভিনন্দন করি কী করে?

কী সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন রবীন্দ্রনাথ:

'আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গল লাভ করি সেই সম্বন্ধের মধ্যে আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি তখনও মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্বলতা, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, তাঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ-সাধন করিতেছেন সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ! শক্তি প্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এই জন্যে বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে, গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজা করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে

নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাটাকে প্রণাম করে। ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে, যন্ত্র একটা উপলক্ষ মাত্র—যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে; কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা, যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।'

কিন্তু এ রাজা তো মঙ্গলের দূত নয়, এ রাজা তো উপকারী আত্মীয়ের ভূমিকায় দেখা দেয় না, এ যে কেবলই একটা শোষণের যন্ত্র, পীড়নের দণ্ড আর অপমানের কশা। এ যে সহনাতীত।

শুধু রাখিবন্ধন নয়, শুরু হল বিলিতি পণ্যবর্জন। শুধু বর্জনে হবে না, আত্ম-শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেন্দ্র হবে গ্রাম—দেশের যা অন্তস্থল। শিক্ষাকেও স্বাধীন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে জাতীয় বিদ্যালয়। সমস্ত সক্রিয় ভাব-বিপ্লবের ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ।

রাজার দন্ত আর নখর একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। শুরু হল উলঙ্গ নির্যাতন। যে সব দেশসন্তান কুপিত রাজদণ্ডে বিশেষ করে নিগৃহীত হল রবীন্দ্রনাথ তাদের মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানালেন: 'যাঁহারা মহাব্রত ধারণ করিয়া থাকেন, বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া—সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বারবার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দেমাতরম।'

ছাড়িসনে, ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে
ওরে আর নেই ভয়।

ঐ দেখ্‌ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে, আর নেই ভয়।
এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার পর
নিরাশ্বাস আলস্য সংশয়
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয় আয় রে বাহিরে
চেয়ে দেখ্‌ দেখ্‌ উর্ধ্বশিরে
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়।
ওরে, আর নেই ভয়।

॥ ছাব্বিশ ॥

বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন বসছে—রাজনৈতিক সম্মিলন। তার সঙ্গে বসছে সাহিত্য-সম্মিলন। রাজনীতিকে কে চালাবে যদি তার পিছনে ভাবের আবেগ না থাকে? সাহিত্যই সেই ভাবের ভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ভাণ্ডারী আর কে আছে? তাই রবীন্দ্রনাথই সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি।

রবীন্দ্রনাথ নৌকা করে বরিশালে পৌঁছুলেন, থাকলেনও নৌকোয়। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলন পুলিশের লাঠিতে ভণ্ডুল হয়ে গেল। ফুলারসাহেব পূর্ববঙ্গের ছোটলাট, তারই চেলা বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন। তখন বরিশাল স্বদেশী-আন্দোলনে বিশাল হয়ে উঠেছে—ত্যাগে বিশাল, তেজে বিশাল, প্রেমে বিশাল—আর সেই বিরাট আন্দোলনের নেতা বিশালশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার দত্ত। ভিন্ন করো, ভিন্ন করে দুর্বল করো, দুর্বল করে পীড়ন করো—ইংরেজের এই কারসাজি অশ্বিনীকুমারের সংগঠনশক্তির সঙ্গে এঁটে উঠল না। তখন ইংরেজ সোজাসুজি লাঠি চালাল। বিলিতি নুন বর্জন করবে? সেই সঙ্গে তবে কিছু স্বদেশী রক্তও বর্জন করো।

সাহিত্য সম্মিলন হতে পারল না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে ফিরে

এলেন। কিন্তু মনের মধ্যে অশান্তি, চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে একজন উপযুক্ত সেনানায়ক দরকার— দেশনায়ক। বরিশালে ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন যাকে দণ্ড দিয়েছে, অপমান করেছে, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশনেতা। কলকাতায় গিয়ে সভা করলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথকে দেশনায়ক রূপে বরণ করলেন আর তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় একজোট হয়ে দাঁড়াবার জন্যে ডাকলেন দেশবাসীকে।

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে ॥
লুঠ করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো—
একনিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে ॥

আরো পরে, প্রায় ত্রিশ বছর পরে, আরো একবার, আরেকজনকে দেশনায়ক-রূপে বরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। সে আর কেউ নয়, সে নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ এবার 'খেয়া' নিয়ে বসলেন। রূঢ় বাস্তবতার ঘাট থেকে এ খেয়া নিয়ে চলেছে মনোরম অধ্যাত্মলোকে। 'নৈবেদ্য' স্পষ্ট, উচ্চকণ্ঠ—'খেয়া' অজানার রহস্য দিয়ে ভরা। ঈশ্বর জানা হয়েও আবার অজানা। যখন জানা, তখন নৈবেদ্য। যখুন অজানা তখন খেয়া। যখন নিকটের প্রতি বিশ্বাস তখন নৈবেদ্য। যখন সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতা তখন খেয়া।

চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে,
অজানার অতি দূর পারে।

ঈশ্বর সন্নিহিততম হয়েও আবার সুদূরতম। কখনো রূপে, কখনো অনুভবে : রূপে নৈবেদ্য, অনুভবে খেয়া।

নৈবেদ্যে ঢেলে দেওয়া, খেয়ায় উড়িয়ে দেওয়া, পাঠিয়ে দেওয়া। যখন একটি নমস্কারে সকল দেহ সংসারে লুটিয়ে পড়ে তখন নৈবেদ্য, আবার যখন মানসযাত্রী হংসের মত সমস্ত প্রাণ একটি নমস্কারে মহামরণপারে উড়ে চলে তখন খেয়া। ঈশ্বরকে পেয়ে যেমন আমার সুখ, তাঁকে খুঁজে খুঁজে না-পাওয়াও আমার তেমনি সুখ। সোনার তরী আমাকে না তুলে শুধু আমার সোনার ধান কটি নিয়ে চলে যায় বলে আমার দুঃখ, কিন্তু খেয়াতরী আমাকে পার না করলেও আমার দুঃখ নেই কেন না যা এপার তাই আবার ওপার। যাঁর পার

তাঁরই অপার। নৈবেদ্য পারের কবিতা, খেয়া অপারের।

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।
নেই যদি বা জমল পাড়ি
ঘাট আছে তো বসতে পারি,
আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখবো তোদের তরী বাওয়া॥

যেখানেই থাকি, ঘাটেই থাকি বা জলেই থাকি বা পারেই থাকি, সর্বত্রই ঈশ্বর-আশ্রয়। যিনি ইচ্ছা করলে পার করে দিতে পারতেন তিনিই ইচ্ছা করে ঘাটে ফেলে রেখেছেন। যদি জলের তলায় নিয়ে যান সেও তাঁরই ইচ্ছা। সর্বত্র তাঁর ইচ্ছা এই উপলব্ধিতে জাগ্রত হতে পারলে সর্বদাই তো তাঁর মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। তবে আর আমার চাই কী। তখন কী বা ঘাট, কোথায় বা পার, কাকে বা বলে অতলতলে নিমজ্জন!

'শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার, আমি তা মনে করিনে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে আমি তাঁর মধ্যেই আছি, কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে: কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর-মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না, যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন; তাঁরই আনন্দ শক্তিরূপে ছোট বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে, এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে সহজ করে তুলতে হবে—এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য, মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেন না যিনি স্বয়ম্ভু, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।'

'খেয়া' বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা। উৎসর্গের ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যেই সমগ্র কাব্যের অন্তর্লীন সুরটি ধরা আছে।

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।

কোথায় দূর আকাশে বিবস্বান সূর্য, কর্তা-হর্তা-তমিস্রহা—আর কোথায় মর্তের এককোণে ভয়কুণ্ঠিতা লজ্জাবতী লতা। কিন্তু কী কৌশলে, কী অলক্ষ্য সংযোগ, সূর্যের আত্মীয়তাটুকু নিজের পত্রে-বৃন্তে সঞ্চারিত করে নিয়েছে। হে অন্তরতম বন্ধু, তুমি তার প্রাণের কথাটি বুঝে নিও। তার একমাত্র কথাই যে প্রকাশিত হওয়া, সে কথা তুমি ছাড়া আর কে বেশি বুঝবে? সন্ধ্যা হয়ে এল, ডালপালা সব ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে, তবু সে প্রতীক্ষা করে আছে তোমার মাঝে ঝংকৃত হবে বলে।

তারার দিকে চেয়ে-চেয়ে কোন ধেয়ানে রতা,
আমার লজ্জাবতী লতা!

বন্ধু তোমার তড়িৎ-স্পর্শ আনো। এ লজ্জিতা লতাকে পুলকাঞ্চিত করো, তাকে সার্থক করো পরমতম চেতনায়। সে যে এই চেতনার জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছে।

তারপরেই বললেন সার কথা:

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

এই লজ্জাবতী লতা কত ভীরু, কত ভঙ্গুর, কিন্তু তার প্রকাশপিপাসা তো সত্য। এই প্রকাশপিপাসায় সে তো আকাশচারী সমস্ত গ্রহনক্ষত্রেরই সতীর্থ—সে আর তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, লজ্জালু নয়। তারও যে সে একই উন্মোচনের স্বপ্ন। সে প্রতীক্ষায়ই তো সে জেগে আছে, সইছে ঝড়জল রৌদ্রদাহ, সইছে নিষ্ফলতা। সে স্থিতিতে ক্ষুদ্র, শক্তিতে ক্ষুদ্র কিন্তু সে অভীপ্সায় বৃহৎ—তার প্রতীক্ষা নিরবধি। একদিন তুমি এসে তাকে ছোঁবে, বলো সেই স্বপ্নের

চেয়ে সত্য আর কী আছে?

অন্তত প্রতীক্ষায় তো আমি অবিচ্যুত।

দিন শেষ হয়ে এল, ঘুমের দেশটিকে দেখছি এপার থেকে। কত না জানি শান্তি আর বিরতি দিয়ে ভরা। আর এ পারের সংসার মোহকর মনে হচ্ছে না। দিন শেষ হয়ে এল, ও পারের মায়ায় এ পারের কাজ ছুটি নিতে চাইছে। ও পারের গান এ পারের কোলাহলের চেয়ে কত বেশি চিত্তহর! আর এ দেশ ভালো লাগছে না, আমি যাব ওপারে। হে কর্ণধার, হে জীবনতরীর মাঝি, আমাকে দিনশেষের শেষ খেয়ায় পার করে দাও।

কিন্তু কোথায় আমার নেয়ে? কত লোক কাজকর্ম চুকিয়ে জীবনসায়াহ্নে কী নির্বাধ নির্মল স্রোতে চলে যাচ্ছে ওদেশে। আমি কি ওদের কাউকে চিনি? ওরা কি আমার স্বজন, আমার ঘনতর আত্মীয়? ওদের কাউকে ডাকলে কি আমাকে তুলে নিয়ে যেত? ওরা কেউ আসত না, আর ওদের ডাকবই বা কোন নামে? হে প্রাণের কর্ণধার, আমি শুধু তোমাকে চিনি, তোমাকে ডাকি। তুমি আমায় পার করে দাও।

যে যার আপন জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে, কেউ ঘরে, কেউ ওপারে। কিন্তু আমি ঘরছাড়া, ঘরেও আমার স্থান নেই, পারের নৌকোও খুঁজে পাচ্ছি না। পথে পড়ে আছি, তুমি ছাড়া কে আর আমাকে আশ্রয় দেয়? সংসার আঁকড়ে থাকবার না আছে আসক্তি, পরপারে গিয়ে দাঁড়াবার না আছে আধ্যাত্মিক সামর্থ্য। 'ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে?' আমি ঘরে থাকবার উপযুক্ত নই, পারে যাবার উপযুক্ত নই, তবু হে দয়াময়, আমি তোমার কোলে যাবার কোলে থাকবার উপযুক্ত।

নাই বা ফুটল আমার ফুল, নাই বা ফলল আমার ফসল, তবু সমস্ত ঝরা-মরা সত্ত্বেও আমি তোমার হিসাবে অনিবার্চ্য নই। আমি যে তোমারই বাগানের ঝরাফুল, তোমারই মাঠের মরা ফসল। তাই আমাকেই বা তুমি কেমন করে ফেলবে? তুমি তো শুধু চরিতার্থের নও, তুমি ব্যর্থমনোরথের। তুমিই তো হতাশের শেষ আশা, নিঃস্বের শেষ সম্বল, সর্বস্বান্তের অন্তসর্বস্ব। 'দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁজের আলো জ্বলল না, সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।' আমি জানি আমারও মৃত্যু আছে, আমারও মাঝি আছে।

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'হে আনন্দসমুদ্র, এ পারও তোমার, ও পারও তোমার। কিন্তু, একটা পারকে যখন আমার পার বলি তখন ও পারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ

ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্মে ভিতরে-ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণী। পার হবার জন্মে তাই এত ডাকাডাকি।'

আরো বলছেন, 'এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে। যতক্ষণ না বলতে পারছে 'এইটে তোমারও ঘর', ততক্ষণ তার যে কত দাহ, কত বন্ধন, কত ক্ষতি তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে-করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, 'হরি, আমায় পার করো।' যখনই সে আমার ঘরকে তোমারই ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম মনে করে আমি-লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনই তার গান 'আমায় পার করো'—যখন সে বলতে পারে 'তোমার কর্ম', তখন সে পার হয়ে গেছে।'

এই আমিত্বের কারাকক্ষে বসেই হঠাৎ কোনো শুভক্ষণে দিব্যচেতনার চকিত স্পর্শ লাভ করি। তখন 'মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে।' আমার মধ্যে দুটো আমি আছে—কাঁচা আমি আর পাকা আমি, ক্ষণিক আমি আর সুচির আমি। ক্ষণিক আমি-র ক্ষুদ্র হিসেবে, সে শুধু সুখকে খোঁজে আর দুঃখকে এড়ায়, কিন্তু সুচির আমি হঠাৎ এক দুর্লভ মুহূর্তে সমস্ত সংকীর্ণ হিসেব ওলোটপালোট করে দিয়ে একটা বড়ো দুঃখকেই আঁকড়ে ধরে শাশ্বত আনন্দের আস্বাদ পায়। হে ঈশ্বর, তুমিই আমার সেই বড়ো দুঃখের চিরন্তন সুখ।

রাজার দুলাল আজ আমার ঘরের সমুখ পথ দিয়ে চলে যাবে—মা গো, আমার জীবনে আজ সেই শুভ মুহূর্ত এসেছে, বলো আজ আমি কী করে আমার অভ্যস্ত জীবনে আবদ্ধ থাকি, কী করে প্রতিদিনের পুরোনো গৃহকাজেই ঘুরি-ফিরি? মা গো, আজ আমাকে ঘরের ক্ষুদ্র বাতায়নকোণটিতে দাঁড়াতে দে। আমি হলামই বা না কুণ্ঠিতা-গুণ্ঠিতা গোপনচারিণী অন্তঃপুরের মেয়ে, রাজদর্শনের যোগ্য সাজে আমাকে সাজতে দে—কিন্তু কী হবে আমার উৎসববেশ আমি কিছুই জানি না। তুই বলে দে আমি কেমন সাজে সাজব? হ্যাঁ, জানি একপলকের দেখা—তাই তো এক জন্মের সুখ, বল কোন ভঙ্গিতে কোন বর্ণের বসন পরব? 'ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ'—আমার তো সেই

রাধিকার কান্না—

'কোটি নেত্র নাহি দিল দিল মাত্র দুই।
তাহাতে নিমিখ কৃষ্ণ কি হেরিব মুই॥'

তবু সেই নিমেষটির জন্যে আমি না সেজে থাকি কি করে? এক নিমেষের দেখার জন্যে এক জীবনের আয়োজন।

মাগো, রাজার দুলাল আমার ঘরের সমুখ পথ দিয়ে চলে গেল। আমি বাতায়নকোণে দাঁড়িয়েছিলাম, ভালো করে দেখবার জন্যে মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়েছিলাম, এক নিমেষকে যুগায়িত করে দেখলাম সেই রাজেন্দ্রকে, আর চকিতে কী হল কে জানে, বুকের মণিহার ছিঁড়ে তার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলাম। কত দিনের কত সঞ্চয়ের এই মণিহার—কত স্পর্ধার এই ঐশ্বর্য, তাকে তক্ষুনি দিয়ে দিতে একবিন্দু দ্বিধা হল না। মাগো, সে-মণি সে নিল না কুড়িয়ে, রথের চাকার তলায় তা গুঁড়ো হয়ে গেল, রইল পথের ধূলোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে:

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ—
ধূলায় রহিল ঢাকা॥

কিন্তু সে নিক বা না নিক, আমি যে তাকে আমার বুকের মণি দিতে পেরেছি এতেই আমি কৃতকৃতার্থ। আমি যে এতদিন জেগেছি আর জ্বলেছি, আমি যে তাকে দেখেছি আর দেখামাত্রই চিনেছি এতেই আমার পরম তৃপ্তি। সে নিল কি না-নিল এতে আমার কিছুই যায়-আসে না, আমি যে সেই ক্ষুদ্র নিমেষের মধ্যে আমার বুক-উজাড়-করা ধন তাকে দিয়ে দিতে পেরেছি এতেই আমি পরিপূর্ণ। মাগো, তুই বল, তাকে দেখামাত্রই বুকের মণি কি না দিয়ে থাকতে পারা যায়?

তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে।

সে শুধু চলেই যায় না, কখনো-কখনো চলে আসে, ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ থাকলে দরজা ভেঙে ফেলে। কেউ পারে না তাকে প্রতিরোধ করতে। আসে ঝড় হয়ে আগুন হয়ে বন্যা হয়ে ভূমিকম্প হয়ে। আসে যুদ্ধের মূর্তিতে, মহামারি অশান্তির আকৃতিতে। শোক হয়ে দুঃখ হয়ে অকালমৃত্যু হয়ে। তবু, প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ আবৃত করে যদি ভয়াল-করাল মূর্তিতেই আস, তোমাকে আমার শূন্য ঘরে অভ্যর্থনা করে নেব।

ভেবেছিলাম তুমি আসবে না। আরামের অভ্যাসে বন্ধ ঘরে নিশ্চিন্ত নিরীহতায় শুয়েছিলাম। দরজায় তোমার আঘাত লেগেছিল, ভেবেছিলাম বাতাসের শব্দ। রথচক্রের ঘর্ঘরও বুঝি কানে আসছিল, ভেবেছিলাম মেঘগর্জন। পাছে আরামের ব্যাঘাত ঘটে সেই আলস্যে বিশ্বাস করতে চাই নি যে তুমি আসবে, তুমি আসতে পারো। কিন্তু সহসা তুমি ঘরের সমস্ত দরজা ভেঙে প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মূর্তিতে দেখা দিলে। আমাকে এতটুকুও প্রস্তুত হতে দিলে না। কোথায় আলো কোথায় মালা কোথায় সভা, কোথায় আসন—আমি তোমাকে কী দিয়ে অভ্যর্থনা করব ? ভেবো না ভয় পেয়ে মুখ লুকোব, বা কিছু আয়োজন নেই বলে লজ্জায় মুখ লুকোব। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাই দিয়ে তোমাকে বরণ করে নেব। শূন্যতা দিয়েছ, সেই শূন্যতা দিয়েই আবাহন করব তোমাকে, রিক্ততা দিয়েছ তাই দিয়ে তোমার নৈবেদ্য রচনা করব।

'যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।'

ভেবো না ফিরিয়ে দেব তোমাকে। আমার আর্তনাদই তোমার শঙ্খধ্বনি হোক। আমার অশ্রুই হোক তোমার পাদ্য অর্ঘ্য। ঘর নেই, আমার আঙিনাই যখন ঘর, তখন ঐ আঙিনায় ছিন্ন শয়ন পেতে দেব, হে মহারাজ, সেইখানেই তুমি বোসো আমার পাশটিতে।

ওরে দুয়ার খুলে দেরে
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা

ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল

দুঃখরাতের রাজা ॥

কিন্তু তোমার দেওয়া দুঃখ আসলে তো তোমারই জন্যে দুঃখ। তাই কতক্ষণ পরে দেখি আমার অশ্রুর সরোবরে প্রসাদসুন্দর একটি শ্বেতকমল ফুটেছে—শান্তির শ্বেতকমল। আর-সমস্ত-কিছুর জন্যে যে কাঁদি সে আবিল অশ্রু, তোমার জন্যে যে কাঁদি সে অমল অশ্রু। দুঃখ দিয়ে যখন বোঝাও এ তোমার স্পর্শ, তোমার দান, তখন অশ্রুর আবিলতা কেটে যায়, সব হারিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যখন তোমাকে নিতে চাই, তখন দেখি কিছুই হারায় নি, অশ্রু তখন প্রেমাশ্রু হয়ে ওঠে। প্রেমাশ্রুই তো অমল অশ্রু।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু

সলিল মাঝে

আজি এ অমল কমলকান্তি

কেমনে রাজে।

একটিমাত্র শ্বেত শতদল

আলোকে-পুলকে করে ঢলঢল

কখন ফুটিল বল মোরে বল

এমন সাজে

আমার অতল অশ্রু-সাগর-

সলিল মাঝে।

কে জানত তুমি এমন অশান্তির রাজা হয়ে শান্তিরও অধিপতি। দুঃখযামিনীর তিমিরমঞ্জুষার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ একটি অমূল্য রত্ন, সে যে তোমারই প্রেমপ্রসন্ন মুখের উদার আশ্বাস। তুমি আছ, শত ঝড়ে-মেঘেও তোমার মুখখানি অম্লান আছে। আর কে না জানে ঝড় এসেছিল ঘর ভেঙেছিল সব গিয়েছিল বলেই দুঃখরাত্রির বুকচেরা ধন, তোমাকে পেলাম।

ইহারি লাগিয়া হৃদবিদারণ

এত ক্রন্দন এত জাগরণ

ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন

বক্ষে লেখি।

দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন

হেরিনু এ কী।

আমি জানি তুমি ক্ষুদ্রাত্মা নও, আমিই বা কেন তবে দীনাত্মা হব? না, আমি শুধু কোমলতা চাইব না, নেব তোমার কঠোরকে, তীক্ষ্ণকে, কর্কশকুটিলকে। নেব লাঞ্ছনা অপমান নেব সমস্ত প্রাতিকূল্য। সব কিছুতেই তোমার দয়া বলে মনে করব—শুধু হার নয়, প্রহারকেও। তাই বুকে করে রাখব, রাখব তোমার দান ও দয়ার মর্যাদাকে। আমি কাঙালের মতো তোমার ফুলের মালা চাইব না, দাও দাও তোমার উগ্র-নগ্ন তরবারি, দাও তার নির্মম আঘাত, ব্যাথা পাব, তবু সে আঘাত নেব বুক পেতে

রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ,
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান।

তোমার ভীষণের মধ্যেই তো অভয়, তোমার নিদারুণের মধ্যেই তো মঙ্গল, তোমার লেলিহান অগ্নিশিখাই তো আনন্দের মুখ। ফুলের মালা তো শুধু বাঁধতে চাইত, তরবারিই তো বন্ধনকর্তনের উপায়। দুঃখ দিয়েই তো তুমি আমাকে উজ্জ্বল করো সম্মানিত করো, অশান্তির মধ্যে শান্তির বাসা বাঁধো। সমস্তই তোমার বিচিত্র ছলনা, একমাত্র তুমিই শান্তির নিকেতন।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে···
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

॥ সাতাশ ॥

পরমাত্মা বর, জীবাত্মা বধূ। বিশ্ববৃন্দাবনে ভগবানই একমাত্র পুরুষ আর সমস্ত জীব প্রকৃতি।

আমার চিত্ত একটি নবীন বালিকা বধূর মত। ভীত, মূঢ়, নির্বোধ। তার কতটুকু বুদ্ধি যে সে তোমার বিরাটত্বকে বুঝবে, তোমার মহিমাকে হৃদয়ঙ্গম করবে? তোমার তত্ত্ব তার আয়ত্তের বাইরে, দুটি দিনের আয়ু নিয়ে কোথায়

দাঁড়িয়ে সে তোমার আয়তনের পরিমাপ নেবে? তোমাকে তাই শুধু সে খেলবার সাথি বলে মেনে নিয়েছে। তুমি শুধু তার দুবেলার ধুলোখেলার মানুষ।

'তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু।'

তার কোনো সাজসজ্জা নেই, না বিত্ত না বিদ্যা না-বা কোনো অহংকারের অলংকার। তবু এই সজ্জাহীনতার জন্যে তার লজ্জাও নেই একরতি। সে তার উপকরণহীন সহজ ঘরকরনের মধ্যেই তোমাকে ডেকে আনছে, হেলাফেলার খেলা খেলতে। গুরুজনেরা বলছে, এ তোমার পতি, এ তোমার দেবতা, একে যথোচিত পূজো করছ তো? শুনে বালিকাবধূ ভয় পায়, পূজার সে কি জানে? কাকে বলে মন্ত্র, কাকে বলে উপচার। কাকে বলে আসন, কাকে বা মুদ্রা!

জানি জানি তুমি আমার চাও না পূজার মালা
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে
নয় আরতির বাতি॥

বাসকশয্যায় বালিকাবধূ তোমারই বাহুবন্ধনের উত্তাপের মধ্যেই শুয়ে আছে, কিন্তু, হায় সে নিদ্রায় অচেতন। কত তুমি তাকে ডাকছ, কত তুমি কথা বলছ কানে কানে, কিন্তু তার সাড়া নেই, প্রতিধ্বনি নেই। এত কাছে থেকেও সে তোমাকে ভুলে আছে। কিন্তু যখন ঘোর দুর্দিনে দশদিক অন্ধকার করে ঝড় আসে, তখন তার ঘুম ভেঙে যায়, তখন আর তার খেলার কথা মনে থাকে না, সে প্রাণপণ নির্ভয়ে তোমাকে আঁকড়ে ধরে, তোমাকেই শরণ্য বলে মানে। পদে-পদে তোমার কাছে তার কত অপরাধ, তুমি কিছুই হিসেবের মধ্যে আনো না, নানা খেলায় তাকে মাতিয়ে রাখতে ভুলিয়ে রাখতেই ভালোবাসো।

যখন খেলি তখন খেলাটাই বড় হয়, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি না।

তুমি জানো বালিকাবধূর খেলা একদিন ঘুচে যাবে, সে নিজেই একদিন

উদ্যোগ করে প্রত্যাবর্তন করবে তোমাতে। খেলা শুরু যেমন খেলা, খেলা ভাঙাও তেমনি খেলা। খেলাশেষে আরেক লোকে, অমর্তলোকে, নিয়ে যাবে তাকে, নতুনতরো খেলায় খেলুড়ে করে। তারই জন্যে তুমি তোমার বিজন ঘরখানি সাজিয়ে রেখছ, সোনার পাত্রে সঞ্চিত করে রেখেছ নন্দনের আনন্দমধু।

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত'
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।···
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত॥

শুধু আমি ভিক্ষুক নই, হে রাজাধিরাজ, তুমিও ভিক্ষুক। তুমিও অনুরাগের প্রত্যাশী।

'আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত।'

সংসারকে সাড়ে পনেরো আনা দিয়ে দু পয়সা কম দিলে সে ফোঁস করে ওঠে, কিন্তু ঈশ্বরকে হেলায় দু পয়সা ছুঁড়ে দিলে ঈশ্বর দু' ধামা প্রসাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে কারবারে কোনো বাজারদর নেই। এককণা খুদের বিনিময়ে এককণা সোনা মেলে। একফোঁটা অশ্রুর বিনিময়ে মিলে যায় এক রাজ্যের সন্তোষ।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি—এ কী!
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোটো সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ ভিখারিয়ে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে॥

রাজভিখারি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হয়েও কাঙাল—ভালোবাসার কাঙাল। প্রাপ্তসমস্তকাম হয়েও তিনি দীনহীন—ভালোবাসা তাঁকে কে দেয়? কী হবে তাঁর সূর্যে-চন্দ্রে আকাশ-ভরা অন্তহীন ঐশ্বর্যে যদি ভক্তের ভালোবাসা না পান? এত কৃপা নিয়ে তিনি কী করবেন যদি তাঁর কৃপাপাত্র না মেলে? কৃপাপাত্র যদি

না পান তাহলে করুণার অনন্তসিন্ধু হয়েও তো তিনি ব্যর্থ। আমি কাঙাল কৃপার জন্যে, তিনি কাঙাল পাত্রের জন্যে।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
কী কাতর গান গাই' ?

আমি ছাড়া আর কে তোমার কৃপাপাত্র হবে ? কিন্তু আমার পাত্রও যে আবার নিপুণ অহংকারের কারুকার্য দিয়ে জমকালো করা। তোমার যে সে-পাত্র মনঃপূত নয়। তাই সে-পাত্রও আমি ভেঙে দিয়ে শুধু রিক্ত অঞ্জলি মেলে ধরব তোমার কাছে, তুমি তাই তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ করে দিও।

আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে।
আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও না পুরে॥

সহজের মত সুখ নেই।

'সহজ হয়ে সব দিবি তো সহজ হয়ে সকল লবি।'

সন্তোষই সবচেয়ে সহজ, আর সন্তোষেই সুখস্থিতি।

সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

যে সুখ চাইবে তাকে সন্তোষ আশ্রয় করতে হবে, আর যে সন্তোষ চাইবে তাকে সংযম অভ্যাস করতে হবে। সুখ বাইরে নেই, সুখ আছে মানুষের অন্তরে। উপকরণ-জালের বিপুল জটিলতার মধ্যে সুখ নেই, সুখ আছে সংযত চিত্তের সহজ সরলতার মধ্যে।

সকলের সঙ্গেই ছুটেছিলাম সমান বেগে, কিন্তু পারলাম না, পিছয়ে পড়লাম, আর সকলে উচ্চশিরে গৌরবের শিখরে গিয়ে হাজির হল, 'তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ, কত দূরের দেশ,' আর আমি রইলাম ধুলোয় পড়ে, পরাভূত ও প্রত্যাখ্যাত—নিরুদ্যম ও নিশ্চেতন। তখন বুঝিনি যার কেউ নেই কিছু নেই, তার তুমি আছে। যে সত্যি কাঙাল সেই তোমাতে প্রভূতাবত্ত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম এ না জানি কী দারুণ অপরাধ—কিন্তু যে শুধু অসমর্থ তাকে ব্যর্থ বোধ করতে দাও না, তার জন্যে তুমি হাত বাড়াও, তাকে তুমি নিজে এসে তুলে ধরো। সে তো যাত্রা করেছিল, সে তো ছুটেছিল, তারপর অশক্ত হয়ে থেমে পড়েছিল মাঝপথে—বাকি পথ তুমিই মুছে দিলে, মার্জনা করে দিলে, সে থামল বলেই তো তুমি নামলে, সে স্তব্ধ হল বলেই তো তুমি উচ্চারিত হলে।

পিছিয়ে পড়ল বলেই তো এলে এগিয়ে।

সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী
ভেবেছিলেম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে॥

'সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'পথ যার গৃহ, তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও একমুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না। অন্তরের কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করেনি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না। অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমাদের নানা শক্তিকে নানা দিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে-দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবারও খবর রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।'

সুখ সুখ করে দ্বারে-দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে॥

হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ের রাজা বসে আছেন এ কথা যেন হৃদয়ে গাঁথা থাকে; একথা যেন একটি নিশ্বাসের জন্যেও হৃদয় না বিস্মৃত হয়। আমার যেটুকু সীমা যেটুকু সামর্থ্য তার মধ্যেই আমি পর্যাপ্ত থাকতে চাই, যেটুকু আমার প্রাপ্য তাই তোমার দান ভেবেই আমার পরিতৃপ্তি। তোমার দান বলে যদি না ভাবি তাহলে অগাধও তো আমার কাছে অধিক হবে না। কিন্তু যদি তোমার হাতের দান বলে মনে করি তাহলে অল্পও অফুরন্ত। আমার হাতে বহুতন্ত্রিক বীণা নাই থাকল, যে একতারাটি দিয়েছ তাই একমনে বাজিয়ে যাব। একটি নাম—সর্বনাম—তুমি, আর একটি কথা—শেষ কথা—ভালোবাসা।

যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিসনে কানে
ফিরিসনে আর হাজার টানে
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার সেইটি রাজা॥

দীনতম জীবটিকেও ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। সে যে একদিন ঈশ্বরেই ছিল, আবার ঈশ্বর তাকে নিজের করে নিতে চান। আমিও তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ। যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়ে আবার তোমাতেই ফিরে চলেছি। তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ যে অসহনীয়। এই বিচ্ছেদের বেদনা শুধু আমার নয়, তোমারও। তাই যেমন তুমি আমাকে টানছ আমিও তোমাকে টানছি। তাই সমস্ত দুঃখের পথ মাড়িয়ে আমাতে ফিরে এস। তুমি তো আমাতেই ছিলে, কে তোমাকে আমার হৃদয় থেকে বার করে নিয়ে গেল? তোমার অনন্তে বিরহ-বেদনা আছে বলে আমার হৃদয়েও বিরহ-বেদনা।

তুমি এস। আমাকে জাগিয়ে তোলো। বিপদ, মৃত্যু, দুঃখ, শোক দিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে আমাকে নাড়া দিয়ে যাও। ওগো, তাকে তোরা আসতে দে। তাকে বারণ করিসনে। যদি তার পায়ের শব্দে আমার ঘুম না ভাঙে। তোরা ব্যস্ত হসনে, আমাকে ঘুমুতে দিস। আমি তোদের ডাকে, তোদের কোলাহলে জাগতে চাইনে, আমি শুধু তার স্পর্শেই জাগতে চাই। তার আসবার আশায় আমার এই অসাড়তাও ভালো।

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে—
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।

আমি যে ঘুমের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছি সে শুধু জেগে উঠে সুখের স্বপ্নকে চোখের সামনে মূর্তিমন্ত দেখব বলে। আমার সে-দেখা সফল হবে যদি সে আমাকে নিজের হাতে জাগায়। তোরা জাগাতে আসিসনে, তোরা জাগালে আমার সে-স্বপ্ন দুই নির্নিমেষ চোখে প্রত্যক্ষ করা হবে না।

'তোরা আমায় জাগাসনে কেউ, জাগাবে সে মোরে।'

আমরা কেউ উদাসীন, কারু বা অন্যত্র কাজ আছে। কেউ বা উপহাস করছি, কাউকে বা ঘিরে আছে অভ্যাসের আবরণ। আমরা সংসারে কোলাহল শুনছি, স্বার্থের আহ্বান শুনছি, প্রতিদিনের প্রয়োজনের ডাক শুনছি কিন্তু আনন্দময়ের আনন্দভবনে উৎসবের আমন্ত্রণের ডাক শুনতে পাচ্ছি না।

'আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল—দরজা রুদ্ধ—কেউ শুনল না।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম—সেখানে কি কেবল কাজ, কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল! কেবল কলহ, মাৎসর্য, বিরোধ! সেখানে কি ওরাই সকলের চেয়ে প্রধান? এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা, একে মানব না! পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না! সেইজন্যে জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমনি একটি চিরবিরহের করুণা। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ হয়েছে, মাঝখানে স্বার্থের মরুভূমি। সেই মরুভূমি পার হয়ে ডাক আসছে। এসো, এসো—সেই ডাকের কান্নায় আকাশ ভরে গেল, আলোক ফেটে পড়ল।'

তবু জাগলাম কই?

'কিন্তু যিনি উৎসবের দেবতা, তিনি অপেক্ষা করতে জানেন।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে তিনিই পার করছেন, পথহারাদের ক্রমে ক্রমে পথে টেনে আনছেন। দুঃখের অশ্রুতে তাঁর মিলনের শতদল বিকশিত হচ্ছে। তিনি জানেন যে বধির সেও শুনবে, চিরযুগের রুদ্ধদ্বার একদিন খুলবে, পাষাণ একদিন গলবে। এই বাধা-বিরোধের ভিতর থেকে তিনি টেনে নেবেন।'

মানুষের জাগরণ সহজ নয়, তাই বিধাতার রাজ্যে এত বিরাট কাণ্ডকারখানা! তাই এত যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষা।

মানুষ যখন ঈশ্বরকে জাগাতে পারবে, তখনই সে নিজে জাগবে।

কুয়োর ধারে বসেছিলাম, তুমি কখন এলে পদধ্বনি শুনতে পাইনি। তোমার ক্লান্ত কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা শুনে চমকে উঠলাম। কী আশ্চর্য, তুমিও প্রার্থনা করো—আর তা কিনা আমার কাছে! বললে, আমি তৃষ্ণাকাতর পান্থ, আমাকে একটু জল দিতে পারো? পারি। বলে আমার ভরা কলসের থেকে একটি জলের ধারা তোমার করপুটে ঢেলে দিলাম। আর কোনো আমার কৃতিত্ব নেই, শুধু তোমার তৃষ্ণার তপ্ত মুহূর্তে তোমাকে এক অঞ্জলি জল দিতে পেরেছি।

তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।

ঈশ্বরও তৃষার্ত। তাঁর তৃষা আমার জন্যে, আমার হৃদয়রসের জন্যে। আমার জন্যেই যে তাঁর তৃষ্ণা তা বোঝা যাচ্ছে আমারই তৃষ্ণার মধ্যে। কে তিনি যাঁর জন্যে আমি তৃষিত হব যদি আমার জন্যে তাঁর তৃষ্ণা না থাকে? তাঁর অসীম তৃষ্ণাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো প্রভাতের আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার, এই লিপিলিখনের তো কোনোই প্রয়োজন ছিল না। এ কেবল হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের ডাক। এ এক হৃদয়নির্ঝরের প্রতি এক হৃদয়মহাসমুদ্রের আহ্বান। রস ছাড়া রসের মিলন নেই। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি কোথায়?

আমার বিরহ-বেদনা থেকেই তো বুঝতে পারি তোমার বিরহ-বেদনা। তোমার বিশ্বব্যাপী আনন্দকাব্যের মধ্যে রয়ে গেছে একটি বেদনার সুর— আমাকে তুমি পাওনি। সেই বেদনার সুরে আমাকেও আমার জীবন-কাব্য রচনা করতে দাও—তোমাকে আজও আমার পাওয়া হল না। দুঃখের মন্থনেই রসের জাগরণ, যেমন নুড়ির আঘাতে ঝর্ণার কলগান। সংসারে সবচেয়ে বড় দুঃখ তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ। সেই বড়ো দুঃখে আমাকে প্রস্ফুটিত করো। সেই দুঃখের মধ্য দিয়ে আর সমস্ত দুঃখ আমি সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যাব তোমার জন্যে বড়ো দুঃখ পেয়েছি একথা বলতে পারার মত আনন্দ আর কী আছে?

'তোরা কেউ পারবি নে গো, পারবি নে ফুল ফোটাতে।'

যে পারে সে শুধু একজনই পারে—একপলকে পারে। বেদনার কণ্টক-বৃন্তে আমাকে স্থির থাকতে দে। সেই পারবে আমাকে বর্ণে-গন্ধে উন্মুদ্র করে তুলতে।

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে॥

আমি এ সংসারে আমার খেলা খেলতে আসিনি, তোমার খেলা খেলতে এসেছি। তাই এ খেলায় আমার হারলেও জিত, জিতলেও জিত। খেলাটাই কথা, হার-জিত কথা নয়। তাই—

'হারাও যদি হারব খেলায়, তোমার খেলা ছাড়ব না।'

আর খেলা তো একজন্মেই শেষ নয়, পরে আরো কত খেলা খেলতে হবে কে জানে।

'কী ইঙ্গিতে আনন্দিতে, ডাকিল লীলাভরে,
দুয়ার-খোলা পুরোনো খেলাঘরে।'

তাই কী করে বলি এই পরাজয়ই শেষ পরাজয়? যেন শেষ দানে তোমার কাছে নিজেকে নিঃশেষ বিকিয়ে দিতে পারি—তাহলে আগে-আগে কত হেরেছি তার হিসেবের অঙ্ক শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তখন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এক অতলান্ত শান্তি।

আজ ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ মন মোর ফুরালো—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো॥

'খেয়া'তে আদ্যোপান্ত এই ঈশ্বরসৌরভ। সে ঈশ্বর কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রস্ফুট। কখনো স্বনামে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কখনো বা বেনামে বিকল্প চিত্র-কল্পে অভিব্যঞ্জিত। কখনো বা সে সরাসরি প্রভু, নাথ, স্বামী, বিধাতা, বিশ্বেশ্বর—কখনো বা প্রতীকবর্ণিত, যেমন, মাঝি, সারথি, প্রাণের মানুষ, পরাণ সখা, ধ্যানের ধন—কখনো বা শুধু বন্ধু, মধুর, সুন্দর, প্রিয়। অরূপ-অপরূপ। কখনো ব্যক্তিস্বরূপ, কখনো ভাবস্বরূপ। কখনো স্পষ্টীকৃত কখনো আভাসিত। কখনো আভাত, কখনো অনুভূত। কখনো ভক্তিতে উচ্চারিত কখনো বা প্রেমে আচ্ছাদিত। কে না জানে কবিতার অবকাশ স্পষ্টতার মধ্যে তত নয় যত ধূসরতার মধ্যে। অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেই কবিতার রসহানি। তাৎপর্য আধ্যাত্মিকও হতে পারে মানবিকও হতে পারে এই ভাবদ্বৈত ঘটাতে পারলেই

কবিতায় সফল হবার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু ভক্ত নন, কবি—ভক্তকবি। তাই কবিতার প্রয়োজনে 'খেয়া'য় তিনি ঈশ্বরকে অস্পষ্ট করেছেন, নাম দিয়েছেন খেয়ার নেয়ে, পথ-পাগল পথিক, নয়তো বা অন্তবিহীন অজানা। আর এই অনির্ণেয়তার জন্যে কবিতা হিসেবে 'খেয়া'র উৎকর্ষ সমধিক।

দীর্ঘ ষাট বছরের সক্রিয় সাহিত্য জীবন যাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গানে-গল্পে কবিতায়-নাটকে প্রবন্ধে-উপন্যাসে অজস্র বিচিত্র অমূল্য রচনা উপহার দিয়েছেন দেশকে, ধরণীকে। অনেকানেক পথ তিনি পরিক্রমণ করেছেন—মানবিক, প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, জাগতিক, স্বাদেশিক, বিশ্বভৌমিক—কিন্তু সর্বত্রই তিনি ঈশ্বরকে, সকল সুন্দরসন্নিবেশকে, সকল আনন্দসন্দোহকে, পথের সাথি করে নিয়েছেন। ঈশ্বর কখনো সন্নিহিত কখনো ব্যবহিত, কিন্তু কখনোই বিরহিত নয়। রবীন্দ্রনাথ কখনোই অনীশ্বর অরাজক রাজত্বে বাস করেন নি। এ নয় যে জীবনের বিশেষ একটা পরিচ্ছেদেই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন—শুধু 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত—আর বাকি জীবন তিনি ঈশ্বর-শূন্য। যেন ভক্তিপর্ব বা ঈশ্বরপর্ব বলে রবীন্দ্র কাব্যজীবনের কোনো একটি বিশেষ অধ্যায়কে চিহ্নিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ঈশ্বরে অনুস্যূত, কী জীবনে কী সাহিত্যে। এই ঈশ্বর প্রণিধানে কখনো তিনি বৈষ্ণব পদাবলী, কখনো শ্রীমদ্ভাগবত, কখনো উপনিষদ। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের দাবিতে কলা-সাফল্যের খাতিরে ঈশ্বরকে তিনি গোপন করেছেন, কিন্তু কখনো তিনি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নি। পথে যেতে-যেতে বারে-বারে ফিরে-ফিরে ঈশ্বরকে স্পর্শ করেছেন। আর আজীবন এই ঈশ্বরে লগ্ননিমগ্ন ছিলেন বলেই তিনি জীবনে ও সাহিত্যে এত মহামহিম।

কে যেন আমার নয়ননিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যেদিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিনু
কমলবরণ শিখা
আমার অন্তরে দিল টিকা।
ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
এ পরশরেখা দিব না ঘুচিতে

সন্ধ্যার পানে নিয়ে যবে বহি
সব প্রভাতের লিখা—
উদয়রবির টিকা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নবপ্রভাতের টিকা—এই ঈশ্বরস্পর্শ বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুছে ফেলা দূরের কথা, কখনো তা ম্লান হতে দেন নি।

ঈশ্বর আছেন আর আমাকে যেটুকু তিনি দিয়েছেন তা আমার যোগ্যতার অনেক বেশি—এই বলীয়ান সন্তোষের ভাবই 'সব পেয়েছির দেশ।' ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দিলে সেটা হয়ে ওঠে 'কিছু না পাওয়ার বাজার।' আর বোঝাবুঝি নেই খোঁজাখুঁজি নেই, এক পরমা নির্বৃতির মধ্যে চলে আসা, সব ভয়-ভ্রম-ভাবনার চরমা আবৃতির মধ্যে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি
নাইকো হাটে গোল—
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল।

'যখন জানব পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন, তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়ম পালনমাত্র হবে না।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সঙ্কটময় হয়ে ওঠে—তখনই সে অরাজ অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

তাই প্রতিদিন এসো, অন্তরে এসো। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হোক, কোনো আঘাত না পৌঁছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন কোরো না, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জাগিয়ে রেখো না—কেন না সেইখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেব-মন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে, তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর, তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের ফটক বন্ধ। এসো সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এসো, সেই অনন্তের সিন্ধু-তীরে এসো, সেই অতুচ্চের গিরিশিখরে এসো। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও। সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই

গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও, সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।'

॥ আটাশ ॥

বিপ্লববাদের ঋত্বিক অরবিন্দ ঘোষ। ইংরিজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র বঙ্গ-সাহিত্যের দান। আর দৈনিক পত্রিকাটির মন্ত্র, ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানস, ভারত শুধু ভারতবাসীর জন্যে, সেটিও বাঙালির উদ্ভাবন।

তুমি বিদেশী, বিজাতি, এদেশে তোমার কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। এ দেশ তোমাকে কেউ ইজারা দেয়নি, কেউ বন্ধক রাখেনি তোমার কাছে। তুমি সামান্য অনুমতিসূত্রেও দখলিকার নও। তুমি একদম উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। তোমার প্রবেশ অনধিকার-প্রবেশ। তুমি সরে পড়ো, অপসৃত হও। যে সভ্যতার বড়াই করছ সে সভ্যতারই দাবি অন্যের বুকের উপর তুমি পাথর হয়ে চেপে বসতে পারো না। সুতরাং নেবে পড়ো, পিছু হটো।

এই মন্ত্রের থেকেই মহাত্মা গান্ধির যুদ্ধনাদ—কুইট ইণ্ডিয়া। কথাটি 'কুইট'—একটি আইনের বচন। তোমার যখন কোনো মৌল স্বত্ব নেই তখন তোমার দখলের অধিকার নেই। সুতরাং আইনের নির্দেশেই তুমি এবার পথ দেখ।

বন্দেমাতরম-এর একটা প্রবন্ধ রাজদ্রোহাত্মক এই ওজুহাতে সরকার মামলা করল। প্রবন্ধটা যে অরবিন্দের লেখা তাই প্রমাণ করতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় সম্পাদক-প্রধান বিপিন পালের ডাক পড়ল। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করল। আদালত-অবমাননার দায়ে তার ছ'মাস জেল হয়ে গেল।

প্রবন্ধে আছে কী? আছে সরল সত্যকথা, ইংলণ্ড ইংরেজদের জন্যে এ বলা যদি অপরাধ না হয়, তাহলে ভারত ভারতবাসীদের জন্যে এ বলা অপরাধ হবে কেন?

রথীকে বিলেতে রবীন্দ্রনাথ স্টেটসম্যান পাঠাতেন, এখন থেকে তার বদলে 'বন্দেমাতরম' পাঠাতে লাগলেন।

আর অরবিন্দের উদ্দেশে লিখলেন তাঁর 'নমস্কার।' এ নমস্কার শুধু

অরবিন্দকে নয়, নমস্কার বিশ্ববিধাতাকে, ইতিহাস-পুরুষকে।

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
তারপরে তারে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে ;
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজ্য, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!

নানা ঘটনা ঘটে গেল একে-একে। চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দলের সংঘর্ষে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা চরমপন্থী, সে তার উদার আদর্শের বেদী থেকে ধুলোয় নেমে এসে নরমপন্থীদের সঙ্গে কলহে নিযুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, আমাদের নষ্ট করতে তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের দরকার হবে না, আমরা নিজেরাই পারব। এই আত্মহননে এইটুকুই শুধু বৈশিষ্ট্য থাকবে যে হানাহানির সময় দুই দলই রণধ্বনি তুলব—বন্দেমাতরম্।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের ডাক এল সভাপতি হতে। উগ্র-পন্থীরা ভাবল রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থী, ইংরেজকে তারস্বরে গাল দেবেন না। তাই তারা বেনামী চিঠি পাঠাতে লাগল, যদি আপনি সভাপতিত্ব করেন তাহলে সভা বসতে দেব না, সব ভণ্ডুল করে দেব। রবীন্দ্রনাথ ভয় পেলেন না, যেহেতু তিনি সত্যপন্থী—তিনি জানেন, 'যেটা সত্য সেটা ভালোও নয়, মন্দও নয়, সেটা সত্য'—তাই তিনি নিমন্ত্রণে রাজি হলেন।

একটা নতুন কাণ্ড করলেন। সম্মেলনে বাঙলায় ভাষণ দিলেন। এ পর্যন্ত ইংরিজি ভাষণই রেওয়াজ ছিল, রবীন্দ্রনাথ নতুন পথ দেখালেন। শুধু পথপ্রদর্শক নন, পথিকৃৎ হলেন। মাতৃভাষাকেই মহত্তর মূল্য দিলেন। তিরিশ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে যখন পৌরোহিত্য করতে ডাকা

হল, তিনি সেই বাঙলাতেই ভাষণ দিলেন। ভুললেন না ভগবানের কাছে তাঁর কী প্রার্থনা ছিল !

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক
হে ভগবান।

এদিকে বোমায়-বারুদে বাঙলায় বিপ্লববাদ সশব্দ হয়ে উঠল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ভুল করে মজঃফরপুরে মিসেস কেনেডি ও তার মেয়েকে খুন করা হল। যে-গাড়িতে বোমা ফেলা হয়েছিল সেটা কিংসফোর্ডের বটে কিন্তু আরোহী কিংসফোর্ডর বদলে সকন্যা মিসেস কেনেডি। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল আর প্রফুল্ল ধরা পড়বার আগে আত্মহত্যা করল।

সমস্ত দেশ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। কতকটা বা আনন্দে হতবাক।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বাঙালির মনে এ আনন্দ স্বাভাবিক। বহু দিন থেকে বাঙালি জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করে নতশির হয়ে রয়েছে। তাই এই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার ঠাঁই পাচ্ছে না। এ সব বিচার অতিক্রম করে শুধু অপমানমোচনের তৃপ্তিই তাকে ভরপুর করে রাখছে।

সাহস ও শৌর্য, উচ্চতম আদর্শের জন্যে আত্মবলিদানের মহত্ত্ব—বিপ্লবী যুবকদের চরিত্রকে মনে-প্রাণে তিনি অভিনন্দিত করলেন কিন্তু গুপ্তহত্যাকে সমর্থন করতে পারলেন না। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। বললেন, বলদর্পিত ইংরেজের গায়ের জোরের মূঢ়তার থেকে মুক্তির প্রয়োজন কে অস্বীকার করবে, কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাতে হবে প্রশস্ত পথ দিয়ে, কোনো সঙ্কীর্ণ স্বল্প পথ দিয়ে নয়।

এ উক্তিরই সমর্থন করলেন গান্ধি। প্রাপ্তিকে মহৎ করতে হলে পদ্ধতিকেও মহৎ করতে হবে।

কর্মবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধিকে মেলাতে হবে। বললেন রবীন্দ্রনাথ, ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়লেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে কর্মের স্থিরতা থাকে না, আর কর্ম অস্থির হলে ফল শুভাবহ হয় না। ধর্মের পথ দুর্গম। ঐ পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, এর পাথেয় সংগ্রহ করতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ

করতে হবে—এর সাফল্য অন্তকে পরাস্ত করে নয়, নিজেকে পরিপূর্ণ করে।

বিপ্লবের অগ্ন্যুদগারের মধ্যেও ঈশ্বরকে মনে রাখতে হয়, মাথায় রাখতে হয়। নচেৎ ঈশ্বর ক্ষমা করেন না।

নির্ঝরিণী সরকারকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

'নিশ্চয়ই মনে রাখবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে পরিবারকে লঙ্ঘন করলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেও পাপকে আশ্রয় করি তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। দেশের যে দুর্গতি দুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করে আসছি তার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হয়ে আছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করে আমরা সেকারণ দূর করতে পারব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবল বেড়েই চলবে। এই ব্যাপারে যে সব অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হচ্ছে তাদের জন্যে হৃদয় ব্যথিত না হয়ে থাকতে পারে না—কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদের এই বেদনা দিলেন, কারণ বেদনা ছাড়া পাপ দূর হবার নয়।'

দেশের লোক রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝল। আরো ভুল বুঝল যখন তিনি পূর্বে-পশ্চিমে মিলন ঘটাতে চাইলেন। লিখলেন, ইংরেজ বিধাতৃ-প্রণোদিত হয়ে তার উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাতে এসেছে, সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবে না। সে সফলতা পূব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নয়। আমাদের সকল দাবিই আমাদের জয় করে নিতে হবে, হীনতা দিয়ে নয়, মহত্ত্ব দিয়ে, মনুষ্যত্ব দিয়ে ত্যাগের পথে শ্রেয়কে বরণ করে নিয়ে।

লোকেরা বিরূপ হোক কিন্তু ধর্মকে উচ্ছেদ করে দিয়ে শত্রুকে উচ্ছেদ করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ তো সাময়িক নন, তিনি সামগ্রিক। তাই তিনি অন্যায়ের প্রতিকারে অন্যায়কে উত্তেজিত না করে জাতীয়তার গণ্ডির ঊর্ধ্বে মহামানবের মৈত্রীর ক্ষেত্রে দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইলেন। লিখলেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন অহিংস প্রতিরোধের মহত্ত্ব।

রাজ্যটা কি একমাত্র রাজার ? আমরা প্রজা, রাজত্ব কি আমাদেরও নয় ? আমরা না থাকলে রাজা কোথায় ? আমরা জীব, আমরা না থাকলে ঈশ্বর কোথায় ? আমরা আছি বলেই তো তাঁর এই রাজত্ব, এত ঢাকঢোল। তিনি কৃপার ভাণ্ডার নিয়ে কী করবেন যদি ঢালবার মত কৃপাপাত্র না থাকে ? তাই অহিংস সত্যাগ্রহের প্রতিমূর্তি ধনঞ্জয় বৈরাগী গেয়ে উঠল :

'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

নিশ্চয়ই—আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রতিভাস। রাজায় প্রজায় তাই আর ভেদ নেই। সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিদ্বেষ। এক-এক করে সকলকে মিলিয়ে যোগফলও সেই এক।

আমরা বসব তোমার সনে
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।

রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীই বুঝি মহাত্মা গান্ধির অগ্রদূত।

রাজা গর্জে উঠল : তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয় বৈরাগী বললে, খেপাই বই কি, নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই যে আমার কাজ।

আবার ধনঞ্জয়কেও কেউ খেপিয়ে বেড়ায়।

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন খেপা সে,
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন বাতাসে।
গেল রে গেল বেলা
পাগলের কেমন খেলা
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন হুতাশে।

সে পাগলের থেকে মন্ত্র নিয়েছে বলেই তো ধনঞ্জয় শক্তিশালী, ধনঞ্জয় অপরাভূয়।

রাজা বললে, মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজানা বাকি—দেবে কি না বলো!

ধনঞ্জয় স্পষ্ট জবাব দিলে, না মহারাজ, দেব না।

দেবে না। এত বড়ো স্পর্ধা!

যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

আমার নয়?

আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

রাজা হুঙ্কার ছাড়ল : তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে ?

ধনঞ্জয় প্রশান্তস্বরে বললে, হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না, পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমি বলি, এমন কাজ করতে নেই, প্রাণ দিবি তাকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী ক'রিসনে।

দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয় হাসিমুখে বললে, যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি, মহারাজ, সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।

'যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।'

ধনঞ্জয় জেলে গেল, জেলে আগুন লাগল, ধনঞ্জয়ও ছাড়া পেল। এল রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা জিজ্ঞেস করল, এখন তুমি যাবে কোথায় ?

ধনঞ্জয় বললে, রাস্তায়।

বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয় গম্ভীরস্বরে বললে, মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক, আমরা কোথায় লাগি ?

রাজ্যও পথ—তপোবনের পথ। যে রাজা হবে সেও নিরাসক্ত হবে। ঈশ্বর শুধু ভবের হাটে বা শ্মশানঘাটেই নয়, তিনি রাজ্যপাটেও সমাসীন।

তাই তো ধনঞ্জয় গান ধরল :

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে
ধন্য হরি রাজ্যপাটে
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।

যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি ? কত আর মারবেন ? যন্ত্রণাকে হয় জীবন দিয়ে সহ্য করব, নয় মৃত্যু দিয়ে স্তব্ধ করব। দেখি কত তিনি কাঁদাতে পারেন, কতক্ষণ ধরে। যদি আমার কান্নার শেষ নেই তাঁর

করুণারও শেষ নেই।

আরো আরো প্রভু আরো আরো
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই।
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥

কিন্তু যত মারবেন ততই তো তাঁর স্পর্শ দেবেন, যত কাড়বেন ততই তো দেবেন তাঁর আচ্ছাদন। প্রহারের চিহ্নগুলিই তো তাঁর দেওয়া অলঙ্কার হয়ে শোভা পাবে। তিনি দুঃখ দিচ্ছেন, দিন, আমি আনন্দে সেই দুঃখের ঋণ শোধ করব। আমিও তাঁরই মত বিধাতা, দ্বিতীয় বিধাতা, আমি দুঃখের থেকেই আনন্দকে সৃষ্টি করি। ক্ষণিকের খেলাঘরকে স্বর্গ করে তুলি।

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

দুঃখ ছিল বলেই তো আনন্দে অধিকার। ঋণ ছিল বলেই তো ঋণশোধের শক্তি, ঋণশোধের ঐশ্বর্য। প্রকৃতি নিজের মধ্যে যে অমৃতশক্তি পেয়েছে তাই সে বিচিত্র রূপে-রসে শোধ করেছে। আমাদের জীবনে যে এত প্রেম তাও তো ঈশ্বরের কাছ থেকেই ঋণ নেওয়া—সেই ঋণ অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই শোধ করতে হবে।

এই সময়েই শারদোৎসব লেখা।

শারদোৎসবের ঠাকুরদাদা আরেক ধনঞ্জয়। তাকে সন্ন্যাসী বলছে, আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেই-জন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার একটুকু বিশ্রাম নেই, সেই-জন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা সায় দিল: 'একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবল ঢেলেই দিচ্ছেন, আর এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলেছে। কেবল এই দুঃখের

জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি তাই এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী আবার বললে, যেখানে আলস্য যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেখানে সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে চায় না।

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন, বললে সন্ন্যাসী তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন। তাঁর এই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন— শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে।

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।
দেখ রে চেয়ে আপন-পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি পাই॥
হল না তার ফুটে ওঠা
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা
মর্ত কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে নাই।

দুঃখের পর দুঃখ—কেবল দুঃখ। মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যুর পর তার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অনেক দিন বিবাহ করেনি; রবীন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়ে পাথুরেঘাটার সতীন্দ্র ঠাকুরের মেয়ে ছায়ার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের বিয়ে দেন। বিয়ের তিন মাস পরেই সত্যেন্দ্র মারা যায়। রবীন্দ্রনাথ আবার শোকের সম্মুখীন হন, বিশেষত ছায়া তাঁর মনে একটি বিষাদের ছায়া হয়ে লেগে থাকে।

কিন্তু শোক কোথায়? শমী যখন চলে গেল তখনই বা তিনি কী দেখেছিলেন, কী পেয়েছিলেন?

নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রালোক
অস্তিত্বের এত বড় শোক
নাই মর্তভূমে।

বিশ্ব জুড়ে আছেন শুধু তিনি আর তাঁর জগৎজনতা। তিনিই প্রথম তিনিই একমাত্র। বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা

বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে, তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে।'

তাই যিনি শোক দিচ্ছেন তিনিই আবার নিয়ে আসছেন সান্ত্বনা। ভক্তির সান্ত্বনা, শরণাগতির সান্ত্বনা।

দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়িনীর বালিকা কন্যা প্রতিমারও স্বামী মারা গেল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিমাকেই তাঁর পুত্রবধূ করে নিলেন।

যত দুঃখ থাক তার উপরে আছে 'নক্ষত্রের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন।' 'আকাশের এক বিন্দু নীলে, তোমার পরাণ ডুবাইলে, শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।' দুঃখের পটেই তো আনন্দের আলিম্পন। 'বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।'

ক'দিন পরেই আবার খবর এল তাঁর আকৈশোর বন্ধু শ্রীশ মজুমদার মারা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'অনেক দিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে বসেছি। সে সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেই জন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে, কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।'

না, তা হবে না, তার চেয়ে অসাধ্য কিছুই হতে পারে না।

তবে কী করা কর্তব্য ?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে। তবেই নতুন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে। এটা বেশ করে জানতে হবে, যে জীবন আমার ছিল সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি. খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্র ভগবানে বেঁচেছি। নিভ্রান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে সুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পর এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম, একটি একটি করে, একটু একটু করে, তার থেকে মরতে হবে। এসো মৃত্যু এসো—এসো অমৃতের দূত, এসো—

এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত
এসো গো অশ্রু সলিলসিক্ত
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত
এসো গো চিত্তপাবন,
এসো গো পরম-দুঃখ-নিলয়
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এসো সংগ্রাম এসো মহাজয়
এসো গো চরমসাধন ॥'

দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে কান্তকবি রজনীকান্ত কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় উপস্থিত হলেন।

দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের পরিচয়—প্রথমে পত্রযোগে পরে প্রত্যক্ষে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন :

প্রিয়বরেষু,

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কী হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণকর্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।

পরিষদের সভা হচ্ছিল নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। দোতলা গৃহ, উপরে নিচে দু জায়গায় সভা হচ্ছে। উপরের সভায় সভাপতিত্ব করছেন সারদাচরণ মিত্র, নিচের সভায় রবীন্দ্রনাথ। রজনীকান্ত নিচের সভাতেই আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হলেন।

রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, এবার তবে গান শোনান।

রজনীকান্ত তাঁর সদ্যলিখিত দুখানি গান গাইলেন। একটি 'সৃষ্টির বিশালতা'—'লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ নীল গগন-গর্ভে'—আরেকটি 'সৃষ্টির সূক্ষ্মতা'—'স্তূপীকৃত গণনরহিত ধূলি সিন্ধুকূল।'

গান শুনে সমস্ত সভা অভিভূত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন।

পরদিন সকালে দীনেশচন্দ্রকে নিয়ে রজনীকান্ত গেলেন জোড়াসাঁকো। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে গান দুখানি অবার গেয়ে শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।'

এর পর রজনীকান্ত যখন কণ্ঠ-ক্যান্সারে ভুগছেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন, রবীন্দ্রনাথ এলেন দেখা করতে।

রজনীকান্তের স্বর তখন লোপ পেয়েছে, যা বলবার লিখে প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথকে দেখে লিখলেন: 'আর কথা কইতে পারি না। একবার আপনাকে দেখতে বড় সাধ ছিল, নইলে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হত। সে দেখা আমার হল। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। মহাপুরুষ, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান। বলুন, শিবা মে পন্থানঃ সন্তু।'

রজনীকান্ত আরো লিখলেন, রাজসাহিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে রাজার পার্ট করেছেন। লিখলেন: 'আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতাম। অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে।'

রজনীকান্তের ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাদের পিতার লেখা গান গেয়ে শোনাল:

বেলা যে ফুরায়ে যায়
খেলা কি ভাঙ্গে না হায়
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?

রোগের অসহ্য কষ্ট উপেক্ষা করে রজনীকান্ত উঠে বসে হার্মোনিয়ম বাজাতে লাগলেন।

যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে বললেন, 'আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে।'

তাঁর মৃত্যুশয্যার দিনলিপিতে রজনীকান্ত লিখলেন 'আজ রবিঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বললেন, আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে। শুনে আমি লজ্জায় মরি।'

সেই দিনই রজনীকান্ত নতুন গান লিখলেন—'আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ, গর্ব করিতে চুর।' গানটি পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখলেন :

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি মাংস স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না। ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

'এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?'

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখবেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্ত তো পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধুলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।···

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো

তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারেই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন তাহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবনসঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ উনত্রিশ ॥

সারাজীবন নানাপ্রকার বিরুদ্ধতা সহ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ—বিরুদ্ধতা অনেক সময় নিন্দা-বিদ্রূপের সাহিত্যিক সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত অসম্মানে গিয়ে ঠেকেছে। বিপক্ষের বিরুদ্ধে বা নিজের সমর্থনে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, সে সব বিষভাষণের দিকে দৃকপাত করারও তাঁর কৌতূহল নেই। কানে অবশ্য শুনতে হয় যেহেতু আশেপাশে উত্তেজিত গুঞ্জনে বহু লোকই ঘোরাফেরা করে।

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটি আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধও করিয়াছি, কারণ, লেখকজাতির অভিমান অল্পেই আঘাত পায়—অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিজনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই কোনো শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষের প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে আমি তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকি। জীবন-প্রদীপের তেল তো খুব বেশি নয়, সবই যদি রোষে-দ্বেষে হুহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব ?'

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনই এই ভগবানের আরতি।

ভগবানের রাজ্যে কোনো দুঃখই তুচ্ছ নয় কোনো অসম্মান ত্যাজ্য নয়। অসম্মান তো ভগবানেই সন্নিহিত হবার ছাড়পত্র, তাঁরই স্বাক্ষরযুক্ত গোপন লিপি। একেবারে নিভৃতে নিমন্ত্রণ।

কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব॥

যতক্ষণ মানে আছে ততক্ষণ নাম কই? যে মানে থাকে সে নামে থাকে না। মানকে উলটে দিলেই নাম হয়। মানে ঘা পড়লে সেই আঘাতের বেগে একেবারে ভগবানের কাছটিতে চলে আসি।

কিন্তু কে ভগবান? কোথায় তিনি?

প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের আগেই রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে গিয়ে বসেন। দুচারজন শিক্ষক ও কয়েকটি ছাত্রও আসে। নীরবে কতক্ষণ ধ্যান করেন রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক ছাত্রেরাও স্তব্ধ হয়ে থেকে সে ধ্যানের প্রশান্তিকে প্রগাঢ় হতে দেয়। ধ্যানের শেষে তারা কবিকে অনুরোধ করে, কিছু বলুন।

রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন। তারপর ঘরে ফিরে সেই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন। সেই কথিত বাণীর লিখিত রূপই শান্তিনিকেতন।

সতেরো খণ্ডে গ্রথিত এই শান্তিনিকেতন। প্রথম আটখণ্ডে ধর্মভাষণ ধর্মজিজ্ঞাসা, বাকি নয় খণ্ডে অন্যান্য বক্তৃতা। কী বিরাট সৃষ্টি! কী সুদূর-বিস্তৃত সন্ধান! কী সর্বহৃদয়পূর্ণকারক সিদ্ধান্ত!

এ শুধু কবির কাব্যব্যঞ্জন নয়, একাগ্র সাধকের ধ্যান ও মননের সম্পদ।

'রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি।' লিখছেন দীনেশচন্দ্র:

'ইহাই তাঁহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরসসিক্ত করিয়া দিয়াছে—ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভার স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে—ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা।'

এই 'শান্তিনিকেতন'ই গীতাঞ্জলির ভিত্তি।

আর গীতাঞ্জলির দেবতাই ভক্তের ভগবান। জীবনদেবতার মত অনির্দেশ্য কেউ নয়, নয় বা 'খেয়ার' রহস্যময় মাঝি, এ একেবারে কাছের মানুষ, মনের মানুষ। ঘনিষ্ঠ, অব্যবহিত, একেবারে চোখের উপর, সামনাসামনি, হাতের নাগালের মধ্যে। এ আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়।

ধর্মের সমস্ত ভূ-ভাগের অধিপতি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যে সর্বভাবের সমন্বয়। তাঁর মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, গীতার কর্মবাদ, ভাগবতের ভক্তিবাদ, দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তিবাদ—সমস্ত একসঙ্গে। তিনি এক আধারে জ্ঞানী, কর্মী, যোগী, ভক্ত—ভক্তশ্রেষ্ঠ। সর্বোপরি তিনি কবি, কবি সার্বভৌম, সেই হেতু তিনি সমস্ত রসে সমাবিষ্ট। তিনি তাই যেমন শৈব আবার তেমনি বৈষ্ণব, যেমন তিনি দ্বৈতভূমিতে তেমনি আবার অদ্বৈতলোকে। কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন, —সর্বত্র ও সর্বদা তিনি মানুষেই সন্নিহিত, সংসার থেকে অবিচ্ছিন্ন। এই মানুষ—মানুষোত্তম—চিরজীবী মানুষ—মনের মানুষ—এই মানুষই রবীন্দ্রনাথের ভগবান। 'নমি নরদেবতারে।'

জীবনদেবতা এখন এই পরমমানুষ মনের মানুষের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমি শহরের মানুষ,' হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

'একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।' আমি যেন চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, 'হৃদা মনীষা'—খুঁজি হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে কর্ম দিয়ে। সেই মহান আত্মার অমরাবতী হচ্ছে, 'সদা জনানাং হৃদয়ে'।

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি সেথায় চরণ পড়ে।
ব্যথা পথের পথিক তুমি
চরণ চলে ব্যথা চুমি
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে।

'মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্মে যিনি বিশ্বকর্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেছি।'

অন্য চিঠিতে আরো লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

'তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত, সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য

কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে। খৃস্ট বলেছেন বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায় সে আমাকেই কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয়—এই কথাটাই ব্রহ্মভাষ্য। এই কথাটাকেই 'দরিদ্রনারায়ণ' নাম দিয়ে হালে আমরা বানিয়েছি—দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণকে উপলব্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের জাল স্বাক্ষর করা—আমাদের উপলব্ধি প্রধানত গো-ব্রাহ্মণের মধ্যে। কিন্তু যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চিরনূতন—যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার সব লেখা যদি ভালো করে পড়তে তাহলে বুঝতে আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী—এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।'

রবীন্দ্রনাথ তাই সম্প্রদায়ের বাইরে, মতবাদের বাইরে। তিনি ব্রাহ্মও নন ব্রাহ্মণও নন। তিনি উপনিষদে আবদ্ধ নন, ভাগবতেও পর্যবসিত নন। তিনি সব কিছু ভরে তুলে আবার সব কিছু ছাপিয়ে। পূর্ণ করে আবার অফুরন্ত। ঋষি হয়েও তিনি আবার কবি। ঋষি তো ধ্যানে স্তব্ধ হয়ে যান কিন্তু কবির তো স্তব্ধ হওয়া নেই। তাঁর যে শুধু গানে-গানে পথ চলা। আর যারই শেষ থাকুক, পথের শেষ নেই। তিনি অনন্ত পথে তাঁর মনের মানুষকে খুঁজে ফিরুন কিন্তু আমরা আমাদের মনের মানুষকে পেয়ে গেছি। তাঁর জেনে কাজ নেই তিনি কে।

'আমার কল্পরূপকে আশ্রয় করে যাঁকে তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করেছ আমি তাঁকেই পূজা করে থাকি', কবি কি সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন হেমন্তবালাকে :

'তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই—তিনি পরমমানব। নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত করে যখন আমি ধ্যান করি তখন নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোট-আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায়—তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহ্বানে রাজপুত্র ছিন্ন কন্থা পরে পথে বেরিয়েছেন। বীরের বীর্য গুণীর গুণ প্রেমিকের প্রেম তাঁরই মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্মনিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে।'

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর—

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই ॥

চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে আসছেন রবীন্দ্রনাথ। বিকেলবেলা, তাঁকে গাড়ি আনতে গিয়েছে। সবাই দীপ্ত আগ্রহে তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। উপরের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়েরা, তাদের মধ্যে একজন সাহানা দেবী, চিত্তরঞ্জনের ভাগ্নী।

গাড়িটা পালকি গাড়ি কিন্তু ঘোড়া ভারি তেজী। সোয়ারি গাড়িতে ওঠবার জন্যে গাড়ির পা-দানে পা রাখতে-না-রাখতেই সে ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে—সোয়ারির প্রায় পরিত্রাহি অবস্থা। ঐ পাটকিলে রঙের তেজী ঘোড়াটাকে দেখা গেল—গাড়িটা ঢুকল গেট দিয়ে। গাড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে।

গাড়ি থেকে নেমে রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের বোন অমলা দাশকে বললেন: তোমাদের এই ঘোড়ার গাড়িটিতে চড়তে পারা একটা ব্যাপার। ভালো করে চড়বার আগেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করে দেয়। সে এক মহাতটস্থ অবস্থায় উঠে পড়ার পালা সারতে হয় দেখলাম।

উপরে উঠে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহানা দেবী লিখছেন:

'তিনি উপরে এলে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ পেলাম—কি সুন্দর চেহারা, কোথায় যেন যিশুখৃস্টের আদল আসে—গৌরবর্ণ লম্বা দোহারা, চোখ নাক মুখ সব যেন দেখবার মত। দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কালো চুল সিঁথি দিয়ে ভাগ করা, কপালের দু'পাশে একটু করে ঘোরানো। দাড়ি গোঁফ সবই কালো। দাড়ি অনেকটা ফ্রেঞ্চকাট। কালো ফিতে বাঁধা স্পিঙের টেপা চশমা নাকে, ফিতেটি গলায় ঝোলানো। একে ওই সুন্দর চেহারা, তার উপর সাদা ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে কালো ফিতের বাঁধা চশমাজোড়াটি, মনে আছে, এমন সুন্দর মানিয়েছিল। সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা—জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন।...'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু' এই গানটি সবে লিখে নিয়ে এসেছেন পড়ে শোনাবার জন্যে। সে কি সুন্দর পড়া।'

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে

তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

এই দেখা-র কথাই বলছেন 'শান্তিনিকেতনে'।

'আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিখটি এখনও ধরেনি। বিকশিত দেখা এখনও হয়নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখিনি।

মনে কোরো না আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছিনে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

কোন সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে, দেখ। আলোক যে দেখাটা দেখায় সে তো ছোটো-খাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না—দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কী অদ্ভুত জিনিস। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি।'

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি এ দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার? এই দেখার পুরা হিসাব কি শুধু টাকায় পাওয়া যাবে, শুধু খ্যাতিতে, ভোগে, শুধু বেঁচে থাকায়? না, প্রভাতের আলোক প্রত্যহই এসে বলছে, তোমার এত সব দেখার মধ্যে তোমার একটি চরম দেখা, পরম দেখা লুকিয়ে আছে। সেটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

সেটা কী দেখা, কাকে দেখা? আনন্দরূপ অমৃতরূপকে দেখা। সেইটিই তো মনের মানুষের শাশ্বত রূপ। এই পরম সুন্দর পরম প্রসন্ন মনের মানুষকে ঘরে-বাইরে আকাশে-বসুন্ধরায় সর্বত্র দেখার সাধনাই তো জীবনের সাধনা।

যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশি
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥

শুধু দেখা নয়, শোনাও।

কত ভাবে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন, কত স্বরে গান গেয়ে যাচ্ছেন, কী নির্মল নিঃশব্দতায় তাঁর চিত্ত উদ্‌ঘাটিত করে ধরছেন! নিঃশব্দতাও তো শোনবারই মত গান।

'যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।'

'কাল কৃষ্ণা একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রম্যবীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম।' তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণে বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সঙ্গীতে গাঁথা পড়ছিল। তারপর যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীণকারের নিশীথ-রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না—তখনও তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্র-মণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহনাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সঙ্গীত-চ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।

ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোট বীণা দিয়েছেন—তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। কিন্তু কই সুর মেলাচ্ছি কই? একদিন যদি বা বাজে, অন্যদিন ঢিল পড়ে, ঝনঝন খনখন করে ওঠে। জীবনের তার-গুলো এঁটে বাঁধো, তেমনি দেখো তার উপর যেন কিছু চাপা না পড়ে, সে মুক্ত থাকে। তারের উপর কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে, মরচে না পড়ে।'

তারপর 'প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো, হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।'

আবার এই সব দেখা আর শোনা সমস্ত আবার তাঁকেই দিতে হবে—যিনি দেখাচ্ছেন, যিনি শোনাচ্ছেন। দেখ, তোমাকে ঠিক দেখেছি। শোনো, তোমারই সুরে জীবনের বীণার তার বাঁধা হয়েছে।

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী,

আমার চোখের চেয়ে দেখা আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা আমার আনাগোনা
সব দিতে হবে।

'শান্তিনিকেতনের' প্রথম কথাটিই হচ্ছে: উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! ওঠো, জাগো। সমস্ত অসাড়তা ও অজ্ঞতা থেকে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা থেকে জেগে ওঠো। উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্যে বেঁচে থাকো।

'সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় —সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে? সমস্ত দীর্ঘ দিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মত জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানা দিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে। ওরে উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত।'

রবীন্দ্রনাথ বারে বারে তাঁর আবেষ্টনীর বেড়া উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, নিজের ঘরে জন্ম নিয়ে আবার জন্ম নিয়েছেন ঈশ্বরের জগতে। সে জগৎ কোনো দল কোনো মত কোনো বিধিবিচার দিয়ে আবদ্ধ নয়। সে থেমে-থাকার জগৎ নয়, এগিয়ে চলার জগৎ। রবীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র 'চরৈবতি'—বাইরে বেরিয়ে এস, এগিয়ে চলো। কোথায় চলেছ? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্থির, কৃতনিশ্চয়। শূন্যতার মধ্যে ছুটো-ছুটি করছেন না, চলেছেন বিশ্বভুবনেশ্বরের দিকে, অন্তহীন যাঁর রূপ অন্তহীন যাঁর ক্রিয়া। কাল থেকে কালে অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে সেই তাঁর চিরন্তন সম্মুখযাত্রা। যদি সত্যি ঈশ্বর না থেকে থাকে তবে মানুষের জীবনধারণ করবার প্রয়োজন কী? আর তবে কার জন্যে বেঁচে থাকা? বাঁচবার অর্থ খুঁজে পাওয়া? আর কে আছে যার প্রতি ভালোবাসা, কিছুতেই শেষ হবার নয়?

রবীন্দ্রনাথ প্রেমে জাগ্রত, প্রত্যয়ে জাগ্রত, অখণ্ড বিশ্ববোধে জাগ্রত।

'ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এত বড়ো প্রকাণ্ড না-থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে! এই না-থাকার ভারে আমরা প্রতি মুহূর্তেই মরছি। এই না-থাকার মানে আর কিছু না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না-থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হল। যিনি

আছেন তিনি নেই, এত বড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে-রাত্রে এই জন্যেই যে গেলুম। সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগতপতি হে—'

যদি নিঃসংশয়ে প্রেম জাগে তা হলে আর দুঃখ কী, ভয় কোথায়, অভাব কিসের ?

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে
এখন তুমি যা খুশি তাই করো
এমনি যদি বিরাজো অন্তরে
বাহির হতে সকলি মোর হরো।
সব পিপাসার যেথায় অবসান
সেথায় যদি পূর্ণ কর প্রাণ
তাহার পরে মরুপথের মাঝে
উঠে রৌদ্র উঠুক খরতর !

হেমন্তবালাকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'তোমাদের জীবনের লক্ষ্যকে একটি বিশেষ রূপে মূর্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছ, একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে বিবিধ উপাচারসহ তাকে প্রদক্ষিণ করছ। ওখানে বাসা বাঁধবার মতো প্রকৃতিই আমার নয়। তুমি মনে করতে পারো যে, তার কারণ আমার মন ব্রাহ্মসংস্কারে চালিত —একেবারেই নয়, নূতন বা পুরাতন কোনো প্রচলিত সংস্কারে আমাকে কোনোদিন বাঁধেনি। মাঝে মাঝে ধরা দিতে গিয়ে ছিন্ন করে বেরিয়ে চলে এসেছি—আমার জায়গা হয়নি। কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছাঁচে-ঢালা উপজগতের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না। আমি কেবল চলতে চলতে পাই এবং পেতে-পেতে চলি, এমনি করেই এতদিন কেটেছে।—আমি যাঁকে পাই বা পেতে চাই, কেবলি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পেতে হয়, আড্ডা গেড়ে বসলেই গ্রন্থিটাকে পাই সোনাটাকে ফেলে দিয়ে।—আমার সম্পদকে সুনির্দিষ্ট সুরক্ষিত করবার জন্যে আমি আমার পিতামহদের লোহার সিন্ধুকটাকে কাজে লাগাতে চাইনে। ওজনদরে সে সিন্ধুক যতই ভারী ও কারিগরিতে যতই দামী হোক না। আমার সম্পদ রয়ে গেল আকাশে আলোতে বাতাসে আর আমার অন্তরাকাশে আর তাঁর পরিচয় রইল পৃথিবীর সকল কবির কাব্যে, কলারসিকের চিত্রে নৃত্যে গানে, মনীষীর মননে, কর্মীর কর্মে, পৃথিবীর সকল বীরের বীর্যে, ত্যাগীর ত্যাগে। এরা যে চলেছে তাঁরই সঙ্গে যুগে যুগে তাঁরই পথে-পথে। কোনো বাঁধা বাক্যে

তারা ধরা দেয় না, বাঁধা মতে আটক পড়ে না, বাঁধা রূপের শিকল পরে না। এটা অত্যুক্তি হবে যদি বলি কোনো বাঁধা মতে আমাকে পেয়ে বসে না—কিন্তু সে সব বাঁধনের গ্রন্থি আলগা—যখন টান পড়ে তখন আপনিই খোলে, গলায় ফাঁস লাগায় না।'

রবীন্দ্রনাথ আংশিক নন, আঞ্চলিক নন, প্রাদেশিক নন—তিনি অপ্রচলিত, অসাধারণ। তিনি সর্বাস্তিবাদী। আর অস্তিত্ব দেশকালপরিব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা।

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা দিনের রবি, আঁধার আলোর সকল ছবি
তোমার আকাশভরা সকল বাণী
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি॥

চিঠিতে আরো বিশদ হচ্ছেন :

'তুমি লিখেছ আমার সম্বন্ধে এক সময়ে তোমার এবং তোমাদের অনেকের একটি বিরুদ্ধতা ছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে আমার দেশের ভিতরেই আছে। আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারেনি। যাদের আমি বন্ধুভাবে গণ্য করেছি, হঠাৎ দেখি আমার সম্বন্ধে তাদের প্রতিকূলতা নিদারুণভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারি আমি যেখানকার লোক সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ। এক জায়গায় এরা আমার কাছাকাছি এসে হুঁচট খেয়ে পড়ে—সেটা আমার স্বভাবের দোষে না তাদের চলনের ত্রুটিতে সে তর্ক করে কোনো লাভ নেই—এবং তর্কে জিতলেও কোনো সান্ত্বনা নেই।'

খণ্ড করে নয়, গণ্ডির মধ্যে বসে নয়, বিধিবিধানের আড়ষ্টতার মধ্যে নয়, প্রেমের মুক্ত অঙ্গনে সমস্তকে নিয়ে সমস্তকে মিলিয়ে—সুরে রূপে কর্মে মর্মে—রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ সাধনা। এ সময়ে মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখলেন তাঁদের বাণীতে তাঁর ভাবের আশ্চর্য সমর্থন। নানক, কবীর, দাদূ—কেউ অচল প্রকোষ্ঠে বন্দী নয়, সবাই সচল নদী, সকল সীমা পার হওয়া অসীম সমুদ্র-প্রণাম। নদী কিছুই রুদ্ধ করে রাখে না, নিজেকে দিয়ে দিয়ে চলে আর সেই দানে-ব্যয়ে নিজেকে সম্ভোগও করে। নদীর মধ্যে দুই গতি—দৈনিক গতি আর শাশ্বতগতি। দুই গতির ভরপুর সামঞ্জস্য এই নদীতে।

রবীন্দ্রনাথেও এই সামঞ্জস্য। তিনি সাময়িক হয়েও সামগ্রিক, বর্তমানের হয়েও শাশ্বতের। গতি যে পথ দিয়েই হোক নদীর লক্ষ্য সমুদ্র।

লিখছেন চিঠিতে: 'আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব--ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশীও বাজে, নটরাজের নৃত্যও হয়—যমুনায় নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পড়ি গিয়ে সেই গঙ্গায় যে গঙ্গা গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে।'

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পিয়াসী তিনি নন বটে কিন্তু সমস্ত বন্ধনসম্ভোগের মধ্যে তিনি এক নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী এ কে অস্বীকার করবে?

যতই তিনি শাশ্বতের অভিমুখী থাকুন, শান্তিনিকেতনের ভাষণ দিন বা গীতাঞ্জলির গান লিখুন তাঁর দৈনিক গতিতে বিস্মৃতি-বিচ্যুতি নেই। তিনি জমিদারির তদারকি করেন, শান্তিনিকেতনে স্কুল চালান, ছাত্র পড়ান, গোরা-উপন্যাসের মাসিক কিস্তি লিখে পাঠান সময়মত। শমীর মৃত্যু-শোকও তাঁর কর্তব্যে শৈথিল্য আনতে পারে না। ঈশ্বরে ওতপ্রোত হয়ে আছেন বলেই তো তাঁর এত শক্তি এত সৌন্দর্য এত কর্মিষ্ঠতা।

আবার লিখছেন: 'বার বার বলেছি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানাভাবে নানা দিকে আমার মন সঞ্চরণ করে—আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশত নিজেকেও নিজে বুঝিনি, অন্যেও আমাকে বোঝে না। আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা—বাণীর দ্বারা করেছি কর্মের দ্বারাও করছি। মনে কোরো না, আরামে করতে পেরেছি, দিতে হয়েছে অনেক, কষ্ট ও অপমান সয়েছি যথেষ্ট, নিজেকে প্রায় নিঃস্ব করেছি—কিন্তু ছুটি পাব না কোনো দিন, কেন না এই আমার স্বভাব।'

॥ ত্রিশ ॥

গীতাঞ্জলির গানের মধ্যে বসেই রবীন্দ্রনাথ গোরা লিখলেন।

আনন্দময়ী বললেন, 'ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেছি যে আমি যদি খৃস্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন।

তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।'

জেল-হাজত থেকে গোরা মাকে চিঠি লিখছে :

'কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটু কষ্ট পাইলে চলিবে না। তোমার দুঃখই আমার দণ্ড, আমাকে আর কোনো দণ্ড ম্যাজিস্ট্রেটের দিবার সাধ্য নাই। একা তোমার ছেলের কথা ভাবিও না মা, আরো অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, এই ইচ্ছা এবার যদি পূর্ণ হয় তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিও না।…

পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া আহার-বিহার করিতেছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার যে কত বড় প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশত অনুভব মাত্র করিতে পারিতেছিলাম না, সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনাদোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগী হইয়া বাহির হইতে চাই ; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভাল মানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।…

যাহারা জেলের বাহিরে আরামে আছে সম্মানে আছে তাহাদের পাপের ক্ষয় কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না। আমি সেই আরাম ও সম্মানকে ধিক্কার দিয়া মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব, মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, তুমি চোখের জল ফেলিও না। ভৃগু-পদাঘাতের চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন ; জগতে ঔদ্ধত্য যেখানে যত অন্যায় আঘাত করিতেছে ভগবানের বুকের সেই চিহ্নকেই গাঢ়তর করিতেছে। সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলঙ্কার হয় তবে আমার ভাবনা কি, তোমারই বা দুঃখ কিসের ?'

এ যেন গানের ভাষায় বলা :

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী
আমি সকল দাগে হব দাগি ॥…

আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥

স্টিমারের ক্যাবিনে ললিতা ঘুমুচ্ছে আর বাইরে ডেক-এ জুতো খুলে রেখে বিনয় নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে—ললিতার নিদ্রাটুকুকে রক্ষা করবার জন্যে, সেখানেও তার সৌন্দর্যকল্পনা মিশছে গিয়ে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরের সঙ্গে।

'এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মত রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। পিতামাতা ভাই ভগিনী কেহই নাই, একটি অপরিচিত শয্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে—নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্যটুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া অতি শান্তভাবে গতায়াত করিতেছে, সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারীহৃদয়ের কল্যাণ কোমলতায় মণ্ডিত হাত দুইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানার উপর পড়িয়া আছে; কুসুমসুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমণীয় গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মত স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে—বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল; শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দ তিমিরবেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটিমাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। আমি জাগিয়া আছি—আমি জাগিয়া আছি এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মত উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।'

আপনারে নিবেদন
সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে,
তখনি সুন্দর মূর্তি লভে।

সুন্দর বুঝি চকিতে দেখা দিয়েই পালিয়ে যায়, ধরা দেবার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সুন্দরকে দেখবার স্পৃহাতেই চোখের দৃষ্টিকে অবিরাম সুন্দর করে রাখে।

চকিত আলোকে কখন সহসা দেখা দেয় সুন্দর
দেয় না তবুও ধরা,

মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।

আবার বলছেন :

তারে নাহি যায় ধরা
তাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা।

'বেহারা আসিয়া খবর দিল মা গোরাকে ডাকিতেছেন। গোরা যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল মা ডাকিতেছেন।'

জননী, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে,
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।

'আর যাই হউক আমার মা আছেন। এবং তিনিই আমাকে ডাকিতেছেন। তিনিই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন—কাহারো সঙ্গে তিনি কোনো বিচ্ছেদ রাখিবেন না—আমি দেখিব যাহারা আমার আপন, তাহারা তাঁহার ঘরে বসিয়া আছে। জেলের মধ্যেও মা আমাকে ডাকিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার দেখা পাইয়াছি—জেলের বাহিরেও মা আমাকে ডাকিতেছেন সেখানে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাত্রা করিলাম।'

তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে
তোমারে নমি হে সকল জীবন কাছে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তি পাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে॥

'সে মনে মনে বার বার করিয়া বলিল—মা আমাকে ডাকিতেছেন—চলিলাম যেখানে অন্নপূর্ণা যেখানে জগদ্ধাত্রী বসিয়া আছেন সেই সুদূর কালেই অথচ এই নিমিষেই, সেই মৃত্যুর মরুপ্রান্তেই অথচ এই জীবনের মধ্যেই—সেই যে মহামহিমান্বিত ভবিষ্যৎ আজ আমার এই দীনহীন বর্তমানকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে—আমি চলিলাম সেইখানেই—সেই অতিদূরে সেই অতি নিকটে মা আমাকে ডাকিতেছেন।'

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাটি শুনি :

'হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দম। সেখানে কোনো কালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না, তুমি মিলেছ; সেখানে তোমার কেবল সত্য নয়, সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছ। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাওনি; সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই, কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও, প্রভু। আমি যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বানে আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোক, অতি দূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন 'যাই যাই' বলে সাড়া দিই। ডাক দাও, 'ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়।' এই অন্তরাত্মার অনন্তধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে, খুব গোপনে।'

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।

তাই দিনে-রাতে যত আনন্দ পাই সব তোমার স্পর্শ, তোমার উপস্থিতি। আমার আবার প্রসন্ন হবার কী কারণ? শুধু তুমি আমাকে ছুঁয়ে আছ বলে। কেন এত সৌরভ এত সুস্বাদ এত সঙ্গীত? শুধু তুমি কাছাকাছি ' পনটি হয়ে আছ বলে। চারদিকে তাকিয়ে যে সুন্দরকে দেখি তার কী হেতু? সে শুধু তুমি আমার দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টিটি রেখেছ বলে। শুধু যন্ত্রে কি আনন্দ আছে? শুধু আকস্মিকতায় আছে কোনো সুষমা? শুধু উদ্দেশ্যহীনতায় আছে কোনো শ্রী?

গোরা যখন জানতে পারল সে হিন্দু নয়, সে মিউটিনির সময়কার কুড়োনো ছেলে—তার বাবা আইরিশম্যান, তখন তার চেতনার দিগন্ত হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হল। সে পরেশবাবুকে বললে, 'আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টানে কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের

অন্নই আমার অন্ন।··· আমি ঠিক যে কল্পনার সামগ্রীটি প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি—তিনি তাঁর নিজের সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে এনে দিয়ে আমাকে চমকিয়ে দিয়েছেন! তিনি যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেচি যে চণ্ডালের ঘরেও আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।···

আমাকে আপনি শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নয়, ভারতবর্ষের দেবতা!'

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

'গোরা আনন্দময়ীর দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

গোরা কহিল, মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

আবার রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা উচ্চারিত হল :

'হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া

রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো, তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহু দ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত, ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না। আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না, আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়।'

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

'এক তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষয়পুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরানী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল তখন আমাদের সরল হৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কী তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকট প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও।'

প্রেরণ করো ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

দিন আগত ওই, ভারত তবু কই।
গতগৌরব হৃত-আসন নত মস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন করো নরসমাজমাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

'আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই—কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে।···হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুর কণ্ঠে বলিতে পারে, যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম। যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা না লইয়া আমি কী করিব!'

একটা কাণ্ড ঘটে বসল। খুলনার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে সমন এসে হাজির। আসামীর সমন নয়, সাক্ষীর সমন। আসামী কে? আসামী সেনহাটির ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক হীরালাল সেন। তাঁর অপরাধ কী? তিনি 'হুঙ্কার' নামে একটি রাজদ্রোহমূলক কবিতার বই লিখে প্রকাশিত করেছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ কী করে আসেন? আসেন যেহেতু কবিতার বইটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন সত্যিকথা। বললেন, তাঁকে না জানিয়েই এই গৌরব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

যদি জানতেন তবে কবিতার বিষয়বস্তুতে না হোক গ্রন্থের নামকরণে নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন।

বিচারে হীরালাল সেন-এর ছ মাস জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন

তাঁর স্কুল উঠে গেছে। কোথায় যান? রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে ডেকে নিলেন, শিক্ষকতায় বহাল করলেন। জেল-ফেরত রাজদ্রোহীকে শিক্ষক করা হয়েছে, পুলিশ আপত্তি তুলল। রবীন্দ্রনাথ তা গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু দেখা গেল পুলিশের ভয়ে সরকারি চাকুরেদের ছেলে শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তখন অনুপায় দেখে হীরালাল সেনকে বিদায় দিলেন কিন্তু নিরাশ্রয় করলেন না, তাঁরই নিজের জমিদারিতে চাকরি দিলেন।

কাদম্বিনী দেবী বিয়ের অল্প পরেই বিধবা হন। স্বনামধন্য মহিমচন্দ্র সরকারের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল কুষ্টিয়া জেলার রূপিয়াট গ্রামের প্রাণগোপাল দত্তের সঙ্গে। অকালে স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর মধ্যে প্রবল ঈশ্বরজিজ্ঞাসার উদয় হয়। ঈশ্বর কি আছেন? যদি থাকেন আমাকে তা হলে পরিত্যাগ করলেন কেন? কবিশ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে এ প্রশ্নের নিরসন করবে? কাদম্বিনী রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন। সম্পূর্ণ উত্তর এল:

'ভগবান অন্তরে-বাহিরে সর্বত্রই আছেন—তাঁহারই আলোক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাঁহারই বায়ু প্রতিমুহূর্তে নিশ্বাসরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছ, তাঁহারই সঙ্গে তোমার একান্ত যোগ তো এক মুহূর্তকালও বিচ্ছিন্ন নাই—যিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন সেই অন্তর্যামীকে যে কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। তিনি কাহার কাছে কখন কেমন করিয়া যে দেখা দেন তাহা তিনিই জানেন—কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে জানিয়ো তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেন না। উপনিষদে ঋষি একটি কথা বলিয়াছেন—স এব বন্ধুর্জনিতা বিধাতা—ইহার তাৎপর্য এই যে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদের বন্ধু—কারণ বন্ধুই যদি না হইবেন তবে সৃষ্টি করিলেন কেন? তিনি এই নিমেষেই আমাদিগকে লুপ্ত করিতে পারেন। সেই যে আমাদের জনিতা অর্থাৎ পিতা এবং বন্ধু—স বিধাতা—তিনিই আমাদের বিধাতা—অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাঁহারই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চয় যে আমার বন্ধুর বিধান ছাড়া জগতে আর কোনো বিধান নাই তখন জীবনের প্রতিমুহূর্তেই আমি ধন্য—সুখ দুঃখ আমার সকলি শিরোধার্য—সকল কর্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই। আমিই কি কেবল তাঁহাকে চাই, তিনি আমাকে চান না? যদি না চাহিবেন তবে আমার মত ক্ষুদ্রটুকুর জন্ত

জগৎ জুড়িয়া এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন কেন? শুধু কেবল আমিই যদি তাঁহাকে চাহিতাম তবে কোনকালে তাঁহাকে পাইতাম না—কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর ভাবনা কিসের? তাঁহার কাল অনন্ত, তাঁহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। অতএব প্রত্যহই তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক—ইহা নিশ্চয় মনে রাখ তিনি তোমাকে এক মুহূর্ত ছাড়েন নাই।'

শান্ত হ রে মম চিত নিরাকুল
শান্ত হ রে ওরে দীন
হের চিদাম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে
সর্বচরাচর লীন।···
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন
নাহি দুঃখ সুখ তাপ
নির্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়
নাহি জরাজর পাপ।
চির আনন্দ বিরাম চিরন্তন
প্রেম নিরন্তর জ্যোতি নিরঞ্জন
শান্তি নিরাময় কান্তি সুনন্দন
সান্ত্বন অন্তবিহীন॥

পদ্মা আবার ডাক পাঠাল—কলস্বনিত নির্জনতার ডাক, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চললেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এসে জুটলেন। কবিতে-বৈজ্ঞানিকে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। একজন রূপের মধ্যে খুঁজছেন অরূপকে, আরেকজন ব্যক্তের মধ্যে খুঁজছেন অব্যক্তকে। মূলে দুজনের একই জিজ্ঞাসা। বৈজ্ঞানিক জানতে চাইছেন, কী, আর কবি জানতে চাইছেন, কে?

জগদীশচন্দ্রকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খেয়া' উৎসর্গ করেন। বলেন, আমার কবিতা লজ্জাবতী লতার মত। তুমি যেমন তড়িৎস্পর্শে কুঞ্চিত-কুণ্ঠিত লতার উজ্জীবন ঘটাও, তেমনি তোমার আধ্যাত্মিক অনুভবে আমার এ কবিতারও মর্মোদ্ঘাটন করো। দেখ কী পেয়েছে আকাশ হতে, কী এসেছে বায়ুর স্রোতে, লতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে কী সে প্রাণের কথা!

ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে

তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন ধেয়ানে রতা।
আমার লজ্জাবতী লতা!

সেই জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানে বিশ্বজয়ী হয়ে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখছেন :

'য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে। তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে—বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে কুটিরের মধ্যে মৃগচর্মে যে বসিবে সে তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্বাক, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত—তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশীলের স্পর্ধা স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব

না—তাহার কাছ হইতে যে বর্বর রঙচঙ বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।'

মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে
তুমি ছিলে কোন দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে—যেথা পূর্বে ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।...
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠার শ্রদ্ধায় ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

॥ একত্রিশ ॥

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর বয়সে, ১৩১৭-র ২৫শে বৈশাখ জন্মোৎসব হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা, সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায়নি।...

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-এক দিক দিয়ে মানুষের একজন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি।'

স্বার্থলোক আর মঙ্গললোক। মঙ্গললোকে পদার্পণে মানুষের নবজন্ম। সেখানেই তার বৃহৎ থেকে বৃহত্তরের সম্ভাবনা। নবীন থেকে নবীনতরের।

তার স্বীকৃতিতেই উৎসব। উৎসবের আরেক নাম নবীনতার উপলব্ধি। নবীনতার স্তবগান।

'এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বলতে পারিনে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বার বার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।'

তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর ॥

ধূলিতে জন্ম নিয়ে ধূলির ধনও তাই একদিন স্বর্গীয় হয়ে ওঠে।

জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
চরণ পরশ দিয়ো দিয়ো
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়—
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ॥

জীর্ণতার শেষ আছে, নবীনতার শেষ নেই। বেঁচে থাকা অর্থই হচ্ছে প্রতি মুহূর্তের স্পর্শমণির ছোঁয়ায় প্রতিমুহূর্তে নবীন হয়ে থাকা। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা—সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা। কোনো ক্ষতি তাকে ম্লান করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিনকার প্রভাত সদ্যোজাত শিশুটির মতই নবীন, শিশুটির মতই প্রিয়দর্শন।

বিশ্বলোক নিত্য যাঁর শাশ্বত শাসনে
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
আবর্জনা দূরে যায় জরাজীর্ণতার
তাঁরে নমস্কার।

যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তর-দিন
নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন,
ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার
তাঁরে নমস্কার ॥

নিজের মহত্তর সত্তার উপলব্ধিতেই নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশ-গৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের সংকীর্ণ ব্যবধান নেই। বলছেন রবীন্দ্রনাথ, এখানে তিনিই পিতা হয়ে প্রভু হয়ে আছেন য একঃ, যিনি এক—অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই—বর্ণান অনেকান নিহিতার্থো দধাতি। যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি—স দেবঃ, সেই দেবতা। মনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

কিন্তু তিনি তো শুধু শাসক নন, তিনি প্রেমিক, তিনি প্রেমভিখারি। তাঁর ভুবনভরা এত যে আয়োজন সে শুধু আমারই প্রেমকে আকর্ষণ করবেন বলে। আমার হৃদয়ে যে প্রেম এও তো তাঁরই রচনা, তাঁরই করুণা। আমাকে তিনি প্রেম দেবেন না অথচ সারারাত আকাশে তারার মালা গাঁথবেন, মাটিতে ফুলের শয়ন পাতবেন এ হতেই পারে না। চোখ চেয়ে বাইরে একবার তাকালেই তো বোঝা যায় কত দিকে কত ভাবে তাঁর প্রেম আমার প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই যে গাছের পাতার উপর সোনার-বরন আলোটুকু নাচছে এই তো তাঁর প্রেমের হাসি। এই যে দক্ষিণসমীর দেহে অমৃতক্ষরণ করছে এ তো তাঁরই প্রেমস্পর্শ। আর এই যে 'প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে, এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।' এত যে প্রেম, এত যে শোভাসৌন্দর্যের ঢেউ, তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে বলে, মিলন হয়েছে বলে। তারই জন্যে আমার হৃদয়ে রসের উদ্ভব, প্রেমের আবির্ভাব। 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

'দেখ, আজ দেখ, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন। কার চেয়ে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চার দিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে-কেটে যাচ্ছে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আবৃত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্তমহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকে-দিগন্তে দীপ জ্বলছে, সুরলোকের সপ্ত ঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ। আজ

তুমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো। তোমারই আত্মার এই মহোৎসবসভায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো এক ধারে পড়ে থেকো না। যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই, সেখানে ভিক্ষুকের মতো উঞ্ছবৃত্তি কোরো না।'

তাই জন্মদিনে, প্রতি জন্মদিনেই রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা :

'হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চার দিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ—শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক। মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখ—কত বড় একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময়!···চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন। চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা। সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে, সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো, সত্য হোক তোমার জীবন, তোমার জগৎ জ্যোতির্ময় হোক, অমৃতময় হোক।'

'প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি। এসেছি তোমার হে নাথ, পরাতে রাখী।' তিরিশে আশ্বিনের রাখী-বন্ধনের দিনটি স্মরণ করে গান লিখলেন রবীন্দ্রনাথ।

রাখীবন্ধনের দিন ভারতবর্ষের বড়দিন। বড়দিন অর্থ প্রেমের দিন, মিলনের দিন—যেদিন হৃদয় বড় হবার, সকলের বন্ধু হবার ডাক শোনে। 'ঈশ্বর শান্তির বীজকে বিরোধের ভিতরেই নিহিত করেন, কিন্তু বিরোধকে ভেদ করে তাকে অতিক্রম করেই সে বড় হয়ে ওঠে—বিরোধের মাটির ভিতরেই যদি সে থেকে যায় তবে সে পচে মরে। আমাদের রাখীবন্ধনের বীজ বিরোধের ভিতর থেকে তাকে ভেদ করেই ছায়াময় বনস্পতি হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ-রাখী তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যের বন্ধনে

বাঁধবার চেষ্টা করব—এইটেই আমাদের একটা দায়—বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।'

'ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।' আরো লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'আমরা তাদের কাউকেই শত্রু বলে দূরে ফেলতে পারব না। আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে, আঘাত পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব, সকলকে নিয়ে এক হব—এবং একের মধ্যে সকলকে উপলব্ধি করব। বঙ্গবিভাগের বিরোধক্ষেত্রে এই যে রাখীবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত হোক। তাহলেই এ দিনটি ভারতের বড়দিন হবে। তাহলেই এই বড়দিনে বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদের মিলন হবে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।'

আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে।
তোমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।

কিংবা

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥
সকলি ত্রেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে ॥

শান্তিনিকেতনের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্মগুরুকেই অভ্যর্থনা করে নিলেন—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্য। নিমন্ত্রণ করে আনলেন মধ্যযুগীয় সাধকদের —কবীর, নানক, দাদূ, রবিদাস, তুলসীদাস, তুকারাম—যেখানে সকল পথ এসে মেশে সেই ভক্তি ও ভূমার রাজ্যে এসে দাঁড়ালেন, সেই সহজের রাজ্যে, সহজের উপাসনায়।

ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সবচেয়ে সহজ তাকে তিনি দুরূহ করে রাখেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখি, পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি না ধরা পড়ে। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মত সহজ আর কী আছে? তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়েও সহজ, তবুও তাঁকে যে আমরা

হারাই তা শুধু তাঁকে খুজে বের করব বলে।

তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥
তুমি আমার নও আড়ালের
তুমি আমার চিরকালের
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥

কিংবা

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা ॥

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়, কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে-বনে পথে-পথে ফিরতে হয়েছে।···

সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই সরল যে শোনামাত্রই সকলকে বলতে হয়, 'হ্যাঁ', কিন্তু তবুও এই কথাটিকে সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যীশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেননি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যু-

সংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাঁকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়, তাঁদেরই ডাক পড়ে।'

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল ওগো
ধরায় আস ॥
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ॥
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস ॥

রাখী শুধু আমিই পরাব না, ভগবানও তাঁর হাতের রাখীটি আমার দক্ষিণ হাতে পরিয়ে দেবেন আর সেই বন্ধনে আমার সমস্ত বন্ধন লুপ্ত হয়ে যাবে। কর্ম কখন বন্ধন? কখন মুক্তি? যখন অভাবের থেকে কর্ম করি তখন সেটা বন্ধন, আর যখন আনন্দের থেকে করি তখন সেটা মুক্তি। কর্ম আনন্দময় কখন? যখন ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম করি—কেননা ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ, আর কর্মের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মের স্পর্শ লাভ, প্রেমলাভ।

'এই জন্যেই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে,' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তিনি যে যে কাজ করবেন তা যেন নিজেকে নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন—তিনি 'যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ', যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তা হলে সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ, কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না, আনন্দ-

সাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ' কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত, জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনো কালেও এবং কাহা হতেও ভয় প্রাপ্ত হব না।'

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দক্ষিণ হাতে।
সূর্য যেমন ধরার করে আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে॥···
কর্ম করি যে হাত লয়ে কর্ম বাঁধন তারে বাঁধে
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি
সকল বাঁধন যাবে কাটি
কর্ম তখন বীণার মত বাজবে মধুর মূর্ছনাতে॥

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে তাঁকে কলকাতা টাউন হলে সংবর্ধনা করা হল। উদ্যোক্তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যার সভাপতি বিচারপতি সারদা চরণ মিত্র ও সম্পাদক রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

স্বদেশের পক্ষ থেকে জনসভায় এই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। অভিনন্দনপত্র পড়লেন রামেন্দ্রসুন্দর :

'বাগদেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি [illegible]রণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা ভগিনী দেব-প্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণ রূপিণী গায়ত্রী কর্তৃক গন্ধর্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যো-পরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযুষে বর্ধন করিয়াছেন। সেই

ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন। কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।'

সংবর্ধনার চেয়ে নিন্দাই তখন বেশি ছিল। সমালোচনার আবরণে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও ব্যঙ্গের ছদ্মনামে অনাবৃত কটূক্তি। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ থেকে শুরু করে যতীন্দ্রমোহন সিংহ অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধতা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কখনো তিনি তাঁর সৌন্দর্যসত্তাকে লঙ্ঘন করেন নি। প্রতীপদর্শীদের মধ্যে সবচেয়ে মুখর ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও সবচেয়ে তিক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাদের অভিযোগ রবীন্দ্রকাব্য দুর্নীতিদুষ্ট। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ করে শুধু লিখনভঙ্গিকে বিদ্রূপ করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাসও অনুকূল ছিলেন না। যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও পরবর্তী আরো কেউ-কেউ রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যেই কলম ধরলেন। বাদানুবাদের আর অন্ত রইল না। কিন্তু ক্ষান্তি না এলে শান্তি কোথায়?

একটা চিঠিতে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কতদিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক গে, অন্তত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে—সব পাপ শান্ত হোক।'

বন্ধু প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে নিন্দুক সম্পাদকের উদ্দেশে পত্র লিখতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'এই সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনায় যে একটি অসম্ভ্রম আছে তাহা সহ্য করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। ও দূর করিয়া ফেলিয়া দাও—যেমন করিয়া মাছি তাড়াইয়া দিতে হয় তেমনি করিয়া বাম হস্তের একটা আঘাতে মন থেকে ওটাকে অপসৃত করিয়া দিলেই ঠিক হয়—তবু যদিচ ক্ষুদ্র উৎপাত মাঝে মাঝে ফিরিয়া-ফিরিয়া আসিতে পারে—মাছির অপেক্ষা বৃহৎ আকারে এবং গুঞ্জনের অপেক্ষা প্রবলতর শব্দে না আসিলেই হইল। 'সকলেরি আছে অবসান—শুকায় সমুদ্রজল, নিবে যায় দাবানল—' আর নিন্দুকের মিথ্যাবাক্যের দাহই কি চিরকাল থাকিবে?...

অনেক দিন অবিরাম বৃষ্টিবাদলে পর আজ নির্মল রৌদ্রে আমার চারিদিকের নবীন ধান্যক্ষেত্রগুলি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আজ হীনের হীনতা অযোগ্যের

অবমাননা সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিব—নতুবা মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশ হইতে এই অজস্র অযাচিত দানের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিব না। আজ আমি আমার মনের প্রান্তে কোন কাঁটা যদি রাখি তবে আজিকার এখন স্নাতশুভ্র অখণ্ড সুন্দর দিনকে হৃদয়ের মধ্যে অসঙ্কোচে প্রশস্ত আসন পাতিয়া দিতে পারিব না।'

নিন্দার প্রত্যুত্তর কী? নিন্দার প্রত্যুত্তর নিষ্ঠা। শুধু লেগে থাকা, ধরে থাকা, করে যাওয়া। শুধু এগিয়ে যাওয়া। শুধুই পথ চলা।

মরুভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন, একেবারে অ-শৌখিন। খাদ্য পাচ্ছে না তবু চলছে, জলের নাম-গন্ধ নেই, তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে, তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যখন মনে হয় সামনে বুঝি এ মরুভূমির শেষ নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই, তখনো তার চলা বন্ধ হচ্ছে না।

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে, কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে, কাঁটা গুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মত ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মত এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে? কে আছে এমন ভারবাহ?

মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়, হৃদয়কে ডাকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে, চলছেও—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

এই নিষ্ঠার মূলে আছে বিশ্বাস। রুক্ষ-কষ্ট মাটির গভীরে আছে তৃষ্ণায় পানীয়। সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে আছে কোথাও খর্জুরকুঞ্জের শ্যামচ্ছায়া। সমুদ্র যতই উত্তাল হোক, ঝড় যতই দুর্বার হোক, 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

নিন্দা-স্তুতি ফলাফল কে চিন্তা করে? শুধু লিখে যাই, দাঁড় টেনে যাই, পাড়ি জমবেই জমবে, নিশ্চয়ই পেয়ে যাব সেই বাঞ্ছিত বন্দর।

তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী।

ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
তারেই জানি, তারেই জানি সাথের সাথি॥
তবে ক্ষত কোথায়? ক্ষতি কোথায়?
ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নিচে।
কী হলনা কী পেলেনা, কে তব শোধেনি দেনা।
সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে॥
এই যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি
অরুণ গগনতলে প্রভাতের রবি
এই তো পরম দান সকল করিল প্রাণ
সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে॥

॥ বত্রিশ ॥

গীতাঞ্জলির গান একটানা বসে লেখেন নি রবীন্দ্রনাথ—তিন-চার বছর ধরে লিখেছেন, এখানে-ওখানে, কোলকাতায়, শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহে তিন-ধরিয়ায়। এই সময়টায় ভগবান যেন বেশি উচ্চারিত, বেশি সন্নিহিত, বেশি প্রত্যক্ষীভূত। নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে একাকী বিরাজ করছেন সেখানে ভক্ত তার প্রাণের আলোতে জীবনের সমস্ত দীপ জেলে পরিপূর্ণ থালা সাজিয়ে আরতি করছে।

তারই মধ্যে চিঠি লিখছেন রথীকে, প্রতিমাকে।

'বৌমা, তোমাকে আমার একটি উপদেশ আছে। প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ো।

অনেক দিন পর আমি পদ্মায় এসেছি। আজ সকালে সুন্দর রৌদ্র উঠেছিল। নদী একেবারে কূলে-কূলে পরিপূর্ণ। আজ সকালবেলা যখন বোটের ছাদের উপর বসে উপাসনা করছিলুম আমার মনের ভিতরটি আলোকে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই জলস্থল আকাশের মাঝখানে বসে তাঁকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করতে আমার খুব ভাল লাগচে। ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এইরকম এখানে শান্তিও নির্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে

দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে কিছুই হবে না—তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন।'

তারই কাছাকাছি গান :

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হয়ে
এসো তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্যসুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা
জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।

'কত আকার লয়ে!' পিতার আকার, জননীর আকার, প্রেয়সীর আকার, সন্তানের আকার। তিনি নিজের থেকে দয়া করে ছোট না হলে তাঁকে চিনি কী করে, ধরি কী করে? তিনি বিশ্বনাথ, তিনিই তো পারবেন ছোট হতে, কাঙাল হতে। আমার ঘরের বাসিন্দে হতে।

রথীকে লিখছেন :

'তোদের সংসার সকল দিক দিয়ে উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। সংসারের মধ্যে সর্বদা পুণ্য ও মঙ্গলের পবিত্র জ্যোতি বিরাজ করতে থাকুক একান্ত মনে আমি এই কামনা করে তোদের হাতেই তোদের সংসারের অধিকার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলুম—এখন থেকে সংসারে আমার কর্ম রইল না। বৌমাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ দিস—অন্তরে বাহিরে তাঁর শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—ঈশ্বরের প্রসন্নতা তাঁর সমস্ত জীবনকে পরিপূর্ণ করুক—সেবানিপুণ অশ্রান্ত কল্যাণহস্তের স্পর্শে বৌমা তাঁর সংসার হতে সমস্ত জড়তা শৈথিল্য ও কুশ্রীতা দূর করে দিন—মঙ্গলময়ের মহতী ইচ্ছাকেই তাঁর সংসারের সর্বত্র প্রকাশমান করে তুলুন।'

এই সময়কার কাছাকাছি গান—'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি—ঐ যে আসে আসে আসে।' নিশীথে ঘনান্ধকারে তিনিই শুধু অভিসারে ডাকেন না, তিনিই আবার ভক্তের সঙ্গে মিলতে পথিকহীন পথে একলা বেরিয়ে পড়েন। কান পেতে থাকলেই শোনা যায় তাঁর পদধ্বনি। দুঃখ দিয়ে যেমন মান রাখেন তেমনি আবার দুঃখেই সুখের স্পর্শমণি বুলিয়ে দেন।

প্রতিমাকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

'যিনি অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, যিনি চিরজীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে

সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে যে ইচ্ছা করে বহু দূরে বহু দীর্ঘকালের জন্যে কোথাও চলে যাই। যতই নানা দিকে নানা কথায় নানা কাজে মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই গভীর বেদনার সঙ্গে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই, তৃপ্তি নেই—তাঁকে ছাড়া আমার একেবারেই চলবে না।'

চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে-রাতে
মিথ্যা সে সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।
রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে
তেমনি তোমায় আঘাত করি—
তবু তোমায় চাই।

আরো লিখছেন: 'কবে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন জানিনে—কিন্তু জোড় হাত করে কোনো প্রশান্ত পবিত্র নির্জন স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে—কেবল বলি, মা মা হিংসীঃ—আমাকে আর আঘাত কোরো না—আর মেরো না, আর মেরো না—ভাল মন্দর দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে আমাকে কেবলি চার দিক থেকে এমন ধাক্কা খেতে দিয়ো না।'

কিন্তু কী বলছেন গানে?

আরো আরো প্রভু, আরো আরো
এমনি করে আমায় মারো।

লুকিয়ে থাকি, আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥

কত কাঁদাতে পারো একবার দেখি। দেখি তোমার এই মায়ের খেলায় আমি হারি না তুমি হারো। মারতে-মারতেই তো সন্নিহিত হবে, দেখবে যে পথেই ঘুরি না কেন, ঘুরতে-ঘুরতে তোমারই পায়ের কাছে চলে এসেছি, বাঁধা পড়েছি তোমারই বাহু-বন্ধনে। 'তুমি যে আছ বক্ষে ধরে, বেদনা তাহা জানাক মোরে, চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে।'

ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে তোমার চরণ ধূলিতে
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই যেন তব চরণে
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকল শ্রান্তিহরণে।

আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই। 'তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি। দুখ হবে মোর মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।' 'দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।'

তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নতুন সৃষ্টি প্রলয় অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠিয়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রু মাঝে রাত্রি-অন্ধকারে॥

ভক্তিই বিপুলবীর্য শান্তি। ভক্তিই সর্বাঙ্গীণ কুশল।

চিঠিতে আরো লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'জীবন যখন দ্বিধাবর্জিত বাসনামুক্ত পবিত্র হয়ে উঠবে—তখন লোকালয়েই থাকি আর নির্জনেই থাকি সর্বত্রই সেই পবিত্রতার সাগরের মধ্যে সেই প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারব। দুঃস্বপ্নজালজড়িত এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে সেই জ্যোতির্ময় প্রভাতের জন্যে মন অহরহ অপেক্ষা করচে—সকল সুখ দুঃখ, সকল গোলমাল, সকল আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও তার সেই একটি মাত্র সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিরদিনই জীবনকে এত মায়ায় এত মিথ্যায় জড়াতে দিয়েছি যে, তার জাল কাটাতে আজ প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।'

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জালজঞ্জালগুলিতে।

'তা হোক, তবু কাটাতেই হবে—সংসারের, বিষয়ের, বাসনার সমস্ত গ্রন্থি একটি একটি করে খুলে তবে যেন আমার এই জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়—স্নান করে ধৌত হয়ে নির্মল বসন পরে শুচি ও সুন্দর হয়ে যেন এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর কাছে যেতে পারি—ঈশ্বর সেই দয়া করুন—আর সমস্ত চাওয়া যেন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়।'

একমাত্র দয়া ছাড়া সাহস করে কী আর চাইতে পারি তোমার কাছে? যা পাই, যা পেয়েছি, সব তোমার দয়ায়। 'তব দয়া মঙ্গল-আলো, জীবন-আঁধারে জ্বালো, প্রেমভক্তি মম, সকল শক্তি মম, তোমারি দয়ারূপে পাই। আমার বলে কিছু নাই।' এই তো প্রার্থনা—অন্ধকে আলোকিত করো, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করো। তোমার দয়ার তো কোনো পর্যাপ্তিসীমা নেই, সে তো অসাধ্যসাধক।

সে তো মূককে বাচাল করে, নিশ্চক্ষুকে চক্ষু দেয়।

অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।

কিন্তু আমি এমনি উদ্ভ্রান্ত, যদি তোমার দয়া চাইতেও ভুলে যাই! যদিও আমি জানি তোমার দয়া দিয়ে আমার জীবন না ধুয়ে নিলে তোমার চরণ ছোঁবার অধিকার পাব না, তবুও তোমার দয়াকে আবাহন করে আনলাম না। তখন কী হবে? তোমার দয়া না চাইলেও তুমি দয়া করবে। তোমার কৃপাশক্তি এত প্রবল যে আমার অনুসন্ধানের অপেক্ষা করবে না।

তোমার দয়া যদি
চাহিতে নাও জানি
তবুও দয়া করে
চরণে নিয়ো টানি।

আমার ডাকতেও হবে না, তুমিই আমাকে ডেকে নেবে। যত দূরেই

চলে যাই না কেন তুমিই আমাকে ফিরিয়ে আনবে।

যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।

রহস্যটি কী? আমি যে তোমার প্রতি উন্মুখ হয়েছি। আমি যে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি—এখন তুমি জানো তুমি কী করবে। দয়া করবে কি না, দেখা দেবে কি না।

মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে।
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরই মাঝখানে।

ওতপ্রোত হয়ে থাকা, অনুস্যূত হয়ে থাকা। বাইরে কিছু দেখানো নয় জানানো নয়, শুধু অনুভবে সংসক্ত করে রাখা। নিশ্বাসের মতই সহজ, নিশ্বাসের মতই নিত্যসহচর। 'বন্ধু এক আছে শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস।' গোপনের মধ্যে থেকেও যে গভীরগোপন।

যে জন দেয়না দেখা, যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়।

চিঠিতে শেষ কথাটি লিখছেন: 'তোমাদের মধ্যেও আমা‹ সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্যটি আছে—যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠবে—তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্মল হস্তে পুণ্য প্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ—আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুলবে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠচে। ঈশ্বর তোমার ঘরকে তাঁরই ঘর করুন এই আশীর্বাদ করি।'

'এসো আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।'

দিন-রজনী তিনি আমাদের ঘরে আছেন, ঘরেই তাঁর কোল পাতা। 'সুখে আমায় রাখবে কেন রাখো তোমার কোলে।' 'নিত্য যাহার থাকি কোলে, তারেই যেন যাই গো বলে, এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে।' সকালবেলায় ঘুম ভেঙে তাকালেই দেখতে পাই তাঁর হাসি আলোক ঢেলে দিয়েছে, নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনিটি বেজে উঠেছে চারদিকে, তাঁর মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ। কাজের প্রয়োজনে যখন বাইরে যাচ্ছি তখনো তিনি ঘর ত্যাগ করছেন না। আবার কখন ফিরি তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলছেন, আবার তিনি ঘরেও রয়েছেন। আমার চলার সঙ্গে তাঁর চলা কিন্তু আমার না-থাকায়ও তাঁর থাকা। আমার অনস্তিত্বও তাঁরই উপস্থিতি। তাই দিনের শেষে নানা কাজের পরে যখন ঘরে ফিরি তখনো দেখি তিনি একলাটি বসে আছেন আমার জন্যে:

তিনি জেগে বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যা পরে।
জগতে কেউ দেখতে না পায়
লুকানো তাঁর বাতি
আঁচল দিয়ে আড়াল করে
জ্বালান সারারাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই
আনাগোনা করে
অন্ধকারে হাসেন তিনি
আমাদের এই ঘরে।

অনবচ্ছিন্ন ঈশ্বরভক্তির ফল গীতাঞ্জলি—ফল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক মহান গীতাঞ্জলি। কোনো নির্জন সমাধি অবস্থায় বসে তিনি গীতাঞ্জলি লেখেননি, সংসারের যাবতীয় কর্ম-কর্তব্যে অধিষ্ঠিত থেকে, প্রাসঙ্গিক সমস্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, প্রাত্যহিকতার মাটিতে এই পূজার ফুলগুলি তিনি ফুটিয়েছেন। এ পূজাঞ্জলি। কর্মকে কখনো ত্যাগ করেননি, প্রতিদিনের কর্মকে চিরদিনের সুরে-লাবণ্যে মণ্ডিত করেছেন। কাব্যেও এনেছেন এই চিরন্তনতার মহিমা। ঈশ্বরভক্তিই এই ঐশ্বর্য ও কান্তির উৎস।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 'পৈত্রিকসূত্রে যে সুন্দর স্বাস্থ্যের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন', লিখছেন রথীন্দ্রনাথ, 'তা ১৯১২ সালে একপ্রকার ভেঙে পড়ল।' ঠিক হল চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্যে সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বিলেত যাবেন।

'কলকাতা থেকে লণ্ডনগামী এক জাহাজের টিকিট কেনা হল।' রথী ঠাকুর আরো লিখছেন : 'জাহাজ ছাড়বার আগের দিন রাত্রে স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে বাবার নিমন্ত্রণ। কেবল খাওয়াদাওয়া নয়, সেই সঙ্গে বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয়েরও ব্যবস্থা হয়েছিল। অসুস্থ শরীরে বাবাকে অনেক রাত অবধি জাগতে হল। আমরা ঘরে ফিরলাম বেশ রাত করে। বাকি রাতটুকু বাবা না ঘুমিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলা উঠে বাবার শরীরের অবস্থা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল।'

সে যাত্রা আর যাওয়া হলনা। কবি শিলাইদহে বিশ্রাম নিতে ফিরে গেলেন।

কাদম্বিনী দত্তকে চিঠিতে জানাচ্ছেন সেই কথা :

'মাতঃ, বাধা পড়িল—যাত্রার দিনে প্রাতে এমন মাথা ঘুরিয়া শয্যাগত করিল যে কোনোমতেই উঠিবার শক্তি রহিল না। তাহার পূর্বে কয়দিন অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাতের উৎসর্গ থাকাতে হঠাৎ এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। এখনো মাথার পরিশ্রম নিষেধ। শিলাইদহে নির্জনে পালাইয়া আসিয়াছি।'

এই কাদম্বিনী দেবীকেই আগে একদিন লিখেছিলেন : 'আমার কোনো কোনো রচনা তোমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছে শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। নরনারীর চিত্তে ভগবানের অমৃতধারা প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া—কোনো লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারেনা।

যে সংসারে তুমি প্রবেশ করিয়াছ সেই সংসারকে তুমি ধৈর্যে ক্ষমায় মঙ্গলে ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করো। এই কথা সর্বদাই মনে রাখিয়ো ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না—মানুষের সেবার মধ্যেই তাঁহার সেবা। তিনিই স্বামীরূপে আমাদের প্রীতি, পুত্ররূপে আমাদের স্নেহ, দীনরূপে আমাদের দয়া গ্রহণ করেন। যাহার সেবা করিবে মঙ্গল করিবে পূজারূপে তাহা ঈশ্বরের

চরণেই পৌঁছিবে। শোকদুঃখকে তাঁহার হস্তের দান বলিয়া নতশিরে ধারণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে। সংসারকেই ঈশ্বরের পবিত্র পাদপীঠ জানিয়া সেই সংসারমন্দিরেই তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে—এবং প্রসন্নচিত্তে প্রফুল্লমুখে প্রতিদিন সংসারের কল্যাণসাধনদ্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবে।

সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই। শুধু ঈশ্বর কেন, আমরা প্রত্যেকেই আকারও বটে নিরাকারও বটে। তাহাকে রূপে এবং ভাবে আকারে এবং নিরাকারে কর্মে এবং প্রেমে সকল-রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহারই।

তোমার প্রতি আমার এই আশীর্বাদ যে ভগবানের প্রতি ভক্তি তোমার চিত্তে যে অমৃতরস বর্ষণ করিবে তাহা যেন নিয়ত তোমার চারিদিকের সংসারকে মধুময় করিয়া রাখে।'

পরে আরেক চিঠিতে লিখছেন : 'আমি জানি অন্তঃপুরে সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু জীবন যখন পাইয়াছ, বাঁচিতেই যখন হইবে তখন নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থার উর্ধ্বে অনন্ত আকাশের মধ্যে মাথা তুলিতেই হইবে—আলো পাইতেই হইবে, মুক্তবায়ুর মধ্যে আত্মাকে বিস্তৃত করিতেই হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতা যত কঠিন অন্তরের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে। তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখো—বলো আনন্দং পরমানন্দম। পরাভূত হইয়ো না—দুঃখকে সর্বদা দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে—সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়ো। আমি যে প্রতি মুহূর্তে বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ব্যয় হইতেছে, সেই শক্তির কণামাত্র হ্রাস হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম। এই যে এত বড় শক্তির দ্বারা বিধৃত আমি, এই যে এত বড় প্রেমের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি—আমার খেদ কি লইয়া? কে আমাকে কি বলিল, কে আমাকে কি বুঝিল—ইহাই কি জগতে সকলের চেয়ে বড়? আমার যে এক মুহূর্তের দৃষ্টিশক্তি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার—আমার যে একবার মাত্র নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা একটি আশ্চর্য ঘটনা—আমার মত

এই পরমাশ্চর্য সত্তাকে কোনো দুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো পীড়নই ক্ষুদ্র করিতে পারে না।'

'তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধন—এই বার্তা নিজেকে শুনাইয়া দাও।' আরো পরে লিখছেন: 'যাহাই ঘটুক, ঘটনা সমস্তই তোমার আত্মার কাছে অতিতুচ্ছ —তোমার চেয়ে বড় কেহই নাই সেই জন্যই সকলের মধ্যেই তুমিও আছ। তোমার কিছুতে ভয় নাই, কিছুতেই ক্ষতি নাই, ঈশ্বর তোমার।'

এইটিই জীবনের উজ্জীবন-মন্ত্র। 'দেখ জীবন কী মহৎ, জগৎ কী আশ্চর্য, যিনি চিরদিনের সঙ্গী, তিনি কী অন্তরতম!'

উনিশশো বারো সালের সাতাশে মে কবি বিলেত পাড়ি দিলেন। জাহাজ লোহিত সমুদ্র দিয়ে চলেছে, কবি ছাদের উপরে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। আকাশ আর সমুদ্র দুইই অগাধ নীল—আকাশ পাণ্ডু নীল আর সমুদ্র ঘননীল— দুই নীলিমার মাঝখান দিয়ে পশ্চিম দিগন্ত থেকে মৃদু শীতল বাতাস বইছিল, স্পর্শ করছিল তাঁর ললাট। কবি লিখছেন: 'আমার মন বলিতে লাগিল এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ। এই অনির্বচনীয় মাধুর্য কি জলে? ইহা কি বাতাসে? এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে? ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ।'

তখনই তাঁর প্রাণে গান এল:

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ,
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।

আমার প্রাণ অফুরন্ত, মৃত্যুর সীমান্তেই শেষ নয়। আমার যাত্রা যে এ প্রাণলোক থেকে প্রাণের রহস্যলোকে।

দেহবন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে।

মৃত্যু যেমন অনিঃশেষ, প্রাণও তেমনি অনিঃশেষ।

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান।…

মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া।

কিন্তু এ প্রাণ কেন? শুধু দেবতার সম্ভোগে অমৃত হয়ে উঠবে বলে। 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?' আর দেবতাই বা কে? দেবতা নর-দেবতা। জীবনদেবতা। বিশ্বদেবতা।

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

লণ্ডনে প্রথমে একটা হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিবেশটা তাঁর খুব বেশি মনঃপূত হল না। একমাত্র বন্ধুজন রোটেনস্টাইন—যদিও তার সঙ্গে কলকাতায় গত বছর মাত্র দু দণ্ডের আলাপ—ভাবলেন তারই শরণাপন্ন হবেন। পরদিন তার বাড়ি যাবেন, রথীকে বললেন তাঁর এ্যাটাচি কেসটা সঙ্গে দিতে। শিলাইদহে বিশ্রাম নেবার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলির অনেকগুলি কবিতা ইংরেজি করে লিখেছিলেন, তার পাণ্ডুলিপি ঐ এ্যাটাচি কেসে ছিল। ইচ্ছে ছিল তা একবার রোটেনস্টাইনকে দেখাবেন। রোটেনস্টাইন শুধু চিত্রকর নয়, সে একজন বিদগ্ধ-বিশারদ।

কিন্তু কোথায় এ্যাটাচি কেস?

রথীর কাছে সেটা জিম্মা করা ছিল, এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বোঝা গেল আর সব ভারী জিনিসের তদারকি করতে গিয়ে এই হালকা জিনিসটাই সে টিউব থেকে নামায়নি, ভুলে গিয়েছে। এমন ভুল যে সারা দিনমানেও মনে পড়ল না। এখন কী হবে? ঐ এ্যাটাচি কেসে যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি!

টিউব রেলের লস্ট প্রপার্টি অফিসের উদ্দেশে ছুটল রথীন্দ্রনাথ। যদি না পাওয়া যায়! যদি শুকনো মুখে ফিরে আসতে হয়!

কবির মন কী আশঙ্কায় দুলছে না জানি। ঈশ্বর আবার তাঁর কাছ থেকে কোন অমূল্য ক্ষতি না দাবি করে বসেন!

কিন্তু, না, এ্যাটাচি কেস পাওয়া গেল। তার মধ্যে নিটুট পাণ্ডুলিপি। নিজেকে নতুন করে নির্মাণ করার সাধনা।

'সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত—এখানে একটি অণু-পরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই', বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সমস্তই তাঁর অটল শাসনে স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেন নি—তার ভিতরে রঙের একটি বাটি দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে। তিনি বলেছেন, তোমার মধ্যে সবই দিলুম কিন্তু তোমাকে সেই সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে সুন্দর করে আশ্চর্য করে তৈরি করে তুলতে হবে—আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনি মরি তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না?'

॥ তেত্রিশ ॥

ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি রোটেনস্টাইনকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। রোটেনস্টাইন তার টাইপ-করা কপি তৈরি করলেন ও কয়েকজন অগ্রণী গুণীকে তা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজের বাড়িতে আসর বসালেন।

কবিতা পড়ে সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ য়েটস। এত মুগ্ধ যে কপিগুলি সব সময়েই পকেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছেন, একটু ফাঁক পেলেই পড়ছেন, আবার পড়ছেন, আর যতবার পড়ছেন শিহরিত হচ্ছেন। তা ট্রেনে-বাসে চলতে-চলতেই হোক বা রেস্টুরেন্টে চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতেই হোক। পড়ছেন আবার তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠাগুলি লুকিয়ে ফেলছেন, যেন পাশের লোক বুঝতে না পারে তিনি কী পড়ে তন্ময়, কতখানি তন্ময়!

সেই আসরে য়েটসই ইংরেজি গীতাঞ্জলির কটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অর্নেস্ট রীস, হেনরি নেভিনসন, মে সিনক্লেয়ার, এজরা পাউণ্ড, সি, এফ, এনড্রুজ। সবাই শুনলেন স্তব্ধ হয়ে, কেউ একটি কথাও বললেন না, আবৃত্তি শেষ হলে যে যার মনে চলে গেলেন।

সেই নিস্তব্ধতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চয়ই স্বস্তিকর লাগেনি। ভালো-মন্দ দূরের কথা, একেবারেই একটা কেউ কথা বলল না, এ কেমন কথা!

কিন্তু ওরা কথা বলবে কী! ভরা-মনের কোনো কথা আছে?

ক্রমে-ক্রমে চিঠি আসতে লাগল। প্রকাশ পেতে লাগল লিখিত অভিনন্দন।

এনড্রুজ-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার এই আসরেই। কবিতার আবৃত্তি শুনে তাঁর মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল তিনি ব্যক্ত করছেন :

নেভিনসনের সঙ্গে আমি হ্যামস্টেড হিথ-এর ধার দিয়ে হাঁটছি। কোনো কথা বলতে পারছিলাম না, কেবলই মনে হচ্ছিল একা-একা কোনো গভীর নীরবতার মধ্যে বসে এই কাব্যের মহিমা চিন্তা করি। নেভিনসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হিথ পেরিয়ে একা হাঁটতে লাগলাম। রাত্রির আকাশে মেঘ ছিল না বরং তাতে লেগেছে যেন ভারতীয় সন্ধ্যারাগের আভাস। একা চলতে চলতে আমি ভাবতে লাগলাম কী আশ্চর্য এই কবিতা।

জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা।…
জগৎ পারাবারের তীরে শিশুর মহামেলা॥

On the seashore of endless worlds children meet…
On the seashore of endless world is the great meeting
of children.

শৈশবে শোনা নানা মধুর ধ্বনিত মত এর সুরে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত বোধ করছিলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের নিচে পাইচারি করতে লাগলাম। যখন ফিরে এলাম তখন ভোর হয়ে গেছে।…

মে সিনক্লেয়ার লিখছে : আপনার কবিতার সঙ্গে তুলনীয় যে একটিমাত্র কবিতা আমার মনে পড়ে তাহচ্ছে সেণ্টজন অভ দ্য ক্রস-এর ‘আত্মার অন্ধকার রাত্রি।’ তাহলেও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ও অদ্বৈতবোধে আপনি সেণ্ট জন ও অন্যান্য খৃস্টীয় মরমিয়া কবিকে অতিক্রম করে গেছেন। খৃস্টান মিস্টিসিজম শুধু চোখের দেখা জগৎ নিয়েই বেশি ব্যস্ত। সে যেন জগতের মায়াবরণ ভেদ করে বিশুদ্ধ সত্যকে দেখেনি। তাই তার আবেগপ্রেরণা যথেষ্ট নির্মল নয়। তার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে চিরদিন অতৃপ্ত রেখেছে। কিন্তু কাল, কাল রাত্রে, আপনার কবিতায় আমি পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছি। স্বচ্ছ সুন্দর ইংরেজিতে আপনি যা প্রকাশ করেছেন তা অকল্পনীয়।…

আরেকজন লিখছে : এঁর সমস্ত রচনাই বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি একটি নম্রমধুর হৃদয়ের আবেগস্তব। এঁর কাছে সেই সৌন্দর্যই বিশ্ব-ঐক্যের পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রকাশ—অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য ভগবানের অনন্তপ্রেমের প্রকাশবিগ্রহ। সহস্র পদার্থে তা-ই ইনি দর্শন করেন, সহস্ররূপে জীবনের ও মৃত্যুর অক্লান্ত স্তবগানে

তা-ই ইনি ব্যক্ত করেন। এঁর কবিতার বাহ্যরূপটি না পেলেও তার নিগূঢ়-গভীর অর্থ হৃদয়কে ব্যথিত ও আত্মাকে আলোড়িত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

কী বলছেন রবীন্দ্রনাথ? বলছেন: 'যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা, এই হচ্ছে আমাদের সকলের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে, এইজন্যেই তো রোজ আমরা দুবেলা তাঁর নাম করছি, তাঁকে প্রণাম করছি। তাঁকে ডাকতে-ডাকতে, তাঁর দিকে মুখ তুলতে-তুলতে ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাকবে, আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়—অমনি সহজে দেখা—অমনি আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে-গায়ে ঠেকা; অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনই অতি সহজে উপলব্ধি যে তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে নাচছে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমাকে ধরে আছেন—এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে, আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্ছে—তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি—তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি, তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে, তাঁরই আনন্দে অ. . তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।'

> তোমারি নাম বলব নানা ছলে
> বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।
> বলব বিনা আশায় বলব বিনা ভাষায়
> বলব মুখের হাসি দিয়ে বলব চোখের জলে॥

আবার বলছেন: 'ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে পারছিনে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে, বারবার তাঁকে বলতে হবে, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতিমুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে।

বলতে-বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে।···বেহালা-যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয়—তার কারণ, অনেকদিন থেকে সুর বাজতে-বাজতে বেহালার কাষ্ঠফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেইরকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাকতে থাকি ততই আমাদের শরীর-মনের সমস্ত অণুপরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠতে থাকে যে বাজতে আর দেরি হয় না, কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।'

আসলে বাধাটা কী? বাধা অহংকার। বাধা আত্মপ্রচারের লোভ' স্বনামমোহ।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরানে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয় পদ্মদলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

এই অহংকারকে উচ্ছিন্ন করবার জন্যেই তো আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে পড়ে তোমার চরণধূলায় ধূসর হচ্ছি। ভয় হয়, প্রতারণা করে নিজেই না তোমার আসনে উঠে বসি, তোমার নামগান প্রচার করছি এই অহংকারই না আমাকে পেয়ে বসে।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়
তব নামগান-অহংকার হে।···
পাছে প্রতারণা করি আপনারে
তোমার আসনে বসাই আমারে

রাখো মোহ হতে, রাখো তমো হতে
রাখো রাখো বারবার হে।

অহংকারই তো আমাকে তোমার সঙ্গী হতে দেয় না যেখানে তুমি সবহারাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছ, আমিই পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছি, আমিই চলে যাচ্ছি চাকার নিচে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।
ধনেমানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে॥

তাই তো কর্মে জ্ঞানে বাক্যে ধ্যানে এই নিরন্তর সাধনা আমি অহংকে মাথায় করে দোরে-দোরে ফিরি করে বেড়াবনা। 'আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না। আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে রইব না।' আমি-র মধ্যে কিছু নেই, আমার মধ্যেই সমস্ত। 'মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে। আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।' আমি মরলেই তুমি হবে। তোমার হওয়াতেই আমার হয়ে-ওঠা। তাই আমার অহং-এর কালিমা তোমার আবির্ভাবের জ্যোতিতে মুছে দিতে চাই। 'মনকে আমার কায়াকে, আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে চাই এ কালো ছায়াকে।'

তবেই না আমি তোমার দেবালয়ের প্রদীপ হয়ে উঠব।

আমার আবার নাম! আমার কটি অক্ষর, সেই অক্ষরসন্নিবেশে তোমারই নামোচ্চারণ।

আমারি নাম সকল গায়ে লিখা
হয়নি পরা তব নামের টিকা,
তাই তো আমার দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।

আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় তোমারই নামের জ্বলন্ত শিখা, আমার সমস্ত ভালোবাসায় তোমারই নামের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। আর কাজ করা কেন? কাজের মধ্যে তোমারই নাম ফলবন্ত হবে বলে। সমস্ত হাসিকান্না তোমারই

নামামৃতময় হবে বলে। তিল-তিল করে নামের মধু সঞ্চয় করা কেন? মরণক্ষণে তাই তোমাকে উপহার দেব বলে।

জীবন পদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু
তোমায় দিব মরণ-খনে তোমারি নাম বঁধু।

আমার আবার থাকা! তোমার বাইরে আমার এক মুহূর্তেরও স্থিতি নেই গতি নেই, বসতিপ্রীতি নেই। 'আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা।' তোমার মধ্যেই আমার জীবন, তোমার মধ্যেই আমার পুনর্জন্ম।

নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে,
আপনগড়া স্বপন হতে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।

স্টপফোর্ড ব্রুক রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এ মানবজন্মটা একেবারেই একটা খাপছাড়া জিনিস, আগেও কখনো ছিলনা পরেও কখনো হবে না—এ কখনো হতে পারেনা। যে কারণে জীবন বিশেষ দেহ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সে কারণ এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয়ে এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল এ হতে পারেনা। শরীরী জন্ম বারে বারে প্রকাশিত হতে-হতে নিজেকে পূর্ণতর করে তুলছে এটাই সম্ভবপর মনে হয়।'

পাদরি-পুরোহিত সাহিত্যশাস্ত্রী ব্রুক বললেন, 'আমিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটা সঙ্গত মনে করি। আমার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়ে যখন আমরা একটা জীবনচক্র শেষ করব তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হয়ে জেগে উঠবে।'

এ কথাটা রবীন্দ্রনাথের মনে লাগল। একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করে ফেলি তখনই তার সমস্ত ভাবটা পরস্পর গ্রথিত হয়ে আমাদের মনে উদিত হয়, শেষ না করলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে এক-একটা জন্মমালা গেঁথে চলেছি, গাঁথা শেষ হলেই যে একেবারে ফুরিয়ে যায় তা নয়, কিন্তু একটা পালা শেষ হয়ে যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করে গ্রহণ করতে পারি।

বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে ফেরবার আগের দিন রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লিখছেন :

'এ দেশে আমি সমাদর পাইয়াছি কিন্তু সেইটেকেই আমি সকলের চেয়ে বড় লাভ মনে করি না। কিন্তু ভগবান যে জন্য এদেশে আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন তাহার সন্ধান পাইয়াছি। তিনি আমার কাছে বিদেশীর ভিতর দিয়া আত্মীয়ের মূর্তি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

আমি শুধু বাহবা পাই নাই আমি হৃদয় পাইয়াছি। মানুষ যে মানুষের কত কাছে তাহা দেখিয়াছি। ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, আচার ও গিরি নদী সমুদ্রের ব্যবধান কতই তুচ্ছ—যেখানে সত্য মানুষটি বাস করে সেখানে কোনো ভেদ নাই। সেই ভেদবুদ্ধির হাত হইতে মুক্তি না পাইলে তাহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, মানুষের কাছে তাঁহার অখণ্ড প্রকাশই মানুষের পক্ষে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সেই প্রকাশকে আমরা বর্ণভেদ বিজাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি সহস্র আকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি—সেই আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিতে হইবে—নহিলে এই পৃথিবীর মহাতীর্থে মানুষের হৃদয়মন্দিরে দাঁড়াইয়া মানুষের হৃদয়েশ্বরের পূজা সমাধা হইবে না, বৃথা দ্বারের বাহির হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।'

চিন্তাই শরীর গঠন করে আর নিরন্তর ভগবৎ চিন্তায় মর্ততনু ভাগবতী তনু হয়ে উঠবে এ আর বিচিত্র কী। যিনি নিরন্তর সুন্দরকে সন্ধান করছেন সুন্দরকে ধ্যান করছেন সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করছেন সেই তো আনন্দসুন্দর, সাধকসুন্দর।

'প্রত্যহ তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে চিন্তা করা, স্মরণ করা এইটেই হচ্ছে পন্থা।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বিষয়ের দাসত্ব যতই করি তবু সেইটেই পরম সত্য নয়, প্রতিদিন এই কথা মানুষকে কোনো-একসময় স্বীকার করতেই হবে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—এই কথাই সত্য এবং এই সত্যেই আমি সত্য, ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য এই সত্য এই সত্য—প্রতিদিন বলতে হবে, বিমুখ মনকেও বলাতে হবে। ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বারবার ধুলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব, তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড়ো করে

জানব না। এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্মপরিচয় বলে মনে করব না।'

পাওয়া নয়, হওয়া—হয়ে ওঠা। কী হয়ে ওঠা? ব্রহ্ম হয়ে ওঠা। কে ব্রহ্ম? যিনি বড় হয়ে আছেন ও বড় করছেন তিনিই ব্রহ্ম।

'হাঁ. আমি ব্রহ্মই হব।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এ কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারিনে। আমি অসংকোচেই বলব আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু 'আমি ব্রহ্মকে পাব' এত বড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারিনে। তবে কি ব্রহ্মতে-আমাতে তফাত নেই? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি—আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে, আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হলনা।···

আমরা কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর কিছুই হতে পারিনে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হইনে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারিনে ব্রহ্মকে। ছোট সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না এই তার আনন্দ।'

তারপরে প্রাণশঙ্খে ঊর্জস্বান ঘোষণা করছেন:

'সমস্তদিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উল্টো দিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, জানতে পারবে—ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।'

সব কিছুরে সরিয়ে করো
একটু-কিছুর ঠাঁই
যার চেয়ে আর নাই।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত